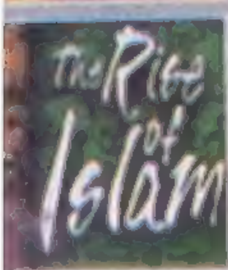


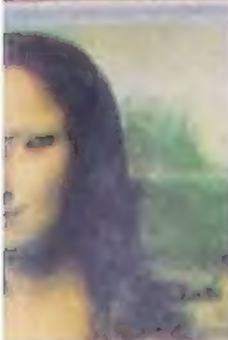





# দ্য হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়ার্ল্ড





মূল: প্যান্টাজেনেট সমারসেট ফ্রাই

অনীশ দাস অপু

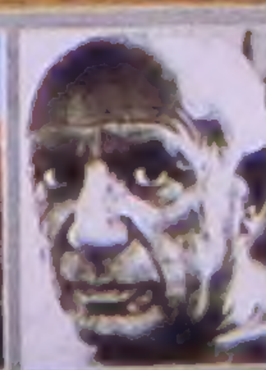










# দ্য হিস্ট্রি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড

অনীশ দাস অপু

শুভ প্রকাশন

## উৎসর্গ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্যার,

আপনার মত আরও ৯৯ জন আলোকিত মানুষ আমাদের বড় দরকার এ দেশকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে তোলার জন্যে। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

প্রথম প্রকাশ ❑ বইমেলা-২০১২
গ্রন্থস্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রকাশক ❑ রাহেলা মাসুম, শুভ প্রকাশন, প্রকাশনী, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা
অক্ষর বিন্যাস ❑ হৃদয় কম্পিউটার, ৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ আল ফয়সাল অফসেট প্রিন্টার্স, ঢাকা-১১০০
মূল্য ❑ ২৫০.০০ টাকা

THE HISTORY OF THE WORLD : By Anish Das Apu. Published
by : Rahela Masum Shuvo Prokashoni. 34 North Brook
Hall Road. Banglabazar. Dhaka—1100.
Cover design by Niaz Chowdhury Tuli
Price : Taka 250.00 Only.
US $ 6

ISBN 984-751-089-X

একমাত্র পরিবেশক মৌমি প্রকাশনী

# ভূমিকা

এই বইটির নাম 'দ্য হিষ্ট্রি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড' বা পৃথিবীর ইতিহাস। আসলে বইটির নামকরণ করা উচিত ছিল 'এ হিস্ট্রি অভ্ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন' বা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস। প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে, গোটা বইতে বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর গত সাত হাজার বছরের ইতিহাস। তাও পৃথিবীর মূল বয়সের একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে নানাভাবে দৃষ্টিপাত করা চলে। প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মানুষের উন্নয়ন থেকে শুরু করে আধুনিক ও কৃত্রিম কারিগরী শিল্পের ইতিহাস একে বলা চলে। এ ইতিহাসকে বর্ণনা করা যায় দুর্বল ও ছোটদের ওপরে বড় ও শক্তিশালীদের নেতৃত্বের ইতিহাস হিসেবে। একজন মন্তব্য করেছেন ইতিহাস আসলে বিভিন্ন জাতি ও নানা লোকদের নীরস গল্প যারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছে। ইতিহাস হলো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাহিনী যা শতশত বছর ধরে গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে সভ্যতা, যে সভ্যতার সাথে বিভিন্ন জাতির মিল রয়েছে।

সভ্যতা কি? সভ্যতা কি সেটা যে পর্যায়ে মানুষ বর্বর দশা থেকে মুক্তি পেয়ে সভ্য হয়েছে? মানুষ যখন বিন্যস্ত সমাজে একত্রে বসবাস শুরু করল, নিজেই নিজের খাদ্য উৎপাদন আরম্ভ করল এবং লালন পালন করতে লাগল গরু-ছাগলের পাল, বসবাসের জন্যে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করল দালান কোঠা, উন্নয়ন ঘটল ভাষা এবং শিল্পকলার, তখন তাদেরকে বলা হলো সভ্য। তবে সভ্য মানেই ভাল, সৎ, সদাশয়, বিবেচক কিংবা চতুর নয়। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ প্রাগৈতিহাসিক আমলের মানুষের মধ্যেও ছিল, তাছাড়া সবচেয়ে সভ্য মানুষও সবচেয়ে নিষ্ঠুর হতে পারে, হতে পারে অসৎ এবং অবিবেচক। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি জাতিও নেই যারা এই বদগুণ থেকে মুক্ত ছিল। যেমন স্পেন, ইংল্যান্ড এবং জার্মানী বেশ কয়েক শতক ইউরোপের সভ্যতার কর্ণধার ছিল। কিন্তু স্পেনিয়ার্ডরা ষোড়শ শতকে আমেরিকায় অ্যাজটেক ও ইনকা জাতির ওপরে যে অত্যাচার চালিয়েছে তাতে কি সভ্যতার পরিচয় মিলেছে? ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ড এবং ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলস দখল করার পরে ইংরেজরা আইরিশ ও ওয়েলসদের ওপরে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছে। আর জার্মানরা ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫

সালের মধ্যে ষাট লাখ ইহুদি এবং চার লাখ অইহুদিকে নিকেশ করে ফেলে। এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

মোট ২২ টি মূল সভ্যতার কথা জানা যায়। কোন কোন সভ্যতার ব্যাপ্তি ছিল একটি চেয়ে অন্যটির বেশি। তবে এ বইতে সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, ব্যাপ্তিকাল এখানে গৌণ। ভারতীয় এবং চীনা সভ্যতা সবচেয়ে দীর্ঘ সভ্যতা এবং শান্তিরও বটে। তবে গ্রীস-রোমান এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মত বিশাল প্রভাব রাখতে পারেনি। এ সভ্যতা দুটির ব্যাপ্তিকাল সংক্ষিপ্ত হলেও বিশ্ব ইতিহাসে এদের প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। ইউরোপীয় সভ্যতা বা পশ্চিমা সভ্যতা গোটা পৃথিবীতে তাদের হাত প্রসারিত করে, গঠন করে কলোনি বা উপনিবেশ। তবে এই উপনিবেশ ব্যবস্থা কোন দেশের জন্যেই তেমন একটা মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বর্বর দশা থেকে মানুষের সভ্যতায় রূপান্তর ঘটেছে ৬/৭হাজার বছর আগে, যদিও খুব বেশি উন্নয়ন সাধন সে করতে পারেনি। চাঁদে অবতরণের মত কারিগরী দক্ষতা অর্জন, পারমাণবিক শক্তি, ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারী, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেলেও দাসত্ব, বর্ণ-বৈষম্য, অবিচার, ধর্মীয় সংঘাত, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়গুলোর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।

এই একটি বইতে বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসকে বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞানপিপাসু পাঠক, ছোট-বড় যে-ই হোন, বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলেন আশা রাখি।

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ
ঢাকা

## সূচিপত্র

# মানুষের শুরু

পৃথিবীর বয়স আনুমানিক ১০,০০০,০০০,০০০ বছর। এই অবিশ্বাস্য, বিশাল সময়ে মানুষ এবং তার বিবর্তনকারী পূর্বপুরুষদের অস্তিত্বকাল মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ বছরের। আর মানুষ সভ্য হয়েছে বড় জোর দশ হাজার বছর আগে। এ সময়কাল পৃথিবীর বয়সের ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। ধরা যাক, ৮০ কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি লম্বা একটি কাগজের রোল তুমি মেলে ধরলে, এবং এটিকে পৃথিবীর বয়স হিসেবে অনুমান করে নিলে। আর এ কাগজের রোলে সভ্য মানুষের ইতিহাস মাত্র ১০ সেন্টিমিটার জায়গা দখল করতে পারবে।

সংক্ষিপ্ত এ সময়ের মধ্যে সাধারণ মেষপালক থেকে, যে মানুষ চাকা আবিষ্কার করেছে, বানাতে শিখেছে তৈজসপত্র এবং আইনের অনুশাসনে একটি সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, সে-ই মানুষই এক সময় হয়ে উঠেছে অত্যাধুনিক, যে পৃথিবী থেকে চাঁদে অবতরণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

কয়েক শ হাজার বছর মানুষের জীবন যাত্রা পশুদের চেয়ে খুব একটা উন্নত ছিল না, তারা ছিল স্তন্যপায়ী প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী (এদের মধ্যে নরবানর ও বানরও রয়েছে)। তার সমৃদ্ধি ঘটেছে অত্যন্ত ধীর লয়ে। বেশির ভাগ সময় পৃথিবী আবৃত ছিল বরফের ঘন আস্তরণ দ্বারা, বিশ্বের সর্বত্র ছিল গ্লেসিয়ার। এ সময়টাকে বলা হয় বরফ যুগ। এই সময় প্রায়-মানুষ পর্যায়ের প্রাণীদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ একটা সময় লড়াই করতে হয়েছে। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস, প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, প্রবল বন্যা প্রকৃতির এসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থেকেছে তারা, নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে।

মানুষের উৎপত্তি হোমো হ্যাবিলিস থেকে। এ হলো মানুষের একটি প্রজাতি যাদের বিবর্তন পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ বছর আগে। হোমো হ্যাবিলিস-এর পূর্ব পুরুষরা হলো ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগের র‍্যামাপিথেকাস, এদের বলা হয় হোমিনিড (মানুষ) পারিবারিক বৃক্ষের 'প্রতিষ্ঠাতা'। এরা ছিল বানর সদৃশ প্রাণী, উদ্ভব ঘটে ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায়। এরা ক্রমে দুটি ভিন্ন শাখায় বিবর্তিত হয়। একটি হলো Australopithecus, উদ্ভব ৬ থেকে ৩ মিলিয়ন বছরের মাঝামাঝি। এর আবার দুটি শাখা : Australopithecus africanus এবং Australopithecus boisel দুটিই ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অপর প্রজাতিটি হলো Homo habilies এর আবির্ভাব ৬ থেকে ৩ মিলিয়ন বছরের সময়সীমার শেষ ভাগে। এর সাথে Australopithecines এর চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। তবে এ ছিল একটু ভিন্ন রকম, এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

হোমো হ্যাবিলিস-এর ফসিল তানজানিয়া অলডুভাই কলেজে, ১৯৬১ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ লুইস লিকি আবিষ্কার করেন। হোমো হ্যাবিলিস যন্ত্রের ব্যবহার জানত, এ জন্যেই তার নামের অর্থ 'দক্ষ মানব।'



*পিথে কানথ্রোপাস মানব ছিল শিকারী*

১৯৭২ সালে লিকির ছেলে, রিচার্ড একটি ফসিল খুলি ও কিছু হাড়গোড় আবিষ্কার করেন কেনিয়ার লেক টুরকানা থেকে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এ খুলি অলডুভাই মানব পরিবারের। তার আবিষ্কারের নাম দেয়া হয় '১৪৭০ মানব'। কারণ কেনিয়া জাতীয় জাদুঘর তার ক্যাটালগে এই নাম্বারটি দিয়ে রেখেছে। ফসিলের কাছাকাছি লিকি কিছু নুড়ি পাথরের খোঁজ পান যা থেকে ধারণা করা হয় ১৪৭০ মানব সম্ভবত সহজ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। ধারণা করা চলে ওই সময় থেকেই সম্ভবত প্রস্তর যুগের শুরু। সময়টা হলো খ্রীষ্টপূর্ব ২,৫০০,০০০ বছর।

হোমিনিডদের বিবর্তনের পরবর্তী অন্যতম প্রধান ধাপ ছিল ৫,০০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০ বছর, যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে জাভা, চীন, ইউরোপ ও আফ্রিকায় Homo erectus-এর আবির্ভাব ঘটে। এর মাথা ঋজুভাবে বসান থাকত শিরদাঁড়ার উপরে, পূর্বপুরুষের মত কুঁজ ছিল না পিঠে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওই মানব আবিষ্কার হয় জাভায় (তৎকালীন ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের অংশ যা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া)। হোমো ইরেকটাস-এর দ্বিতীয় আরেকটি অংশ মাটি খুঁড়ে পাওয়া

যায় ১৯২৭ সালে, চীনের পিকিং (বর্তমানে বেইজিং)-এর কাছে। হোমো ইরেকটাসকে পিকিং মানব বলে সম্বোধন করা হয়, যদিও আরো নানা অঞ্চলে এর ফসিল আবিষ্কার হয়েছে, এর মধ্যে ফ্রান্সও রয়েছে। ফ্রান্সে পাঁচ লাখ বছরের পুরানো পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন ইনভেস্টিগেটররা।

হোমো ইরেকটাস-এর দাঁত তার পূর্বপুরুষদের তুলনায় ছোট ছিল, অনেকটা আমাদের মত, মস্তিষ্ক ছিল বড়। এ সম্ভবত প্রথম হোমিনিড যে আগুন ব্যবহার করত। পিকিং মানব পাথর দিয়ে সাধারণ যন্ত্রপাতি বানাত, হাতে তৈরি কুঠারও আবিষ্কার করেছে।



*মানুষের বিবর্তন*

পরবর্তী প্রজাতির মানুষের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব ৮০,০০০ বছরে। এর নাম নিয়ানডারথাল ম্যান। এর ফসিল প্রথম আবিষ্কার হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, পশ্চিম জার্মানীর নিয়াণ্ডর ভ্যালিতে। হোমো ইরেকটাসের চেয়ে এর মস্তিষ্কের আকার ছিল বড় এবং আধুনিক মানুষের চেয়েও খানিকটা বৃহৎ। নিয়ানডারথাল মানুষের বুদ্ধিমত্তাও ছিল উঁচু স্তরের, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০০ বছরে এই মানব গোষ্ঠী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তবে এ আমাদের পূর্ব পুরুষ ছিল না, যদিও সে হোমো ইরেকটাসের বংশধর, যেমন আমরা, তবে মানব পরিবার বৃক্ষের 'শাখা বিস্তার'-এর ফল ছিল।

আমাদের সরাসরি পূর্ব পুরুষ হলো Homo Sapiens (ল্যাটিনঃ জ্ঞানী মানুষ) হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল হোমো ইরেকটাসের বংশধর। নিয়ানডারথাল ম্যান-এর

সময়েই তার আবির্ভাব, তবে কারো কারো ধারণা নিয়ানডারথাল ম্যান থেকে তার বিবর্তন ঘটেছে। এটা অসম্ভব কিছু নয় কারণ– বিভিন্ন প্রজাতির হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল, তবে আমরা ক্রো-ম্যাগনন ম্যান-এর বংশধর। এরকম নামকরণের কারণ হোমো স্যাপিয়েন্স-এর একটি কঙ্কাল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগননের এক গুহায় আবিষ্কার হয়। কঙ্কালটির বয়স প্রায় ৩০,০০০ বছর, এর সাথে আধুনিক মানুষের কঙ্কালের যথেষ্ট মিল ছিল। ক্রো ম্যাগনন ম্যান আফ্রিকা থেকে ইউরোপে এসেছিল বলে মনে করা হয়।

হোমো স্যাপিয়েন্স তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে বেশ ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। পূর্বপুরুষদের চেয়ে তার করোটির গঠন ছিল উন্নত, সমৃদ্ধিও ঘটেছে তুলনামূলক দ্রুত। সে তাঁবু বা কুটির বানিয়ে তার নিচে ঘুমাত এবং খাবার সংগ্রহ করে রাখত। আর খাদ্য সংগ্রহ ছিল তার প্রধান কাজ। গুহা খুঁজে পেলে সে ওতেও বাস করত। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে দক্ষিণমুখী গুহায় থাকলে ঝড়ো ও হিম বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এসব গুহায় আরামে থাকার বন্দোবস্তও সে করে, শিখে নেয় অস্ত্র বানানো, যন্ত্রপাতি তৈরি এবং চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে।

সময় যত বয়ে যাচ্ছিল ওই নতুন মানুষ, আমরা তাকে এ নামেই আপাততঃ সম্বোধন করব, খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি শিখে যায়, খাবার মজুদ করার উন্নততর প্রক্রিয়া সে আবিষ্কার করে এবং রুচি বৃদ্ধিতে শিকারের ধরণ ও পছন্দেরও পরিবর্তন ঘটায়। নতুন মানুষরা বুনো প্রাণী শিকার করত, নদী থেকে ধরত মাছ, ঝিনুকসহ নানা শেল-ফিশ। মহিলা ও শিশুরা জঙ্গল থেকে নিয়ে আসত বেরী, ফলমূল। প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া তারা শিখে ফেলে, রান্না নিয়ে গবেষণাও করতে থাকে। তারা তাদের গুণগত মানের সমৃদ্ধি ঘটায়, তৈরি করতে থাকে নানা যন্ত্রপাতি। এক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান ছিল পশুর হাড়, চকমকি পাথর, পাথর এবং কাঠ। বিভিন্ন যাদুঘরে এসব সংরক্ষিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা যায়, গোটা বিশ্ব জুড়েই এ সমৃদ্ধির ছোঁয়া লেগেছিল। প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০০ থেকে ১০০০০ বছর সময়কালে মানুষ লড়াইয়ের জন্যে তীর, ছুরি, কুঠার ইত্যাদি তৈরি করে ফেলে, কারিগরী কাজের জন্যে তারা বানিয়েছে হাতল, সাধারণ মানের করাত ইত্যাদি, মাছ ধরার জন্যে হার্পুন, কাপড় তৈরির জন্যে সূঁচ। কাপড় বানাত তারা উল, চামড়া ও শন দিয়ে। শেল এবং আইভরীর (হাতির দাঁত) ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠার পরে তারা গহনাও বানাতে শুরু করে। বিভিন্ন গুহাচিত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি কেউ কেউ হাতে নানা ডিজাইনের উল্কিও আঁকত।

এই উন্নয়নে প্রমাণ হয় নতুন মানুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কৌতূহলি হয়ে ওঠে। জানতে চায় অমুক জিনিসটি খাওয়ার যোগ্য কিনা কিংবা অমুক জায়গায় আস্তানা বানানো যায় কিনা। নতুন মানুষ আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সম্ভবতঃ মনের ভাব আদান প্রদান নিয়ে গবেষণাও করতে চেয়েছে। তারা বিভিন্ন সময় গুহায় নানা ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশের একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল। স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন গুহায় ক্রো ম্যাগনন ম্যানের আঁকা দারুণ সব ছবি আবিষ্কার হয়েছে। স্পেনের আলতামিরায় একটি বাইসনের ছবি পাওয়া গেছে, যেন জ্যান্ত। এটি ১৫০০০ বছর আগে আঁকা। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের লাসকসের গুহার দেয়াল রয়েছে ঘোড়া, হরিণ ও গবাদি পশুর ছবি। এসব ছবি আবার রঙিন লাল, কালো ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে আঁকা। তার মানে ওই সময় থেকেই মানুষ রঙ তৈরি করতে শিখেছে।



*ক্রো-ম্যাগনন মানুষ, এরাও শিকারীর জাত*

প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে বা প্যালিওলিথিক যুগ-এর শেষ ভাগে নতুন মানুষরা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সব জায়গায়। তারা বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী তৈরি করে নানা অঞ্চলে, যেখানে যেখানে থিতু হয়েছে। নিকট প্রাচ্য, ব্রিটেন কিংবা মধ্য আফ্রিকা ছিল সেরকম অঞ্চল।

নতুন মানুষের সমৃদ্ধির পরবর্তী ধাপের শুরু মিড্‌ল্ স্টোন এজ বা মেজোলিথিক যুগে। এ যুগের কালটি সংক্ষিপ্ত সময়ের হলেও এ সময় পাথর ব্যবহারে মানুষরা

দক্ষতা দ্রুত ও প্রায় নিখুঁত হয়ে ওঠে। ফার্টাইল ক্রিসেন্ট-এ (উত্তর-পশ্চিম ইরাক থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা) মেজোলিথিক যুগের শুরু খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০০-১০০০০ বছর আগে। এ সময়কাল স্থিতি পেয়েছে তিন থেকে চার হাজার বছর। ইউরোপে এ যুগের শুরুটা বহু বহু পরে। ধারণা করা হয়, মেজোলিথিক ম্যানকে ইউরোপে নিয়ে আসে নিকট প্রাচ্যের মানুষ। মেজোলিথিক মানবরা সম্ভবতঃ তাদের প্রতিবেশীদের মত একই হারে সমৃদ্ধি অর্জন করে চলছিল বলে বিজ্ঞানীদের মত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছর আগে নতুন মানুষ ফার্টাইল ক্রিসেন্টে, পরিত্যক্ত 'গ্রাম'-এ আস্তানা তৈরি করে। সে তখন খেয়াল করেছে মাটির জন্যে জলের প্রয়োজন, লক্ষ্য করেছে জলের সাহায্যে মাটিতে শাকসজি ও শস্য ফলানো যায়। পর্যবেক্ষণ করেছে সূর্যের তাপে ভেজা মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তারপর থেকে সে মাটি দিয়ে কুটির আকৃতির ছোট ছোট ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করে। ওই সময় সে তার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দোড় গোড়ায়, প্রাগৈতিহাসিক কালের সীমান্ত পার হয়ে সভ্যতার দাঁড় প্রান্তে পৌছে যাবার জন্যে প্রচণ্ড এক লম্ফের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ততদিনে সে শিখে গেছে নিজেই নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে, গবাদি পশু লালন পালন করতে। মানব সভ্যতার উন্নয়নে এ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নতুন এই যুগকে বলা হয় নিওলিথিক এজ বা নতুন প্রস্তর যুগ। কারণ এ সময়ে পাথর ব্যবহারে উৎকর্ষতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়, কৃষির সূচনা ঘটে এ যুগেই, পশুদের খাদ্য ও ভার বহনের কাজে ব্যবহার করতে শিখে যায় মানুষ। নিওলিথিক যুগের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃতি ছিল মেজোলিথিক যুগের মতই। চীন ও ভারতের পূর্বে মানুষ ধান ও ভুট্টা উৎপাদন শুরু করে; আমেরিকায় (বিশেষ করে পেরু ও মেক্সিকো) সে সীম ও আলু জন্মাত, ফার্টাইল ক্রিসেন্টে উৎপাদন করত গম ও বার্লি। নিজেই নিজের খাদ্য উৎপাদনের কৌশল থেকে জন্ম নেয় প্রথম পেশাদার কৃষিকাজ।

কৃষিকাজ করার সময় নতুন মানুষ তার জীবনকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার কথাও ভাবছিল। সে পশুদের লালন-পালন শুরু করে। ছাগল, ভেড়া, গরু হয়ে ওঠে প্রথম গৃহপালিত পশু। প্রতিবেশীর সাথে বিনিময় বাণিজ্যও চালু হয়ে যায়। একটি ফসলের বিনিময়ে অন্য শস্য কিংবা একটি পশুর বদলে আরেকটি পশু। এ বাণিজ্য প্রথা নতুন মানুষকে আরো নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগে সাহায্য করে, তারা পরস্পরের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। তারা কাঁচা হাতে তৈরি নৌকায় এবং জাহাজে চড়ে নদী ও হ্রদে নেমে পড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার জন্যে। এভাবে আবিষ্কার করে বসে প্রাকৃতিক নানা পথ, পাহাড়ে এবং সমভূমিতে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছর আগে প্রথম ইটের দালান বানানো হয়। এ দালানের খোঁজ মিলেছে জেরিকোতে যা বর্তমানে প্যালেস্টাইন নামে সবাই চেনে। এই দালান ঘিরে ছিল উঁচু পাথরের দেয়াল। উচ্চতায় ৪ মিটার, একই দৈর্ঘ্যের গোলাকার ইমারত ছিল ভেতরে। জেরিকোর অধিবাসীরা কৃষি কাজ জানত, তারা সরকার ধরনের কিছু একটা গঠনও শুরু করে করেছিল। এ মাপকাঠিতে বলা যায় তখন তারা সভ্য হয়ে উঠেছে। তবে তারা সেরকম শহর গঠন করতে পারেনি, জীবন যাত্রার মানেরও তেমন উন্নয়ন ঘটায়নি বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা হলেও। তবে এ কাজটা করেছে সুমেরিয়ানরা। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর কিংবা তারও আগে এরা ফার্টাইল ক্রিসেন্টে বসবাস করত।

# সুমেরের কাহিনী

মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে চোখ বোলালে দুটো বড় নদী দেখতে পাবে-ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। দুটো নদীর উৎপত্তিই তুরস্ক থেকে, এক সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব হয়ে ইরাকের দিকে বয়ে চলেছে। কুরনায় এসে এরা এক হয়ে মিশে যে নদীর সৃষ্টি করেছে তার নাম শাত-আল-আরব। এ নদীর দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল, মিশেছে পারস্য উপসাগরে।



*সুমেরদের তৈরি ঘরবাড়ি*

দুই নদীর নিম্ন প্রান্তের মাঝখানের সমভূমি এক সময় পরিচিত ছিল মেসোপটেমিয়া নামে। এটি গ্রীক শব্দ। অর্থ 'দুই নদীর মাঝখানে'। এ অঞ্চলটি খুবই উর্বর। এখানে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে কালো শরীরের ভারতীয়রা এসে আস্তানা গেড়েছিল। নিজেদেরকে তারা পরিচয় দিত 'কালো মাথার মানুষ' বা সুমেরের লোক বলে। এদেরকে আমরা বলব সুমেরিয়ান বা সুমের। পৃথিবীতে তারাই প্রথম সভ্য মানুষ বলে বিবেচিত। এরা লেখার আকৃতিতে কিছু রেকর্ড রেখে গেছে।

সুমেরিয়ানরা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ বছরেরও আগে মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে আসতে শুরু করে। এরা যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানত, নানা ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি তৈরিও করেছে। তারা ছিল দক্ষ কৃষক, মেসোপটেমিয়ার উর্বর মাটিতে দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করত। বেশ দ্রুত তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত দিয়ে তাদের অদক্ষ প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে।

সুমেরিয়ানরা চাষাবাদের পাশাপাশি দালান-কোঠা নির্মাণেও ছিল পটু। মেসোপটেমিয়ায় দালান তৈরির জন্যে প্রাকৃতিক পাথর এবং কাঠের অভাব ছিল

যথেষ্ট। তখন তারা নদীর তীর থেকে মাটি তুলে এনে ব্লক করে তা সূর্যের তাপে শুকিয়ে ইট বানিয়েছে। শুরুতে তারা দুই/তিন কক্ষ বিশিষ্ট ঘর বানাত। পরে সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে তারা বড় বড় বাড়ি নির্মাণ শুরু করে। কোন কোন বাড়ি ছিল দোতলা, শান বাঁধানো উঠোনের ওই বাড়িতে ছোট ছোট ঘর থাকত। শীঘ্রি তারা আবিষ্কার করে কিছু দূরের বসতিতে প্রাকৃতিক পাথর পাওয়া যায়। তখন উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে পাথর আনতে শুরু করে সুমেরিয়ানরা। তাদের বড় বড় অনেক দালানকোঠাই ছিল ইট আর পাথরের।

কিছুদিনের মধ্যে সুমেররা কুমোরের চাক আবিষ্কার করে ফেলে, ফলে এর সাহায্যে নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র যেমন বাটি, গামলা, প্লেট, কাপ, জগ ইত্যাদি তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। তারা তৈজসপত্রে চমৎকার সব ডিজাইন করত, আকারেও থাকত বৈচিত্র্য। জানত কিভাবে ভাস্কর্য তৈরি করা যায়, তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনার ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না।

সুমেরিয়ানরা নলখাগড়া দিয়ে ছোট ছোট নৌকা বানাত, ছই থাকত পশুর চামড়ার। এ ধরনের নৌকা তৈরি তাদের উন্নয়নের প্রমাণ তুলে ধরে, নৌকা চড়ে তারা টাইগ্রিসের এক তীর থেকে অপর তীরে যেত কিংবা ইউফ্রেটিসের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। এভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। অন্যভাবে বলা যায় সুমেরিয়ানরা যোগাযোগের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে যা ছিল সভ্যতার বিকাশের বিরাট একটি ধাপ। ছোট ছোট সেট্‌লমেন্ট বা উপনিবেশগুলোর সাথে যোগাযোগের ফলে পরবর্তীতে বড় বড় শহরের সৃষ্টি হয়। আর সুমেরদের এই নগরকেন্দ্রিক অংশগ্রহণ ছিল সুবিশাল। এ সময়কালের শুরু প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে এবং এর ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় দেড় হাজার বছর।

গত কয়েক শতকে নৃতত্ত্ববিদরা মেসোপটেমিয়ায় খোঁড়াখুঁড়ি করে দারুণ সব জিনিস আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উর নামে একটি সুমেরিয়ান শহরের ধ্বংসাবশেষ। অন্যান্য শহর যেমন ইরেক, ফিশ, ইরিদু ও লাগাশ-এর কাহিনী বয়ান করলেই সুমেরিয়ান ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা মিলবে।

উর নির্মিত হয় ইউফ্রেটিস নদীর পুব তীরে। খননকার্যে দেখা যায় শহরটির চারদিক ছিল উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা এবং চওড়া একটি খাল। এ খাল আত্মরক্ষা এবং যাতায়াত দু'কাজেই ব্যবহার করা হতো। নদীর তীরে ছিল একটি জেটি। এখানে বাণিজ্য নৌকাগুলো নানা মাল নিয়ে ভিড়ত। ইউফ্রেটিসের অন্যান্য উপনিবেশ থেকে তারা মালামাল সংগ্রহ করত।

শহরের মধ্যে ছিল সরু সরু অসংখ্য ইটের তৈরি রাস্তা বা গলিপথ। রাস্তার দু'পাশে ছিল বাড়িঘর, দোকানপাট এবং পাবলিক বিল্ডিং। সুমেরিয়ানদের বাড়িঘর অনেকটা আমাদের ঘর বাড়ির মতই। তবে তাদের ঘরে জানালা থাকত না।

তখনো কাচ আবিষ্কার হয় নি। আর উরের বাসিন্দারা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাত।

উর- শহরের মাঝখানে টাওয়ার আকারের একটি মন্দির ছিল। ওই মন্দিরকে সুমেররা বলত জিগুরাট। সুমেরিয়ান দেবতারা ছিল নানা প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। যেমন এনলিল ছিল পৃথিবী বা মাটির দেবতা, আনু আকাশ দেবতা, ইয়া জলের দেবতা, শামাশ সূর্য-দেবতা ও নান্নার চন্দ্র-দেবতা। সুমেরদের প্রতিটি শহরের ছিল আলাদা দেবতা, তবে অন্যান্য দেবতাদেরকেও তারা পুজো করত। উরের প্রধান দেবতা ছিল নান্নার আর ইরিদু শহরের প্রধান দেবতা ইয়া। উরের নান্নার দেবতার বড় মন্দির ছিল, এখানে সবাই আসত পুজো করতে। প্রাচীন মানুষদের মত সুমেরিয়ানরাও বিশ্বাস করত দেবতারা মানুষের বেশে পৃথিবীতে আসেন কাজেই তাদের জন্যে বাড়ি বা মন্দির, খাবার, পোশাক এবং আসবাব দরকার। সুমেরিয়ানদের বেশির ভাগ সময় কেটে যেত দেবতার পুজোয়। তারা দেবতাদের জন্যে আসবাব ও পোশাক বানাত, শহরের দেয়ালের বাইরে শতশত একর জমিতে ফলানো শস্য আর বালি উৎসর্গ করত দেবতাদের ভোগে।

উরের মন্দিরের মাঝখানে থাকত নান্নার দেবতার প্রকাণ্ড মূর্তি। ইটের তিন স্তর বিশিষ্ট বেদীর উপরে বসানো থাকত মূর্তি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো ওখানে। সুমেরিয়ান রাজা উর নান্নু এ বেদী তৈরি করেন। আবিষ্কৃত ইটের গায়ে তার নাম পাওয়া গেছে। মন্দিরের চারদিকে ছিল উঁচু দেয়াল। দেয়াল বা ঘেরাওর মাঝখানে একটি প্রাসাদ থাকত ক্ষমতাসীন রাজার জন্যে। রাজার বাড়ি অন্যান্যদের বাড়ির মতই ছিল শুধু আকারে একটু বড়। কারণ রাজার বাড়িতে তার পরিষদ এবং ভৃত্যরাও থাকতেন। মন্দিরের পূজারীও ঘেরাওর মাঝখানেই থাকতেন। নান্নারকে শহরের আরো ছোট ছোট মন্দিরের ভক্তরাও পুজো করত। নান্নার এর বউ, নিঙ্গাল দেবীর জন্যেও অনেক ছোট মন্দির ছিল।

প্রতিটি সভ্যতার মত সুমেরদের সমাজেও পরিবারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাবা ছিলেন পরিবারের মাথা। তার চাষাবাদের জমি থাকত এবং এ জমি মৃত্যুর আগে স্ত্রী বা পুত্রের হাতে দিয়ে যেতেন।

সুমের-এ প্রধান তিন শ্রেণীর মানুষের বাস ছিল। সবার ওপরে পূজারী, সরকারী কর্মকর্তা ও সেনা কর্মকর্তা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যবসায়ী, কৃষক ও কারিগর আর সবার শেষে ক্রীতদাসরা। সবচেয়ে সম্মান পেতেন মন্দিরের পূজারীরা, কারণ দেবতার দাস তাঁরা। সুমেরিয়ানরা বিশ্বাস করত দেবতারা মানুষের নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির মূল, তাই দেবতাদেরকে খুশি রাখতে হবে।

মন্দিরের পূজারীদের নানা কাজ করতে হতো। তারা মন্দিরের বাইরের জায়গা জমি দেখাশোনা করতেন, গুদাম ঘরের প্রতি লক্ষ রাখতেন, ব্যবসাও করতেন। যেমন উদ্বৃত্ত খাদ্যের বিনিময়ে পাথর, কাঠ ও মূল্যবান ধাতু নিয়ে আসা। এগুলো মন্দির ও চত্বর সাজাতে লাগত।

পূজারীদেরকে শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে দেখা হতো। মন্দিরের মধ্যে বসে তারা শিক্ষা দিতেন, অসুস্থ মানুষের সেবা করতেন, ঝগড়া বিবাদ মেটাতেন এবং পঞ্জিকার হিসাব রাখতেন। সুমেরিয়ান বছর হিসেব করা হতো চাঁদ দেখে। বার মাসকে ঘন্টা ও দিন হিসেবে ভাগ করা হতো। মাস ছিল ৩০ দিনের, বছর ৩৬০ দিনের।

সুমেরিয়ান রাজাদের কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শুরুর দিকে সুমেরে কোন রাজা ছিল না। শহর নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রধান পূজারীগণ। কিন্তু শহরের আয়তন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে একজন প্রধান পূজারীর পক্ষে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন পূজারীদের মাঝ থেকে বুদ্ধিমান একজনকে নির্বাচিত করে তাকে শহরের বিভিন্ন কাজ দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ থেকে রাজার পদের সৃষ্টি। রাজা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য তদারকি করতেন। তিনি আইনের অনুশাসন জারী করেন। খাল বিল ও রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষনও তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল। প্রতিবেশী রাজা বা উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ হলে রাজা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন।

রাজাকে সাহায্য করতেন পূজারী সহ সরকারী কর্মকর্তারা। রাজার একার পক্ষে আইন আদালতের কাজ করা সম্ভব ছিল না। তার সহকারীরা তার ভার অনেকটাই লাঘব করেন।

কৃষক আর ব্যবসায়ীরা শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য মজুত করে রাখত। তারা গোটা সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে দূরবর্তী অন্যান্য শহরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কারিগররা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সুন্দর করে তোলে শহর। ভাস্কররা দারুণ সব মূর্তি বানাত, ছুতোররা অপূর্ব সুন্দর ছবি, দরজা এবং আসবাব বানাত, স্বর্ণকাররা রূপো, সোনা দামী পাথর দিয়ে বানাত সুদৃশ্য গহনা। অস্ত্র নির্মাতারা তামা পিটিয়ে নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করত। সুমেরিয়ানরা যুদ্ধবাজ জাতি বলে প্রায়ই প্রচুর অস্ত্রের দরকার হতো।

সুমেরে সবচেয়ে দক্ষ কারিগর ছিল সীল-কাটাররা। রাজা, পরিষদ বর্গ, প্রধান পূজারী এবং ব্যবসায়ী সকলেরই চিঠিপত্র, হুকুম নামা, বৈধ ডকুমেন্ট, হিসাবপত্তর রাখা ইত্যাদি কাজে সীল মোহরের দরকার হতো। সীল বানানো হতো মাটি কিংবা পাথর, তৈলস্ফটিক অথবা হাতির দাঁত দিয়ে। তাতে দেবতার মূর্তি, প্রাণী কিংবা মানুষের চেহারা খোদাই করা থাকত। এ ধরনের প্রচুর সুন্দর সুন্দর সীল মোহর পাওয়া গেছে।

ক্রীতদাসরা ছিল ধনীদের ভৃত্য, ঘরে এবং মাঠে কাজ করত। এদের বেশিরভাগই শত্রুসৈন্য, পরাজিত হয়ে ক্রীতদাসত্ব বরণ করতে হতো। ক্রীতদাসরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখত, পরিষ্কার করত আবর্জনা এবং লোকের বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে আসত। কেউ কেউ পয়সার বিনিময়ে স্বাধীন হয়ে জমিজমাও কিনে নিত।

সুমেরিয়ানরা লেখার একটি অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করে যার নাম কিউনিফর্ম বা কীলকাকার। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে তারা পিক্টোগ্রাম বা বস্তুর আউটলাইন (দেহ রেখা) আঁকত মাটির ফলকে, নলখাগড়ার কলম দিয়ে। উরেরে এ ধরনের প্রচুর মাটির ফলক পাওয়া গেছে। এ থেকে সুমেরিয়ানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। পিক্টোগ্রামের উন্নয়ন ঘটে মিশ্র ছবিতে এবং প্রতীকে যা শব্দের সিল্যাবলকে উপস্থাপন করত। অবশেষে তারা এক ধরনের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে যাতে ৬০০ প্রতীক ছিল। একটি সুমেরিয়ান মুদ্রালিপিতে পাওয়া গেছে এ লেখা : নান্নারের জন্যে, রাজা উর-নান্নু মহাশক্তিশালী মানব, উরের রাজা, সুমের ও আক্কাদের রাজা, বিরাট খালটি খনন করেছেন, এটি তার প্রিয় খাল।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের তীরে শহর ও নগরীর সংখ্যা বেড়েই চলছিল। দু'একটি শহরের সম্পদ ও শক্তি অন্যদের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা প্রতিবেশীদেরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিল। এভাবে জন্ম হয় রাজবংশের। আর এ রাজবংশ সুমেরে হয়ে ওঠে চরম ক্ষমতার প্রতিভূ। সুমেরিয়ান ডাইন্যাষ্টি বা রাজবংশের পারিবারিক বৃক্ষের ডালপালা কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে কয়েকজন শাসকের কথা জানা গেছে। ২৭০০ থেকে ২২৮০ খ্রীষ্টপূর্বে উর ছিল প্রধান শহর। শুব-আদ-এর কবর আবিষ্কার হয়েছে উর থেকে। কবরের কারুকাজ দেখে ধারণা করা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এক রাজার স্ত্রী। সমাধিতে তার সঙ্গে কবর দেয়া হয় একটি হার্প, ষাঁড়ের মাথা বাঁধা, নীলকান্তমণি ও নানা বোলা।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭০-এ সুমের জয় করেন প্রতিবেশী সেমিটিক সর্দার প্রথম সারগন। তিনি উরের-এর রাজাকে পরাজিত করেন, সেই সাথে পরাজিত করেন লাগাশ ও অন্যান্য শহর। তিনি এবং তার পরিবার একশ কুড়ি বছর সুমেরিয়ান ও তাদের প্রতিবেশী আমোরাইট এবং আক্কাডিয়ানদেরকে শাসন করে গেছেন।

সারগনের নাতি নারামসিন নিজেকে পৃথিবীর চারদিকের রাজা বলে ঘোষণা করেন, যদিও শেষতক উরের-এর সেনাবাহিনীর কাছে এক যুদ্ধে পরাজিত হন। আবার উর সুমের এর নগর শাসন করতে থাকে নতুন এক রাজবংশের অধীনে। তবে খ্রী. পূ. ২০০০ সালে প্রতিবেশীরা সুমেরের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বিখ্যাত সুমেরিয়ানদের পতন হয়।

সুমেরিয়ান সভ্যতার মৃত্যু ঘটেনি তবে বেবিলন তাকে আত্মভূত করেছে। বেবিলন এ সভ্যতা থেকে সেরা জিনিসগুলো বেছে নেয়। সুমেরিয়ানরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক উচুঁতে অবস্থান করছিল; অথচ ওই সময় ইউরোপে বাস করা নিওলিথিক মানুষরা সভ্যতার আলোই দেখেনি।

# ফারাওদের দেশ

সুমেরিয়ানরা মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে থিতু হয়ে বসার পরে ওখানকার উর্বর জমিতে চাষাবাদ করে সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলে। একই রকমের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল মিশরে। সেখানে নীল নদের উর্বর তীরে কয়েকটি জাতি মিলিত হয় আনুমানিক খ্রী.পূ. ৫০০০ অব্দে। ওখানেই তারা নিবাস গড়ে তোলে। ওইসব জাতির মধ্যে ছিল লিবিয়ান, তারা প্রাচীন ইউরোপীয় মানবের বংশধর, ছিল এশিয়া থেকে আসা সেমিট এবং আফ্রিকার উষ্ণতর অঞ্চলের নুবিয়ানরা।

এই মিশ্র জনসংখ্যা প্রধান দুটি এলাকায় বসতি গড়ে তোলে, আসিয়াতের নিচের উপত্যকায় যা পরিচিতি লাভ করে উচ্চতর মিশর এবং অন্য অংশটি ফাইয়ুম জেলা বা নিম্নতর মিশর। দীর্ঘ একটা সময় এরা পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, তারপর খ্রী. পূ. ৩১০০ অব্দে উচ্চতর মিশরের রাজা উত্তরের (নিম্নতর) রাজ্যে হামলা চালিয়ে ও এলাকা দখল করে নেন। সেই থেকে মিশর একজন শাসকের অধীনে একত্রে শাসিত হতে থাকে।



*ফারাওদের এই বিশাল মনুমেন্ট তৈরিতে লাখ লাখ মানুষ ত্রিশ বছর কাজ করেছে। পিরামিডের সঙ্গে সূর্য-দেবতা ফারাওর সিম্বলিক গুরুত্ব ছিল*

খ্রী. পূ. প্রায় ৩৫০০ অব্দে পারস্য উপসাগর থেকে সেমেটিক জনসাধারণের জোয়ার নেমে আসে উচ্চতর মিশরে। তারা শীঘ্রি এবং শান্তিপূর্ণভাবে মিশে যায় মিশরীয়দের সঙ্গে। এতে মিশরের লাভই হয়েছিল কারণ সেমিটরা ছিল বুদ্ধিমান এবং অধিকতর সংস্কৃতিবান। সুমেরিয়ানদের সঙ্গে বেশ কয়েক বছরের বাণিজ্য করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল এবং তারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত; এবং পারত তৈজসপত্র তৈরি করতে। সুমেরিয়ানদের কিউনিফর্ম পাণ্ডুলিপির সঙ্গেও তাদের পরিচিতি ছিল।

এই উপনিবেশ উচ্চতর মিশরীয়দেরকে নিম্নতর মিশরীয়দের তুলনায় দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবে পরে আরো সেমিটরা উত্তরের রাজ্যে ঢুকে পড়ে। ওই সময় রাজা মেনেস গোটা দেশ দখল করে ফেলেছেন, মিশরীয় ও সেমিটরা মেলামেশার মাধ্যমে একই ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা অবশ্য তখনো কৃষিকাজই করত তবে চাষাবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ বলে হস্তশিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ার মত সময় তাদের হাতে ছিল। আর এটা সভ্যতা ও সৃষ্টিশীলতার দিকে তাদেরকে নিয়ে যায় আরো এক ধাপ।

সুমেরিয়ানদের মত মিশরীয়রা শুরুতেই বড় বড় দালান কোঠা তৈরি করেনি। অল্প কয়েকটি বাজার-শহরের সাথে গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এসব জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সবচেয়ে বড় শহরটি ছিল রাজার, তবে এ শহরের অবস্থান বদলে যেত ক্ষমতাসীন শাসকের মর্জিতে। মেনেস ছিলেন গোটা মিশরের প্রথম রাজা। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা মিলে গঠন করেন প্রথম রাজবংশ বা প্রথম শাসক পরিবার। মেনেসের বংশধররা তার মৃত্যুর পরেও বহুদিন রাজ্য শাসন করেছেন। মেনেস ও তার বংশধর জোসের-এর (ইনি মেনেসের ৫০০ বছর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন) মধ্যবর্তী কালটা ছিল প্রায় ফাঁকা। এ সময় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি।

মেনেস সম্পর্কে জানা যায় তিনি ছিলেন কর্মঠ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ফারাও (মিশরীয়রা তাদের শাসনকর্তাকে 'ফারাও' সম্বোধন করত)। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল মিশরীয় চাষাবাদ তত্ত্ব। তিনি নাইলো মিটার নামে একটি যন্ত্রের সাথে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে নীল নদের জল মাপা হতো। কোন্ তীরে কতটুকু জল আছে তা নাইলোমিটারের সাহায্যে নিরূপণ করা যেত। নদীর কয়েকটি পয়েন্টে থাকত পর্যবেক্ষণকারীরা। তাদের কাজ ছিল জলের লেভেল পরীক্ষা করে দেখা এবং বন্যার সম্ভাবনা থাকলে সে ব্যাপারে চাষীদেরকে সাবধান করে দেয়া। ফলে নীল নদে বন্যা আসার আগেই চাষীরা সতর্ক হয়ে যেত এবং বন্যার জল তাদের জমিতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি ঢুকতে দিত না।

নীল নদের উপত্যকায় আজও, আগস্টের মাঝামাঝি থেকে টানা দুইমাস প্লাবন ঘটে। এ প্লাবনে অবশ্য কৃষকদের লাভই হতো। তারা পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ করতে পারত। জমিতে ধানের চারা লাগানোর পরে বন্যার জল সূর্যতাপে খটখটে হয়ে থাকা মাটি ধুইয়ে দিয়ে পলির প্রলেপ ফেলে দেয়। অক্টোবরে চলে যায় বন্যা এবং তখন বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। পলি মাটির উর্বর আশ্রয়ে দ্রুত বড় হয়ে ওঠে শস্য।

নীল নদের বন্যায় উর্বর মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপাদন করার সুবাদে সবচেয়ে গরীব কৃষকটির মুখে হাসি লেগে থাকত। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত

শস্য বিক্রি করে দিত চাষা। তবে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যা প্লাবিত মাটিতে জন্মানো শস্যও আর বিপুল চাহিদা মেটাতে পারছিল না। ফলে নদীর ধারের নতুন মাঠে শস্য ফলানো হতে থাকে। তবে এ জমিতেও সেচের প্রয়োজন ছিল– কারণ মিশরে বৃষ্টিপাত হতো খুবই কম।

মিশরীয়রা মাঠে সেচ পরিচালনার একটি উপায় আবিষ্কার করে। এর ফলে মাঠ আর বন্যা কবলিত হবার সম্ভাবনা থাকত না। নদীর তীর ঘেঁষে, মাঠের বুক চিরে কাটা হলো খাল। বন্যার জল তীরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঢুকে গড়িয়ে পড়বে খালে। মাঠে যখন শস্য ফলানোর জন্যে যথেষ্ট জল থাকবে, বন্ধ করে দেয়া হবে ফাঁকা জায়গা এবং ভাটির দিকে খুলে দেয়া হবে আরেকটি খাল। বস্তুত এভাবে গোটা নীল উপত্যকায় ফসল ফলানো হয় এবং চাষীরা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। 6



*তিন মিশরীয় দেবতার মূর্তি: (বাম থেকে ডানে) হোরাস, আকাশ দেবতা, আইসিস, সকল জিনিসের মা ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ওসিরিস*

মেনেস 'পরিখা খনন'–এর উৎসব পালন করতেন। তার উত্তরাধিকারীরাও এ নিয়ম অনুসরণ করে গেছেন। উৎসবের আগেই পরিখা বা খানা খনন করা হতো, অল্প মাটি দিয়ে নদীর খালের সাথে ওগুলোকে আলাদা করে ফেলা হতো। জল ফুলে ফেঁপে উঠলে রাজা একটি খাল থেকে কোদাল দিয়ে কেটে মাটি সরিয়ে ফেলতেন, তখন জল এসে ঢুকত পরিখায়। মাটি ধুয়ে জলে ভরে যেত পরিখা আর রাজা তখন নদীর ধারে যেতেন আরেকটি খামারের পরিখা খুঁড়তে।

মেনেস মেমফিসের কাছে প্রকাণ্ড একটি নগরী নির্মাণ করেন, ওটার রূপান্তর ঘটে মিশরের রাজধানীতে। এ নগরীতে তিনি গঠন করেন সরকার। বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়ার জন্যে নিয়োগ করা হয় কর্মকর্তাদেরকে। সকল ভূমি মালিক ও তাদের জমির পরিমাণ রেকর্ড করে রাখার জন্যে সৃষ্টি করা হয় ল্যাণ্ড-রেজিস্ট্রি। এ কাজটি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ নীল নদে বন্যার পরে সীমানার মাঝখানের প্রতিবেশী খামারগুলো মুছে যেত নতুন চড়া পড়ে, ফলে ভূমি-মালিকদের মধ্যে জমির দখল নিয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ বেঁধে যেত।

মেনেসের প্রজারা তাকে দেবতার মত ভক্তি করত। এরকম ভক্তিশ্রদ্ধা তার বংশধররাও পেয়ে এসেছেন। জোসেরের সময়ে (খ্রী. পূ. ২৬৫০ অব্দ) মিশরীয়রা বিশ্বাস করত ফারাওরা দেবতা, সরাসরি স্বর্গ থেকে এসেছেন তাদেরকে শাসন করতে। মেনেস একটি ধর্মীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে পুরোহিতরাই ছিলেন প্রধান, পুরোহিতরা জনগণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে ফারাওকে পূজা করতে হবে। পুরোহিতরা ফারাওর সরকারের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে চতুর এবং শিক্ষিত। তারা বক্তৃতা দিয়ে এবং লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ফারাওকে অতিমানব রূপে হাজির করেছেন। তারা নানা কিংবদন্তীর গল্প-কাহিনী ফাঁদতেন ফারাও ও তার পূর্ব-পুরুষদেরকে নিয়ে। ফলে ফারাওকে সবাই পুজো করত।

পুরোহিতরা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতাকে জনগণের সামনে বিবর্ধিত করেন। একজন আইসিস, অপরজন ওসিরিস। আরো প্রচুর মিশরীয় দেব-দেবী আছেন। তবে মিশরীয়রা সবচেয়ে ভক্তি করত দেবতা রা, আইসিস ও ওসিরিসকে।

দেবতাদের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় সূর্য দেবতা রা ছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্টি। তার চার সন্তান-গেব, শু, টেফনাট, এবং নাট। গেব ছিলেন পৃথিবী দেবতা, নাট আকাশ দেবী। জেব ও নাটের আবার চার ছেলে মেয়ে– ওসিরিস ও সেথ, দুই ছেলে, আইসিস ও নেফসিস, দুই মেয়ে। গেবের পরে ওসিরিস সিংহাসনে বসেন এবং বোন আইসিসের সাহায্যে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পৃথিবী শাসন করতে থাকেন। আইসিসকে পরে তিনি বিয়েও করেছেন। সেথ ওসিরিসকে খুব হিংসে করতেন এবং তাকে খুন করে লাশ অসংখ্য টুকরোয় খণ্ড বিখণ্ড করে মিশরের বিভিন্ন স্থানে ওগুলো কবর দেন। মাথা কবর দেয়া হয় আবিডোসে।

শোকাতুর আইসিস স্বামীর খণ্ডবিখণ্ড লাশ উদ্ধার করেন। শেয়াল দেবতা অ্যানুবিসের সাহায্যে তিনি আবার জ্যান্ত করে তোলেন ওসিরিসকে। তবে ওসিরিস আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারেন নি। বদলে পাতাল চলে যান তিনি এবং হয়ে ওঠেন মৃত্যুর দেবতা। অবশেষে তার ছেলে হোরাস সেথকে ধাওয়া করেন এবং ভীষণ এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। রা তখন সেথকে মরুভূমিতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন, হোরাস বাবার বদলে সিংহাসনে বসেন।

সূর্য দেবতা রা মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। তিনি আলো ও জীবন দান করেন। তবে ওসিরিসকেও শত শত বছর পুজো করা হয়েছে, আবিডোসে তার মন্দির হয়ে উঠেছিল তীর্থস্থান। আইসিসও দেবী হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নন। মিডল কিংডোম-এর সময়ে লোকে তার পূজো করত বেড়াল দেবী পাশট-এর সাথে।

মিশরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করত ফারাওর মৃত্যুর পরে তার আত্মা চলে যায় স্বর্গে, সেখানে দেবতাদের মাঝে নিজের জায়গা করে নেন তিনি। তবে রাজার শরীর যদি কবরে পচে যায় তাহলে? সে সমস্যারও সমাধান করেছে মিশরীয়রা। ফারাওর শরীরে সুগন্ধি ওষুধ মাখিয়ে তাজা রাখত লাশ এবং কবর দিত শক্তি মাটিতে। এসব কবর বহু আগে থেকে তৈরি করে রাখা হতো। এ থেকে মিশরে বড় বড় পিরামিডের সৃষ্টি।

জোসের প্রথম ফারাও যার কবরের উপরে গড়ে উঠেছে পিরামিড। নীল নদের তীরে সাক্কারায় এ পিরামিডের নাম স্টেপ পিরামিড। জোসের ইমহোটেপ নামে এক ভাস্করকে এ কাজে নিয়োগ দেন। ইমহোটেপ ভাস্কর হিসেবে এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে মিশরীয়দের পরবর্তী বংশধর তাকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। ইমহোটেপের পিরামিড (২০০ ফুট উঁচু) ৫০০০ বছর পরেও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

মিশরে আরো অনেক পিরামিড আছে যেগুলো জোসেরের পরে এবং দশম রাজবংশের ফারাওদের (এরা খ্রী. পূ. ২২০০-২১০০ অব্দ রাজত্ব করেছেন) আগে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো গিজার পিরামিড। এ পিরামিড নির্মিত হয় খ্রী. পূ. ২৫৫০ অব্দে, ফারাও খুফুর (চিওপস) আমলে। প্রকাণ্ড এই দালানটি উচ্চতায় ৪৮০ ফুট এবং প্রতি কোণের ব্যাসার্ধ ৭৮০ ফুট। প্রাকৃতিক ভাবে শত বছর ধরে ক্ষয় সাধনের পরেও এ পিরামিডের আকার আকৃতি প্রায় আগের মতই আছে। খুফুর পিরামিড তৈরিতে ২৫ লাখ পাথরের ব্লক (একেকটির ওজন $২\frac{১}{২}$ টন) ব্যবহার করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্লকগুলো রয়েছে সমাধির ভেতরে, ওজন ৫০ টন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টে, যাঁর মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে ছিল অপার কৌতূহল, প্রথম মিশরীয় পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন গিজার পিরামিডে যে পরিমাণ পাথর আছে তা দিয়ে গোটা ফ্রান্সের চারদিকে দশ ফুট উঁচু এবং এক ফুট ঘন দেয়াল তোলা সম্ভব।

ফারাওদেরকে পিরামিডে সমাধিস্থ করার সময় তাদের সম্পদও সাথে কবর দেয়া হতো। এসবের মধ্যে থাকত সিন্দুক ভর্তি অমূল্য গহনা, ধাতব, দারুণ দারুণ তৈজসপত্র এবং দামী কাপড়। দশম রাজবংশের পতনের কিছুদিন পরেই একদল চোর, যারা পিরামিড কিভাবে তৈরি হয়েছে জানত, ভেতরে ঢুকে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়, কবরে রিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন ফারাও।

পিরামিড মিশরীয়দের অগ্রগতির প্রমাণই শুধু নয়, এর সঙ্গে জড়িত ছিল লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসও। ধর্ম মিশরীয়দের দৈনন্দিন জীবনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে, প্রাচীন অনেক মিশরীয় পাণ্ডুলিপিতেই ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, পৌরাণিক গল্প-কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রাচীন মিশরীয়রা ছবির সাহায্যে এক ধরনের লেখা আবিষ্কার করে। ইংরেজিতে একে বলে হাইরোগ্লিফ। এই লিখিত ভাষায় নানা জিনিসের ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। তবে প্রতীকগুলো ছিল প্রচণ্ড জটিল। ফলে লিখতে বা খোদাই করতে প্রচুর সময় লেগে যেত। পরে মিশরীয়রা আরেকটু সরল ও দ্রুত হাইরোগ্লিফ আবিষ্কার করে যা প্রতিদিনকার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করত।

হাইরোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হয়। পরে প্যাপিরাসের রোলে। প্যাপিরাস আবিষ্কার ছিল লেখার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের বিরাট ধাপ। প্যাপিরাস থেকেই পেপার বা কাগজ শব্দটির উৎপত্তি। নীল উপত্যকায় প্যাপিরাস গাছ জন্মাত প্রচুর। এ গাছের কাণ্ডের ছাল ছড়িয়ে পাশাপাশি রাখা হতো। একটি উপরে আরেকটি ফালি রেখে রোদে শুকানো হতো। তারপর ফালিগুলোকে চাপ দিয়ে বানানো হতো প্যাপিরাসের শীঠ বা গোটা কাগজ। এ কাগজে নলখাগড়ার মুখ কেটে সরু করে তাতে ফালি লাগিয়ে লেখা হতো। প্যাপিরাস যত ইচ্ছা লম্বা করা যেত, রোল লম্বায় হতো ২০ থেকে ৩০ ফুট। এগুলোকে বই হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একশ ফুট লম্বা পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

মিশর কৃষিজীবী জাতি হিসেবে পরিচিতি পেলেও এ সভ্যতা গোটা শতক জুড়ে ক্রমে সমৃদ্ধির দিকে এগোতে থাকে। ভাস্কর্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটছিল। প্রাচীন মিশরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদরা যে পঞ্জিকা আবিষ্কার করে গেছেন, সামান্য কিছু পরিবর্তনের পরে ওই পঞ্জিকার চল এখনও আছে। মিশরীয়দের বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি যে নীল নদে নিয়মিত বন্যা আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা প্রতি ২৮ দিন অন্তর পূর্ণিমা আসে। প্রাকৃতিক এ সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তারা পঞ্জিকা তৈরি করে যা নীলনদের কৃষকসহ সবার উপকারে আসে।

দ্বাদশ রাজবংশের (খ্রী.পূ. ২০০০-১৭৯০) শেষ লগ্নে ফারাও তৃতীয় আমেনেমহেট সিরিয়ায় সফল হামলা চালিয়ে তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে গাজা থেকে উগারিট পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেও এর ফলাফল সুফল বয়ে আনতে পারেনি মিশরের জন্যে। এই হামলা মিশরকে নানা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে এবং প্রায় প্রথমবারের মত মধ্য-পূর্ব সাম্রাজ্যের সঙ্গে দেশটির সংঘাত শুরু হয়।

আমেনেমহেট এর বিজয় ছিল স্বল্পস্থায়ী। খ্রী.পূ. ১৭০০ অব্দে সেমিটদের ভয়ঙ্কর একটা ঢেউ, যাদেরকে মিশরীয়রা বলত হাইকসোস (বিদেশী), তারা সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দেয় মিশরীয়দেরকে। হাইকসোসরা নীল ডেল্টা

অধিকার করে এবং দখল করে নেয় ওখানকার চমৎকার শহর ও দালান কোঠাগুলো। আভারিস-এ তারা নিজেদের রাজধানীও স্থাপন করে, নিরাপত্তার জন্যে চারদিকে গড়ে তোলে মজবুত দেয়াল।

দুটি কারণে হাইকসোসরা মিশরীয়দেরকে পরাজিত করতে পেরেছে। একটি ছিল তাদের ঘোড়ায় টানা রথ; মিশরীয়রা এর আগে ঘোড়া কিংবা রথ দেখেনি। অন্যটি হলো হাইকসোসদের ব্রোঞ্জ (তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু) ব্যবহারে দক্ষতা। তারা ব্রোঞ্জের অস্ত্র ব্যবহার করেছে যুদ্ধে। হাইকসোসদের লোহার অস্ত্রও ছিল।

হাইকসোসরা প্রায় দুই শতাব্দী শাসন করেছে নীল উপত্যকা। ফারাওরা সিংসাসনে বসার অনুমতি পেলেও তাদের ক্ষমতা সীমিত করে দেয়া হয়। তবে এ বিজয় মিশরীয়দের জন্যে মন্দ ছিল না। হাইকসোসরা মিশরীয়দেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নতুন যুদ্ধ-কৌশল। তারা নিয়মিত সেনাবাহিনী (অফিসার সহ) কি জিনিস তা শিখিয়েছে, দেখিয়েছে কিভাবে যুদ্ধের রথ ব্যবহার করতে হয়।

খ্রী. পূ. ১৫৬৭ অব্দে, অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম আহমোস ফারাওদের হারানো শক্তি ফিরে পেতে সাবধানে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন উৎসাহী লোকজন নিয়ে। তারপর মিশরীয়রা নীল ডেল্টায় হাইকসোসদের উপরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। মজার ব্যাপার, তারা হাইকসোসদের কাছ থেকে শেখা যুদ্ধ কৌশল (ঘোড়ায় টানা রথ) তাদের ওপরেই প্রয়োগ করে যুদ্ধে জিতেছে। আহমোস হাইকসোদেরকে-প্যালেস্টাইন পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যান এবং তার উত্তরাধিকারীরা সিরিয়া দখল করে।

হাইকসোদেরকে পরাজিত করে আহমোস দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মিশরীয়দের মাঝে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মিশরের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করবেন এবং দেশের সীমানা ছড়িয়ে দেবেন মিশরীয় জীবন পদ্ধতি।

অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম দিকের ফারাওরা বিজয়ের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং মিশরীয় ইতিহাসের ওই সময়টি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। তারা দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করেছেন। তাদের রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণে বর্তমান সুদান পর্যন্ত, সেই সাথে লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূল থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত, তার সাথে গোটা প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ছিল।

প্রথম থুতমোস (খ্রী. পূ. ১৫৩০–১৫০০) মেসোপটেমিয়ায় আসিরিয়ান ও বেবিলোনিয়ানদেরকে পরাজিত করেন। তার রাজত্বকাল ছিল এক স্বর্ণযুগের স্বাক্ষর, অ্যাবিডোসে ও সিরিসের মন্দিরের দেয়ালে লেখা আছে :

*আমি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যকে বৃদ্ধি করেছি, যে সব রাজা শাসন করে গেছেন আমার আগে। দেবতাদেরকে যথাযথভাবে পূজা করা হয়েছে এবং মন্দির করা*

*হয়েছে অলঙ্কৃত। সূর্যের মত দূরত্বে আমি মিশরের সীমানা বিস্তৃত করেছি এবং মিশরকে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে শক্তিশালী করে তুলেছি ..... '*

থুতমোস প্রথমের পরে সিংহাসনে বসেন থুতমোস দ্বিতীয়। ইনি তার সৎবোন হাতসেপসুতকে বিয়ে করেছিলেন। প্রথম থুতমেসের দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়ে হাতসেপসুত। দ্বিতীয় থুতমোস তার বাবার সাফল্যকে ধরে রেখে আরো নতুন নতুন রাজ্য জয় করেছেন, তবে খ্রী.পূ. ১৪৯০ তে তার মৃত্যু হলে মিশরীয় নীতি নির্ধারণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যখন তার স্ত্রী গোটা সাম্রাজ্যের শাসনভার হাতে তুলে দেন।

হাতসেপসুত ছিলেন অসাধারণ এক রানি। দ্বিতীয় থুতমোসের মৃত্যুর পরপর তিনি নিজের সর্বশক্তি দালান কোঠা নির্মাণের বদলে ঘরের কাজে ব্যয় করেন। রানির পূর্বপুরুষরা যুদ্ধে পরাজিত যে সব বন্দিদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিলেন তিনি তাদেরকে বড় বড় কারিগরি কাজে লাগিয়ে দেন–এর মধ্যে ছিল প্রাসাদ নির্মাণ, মন্দির, রাস্তা ও ঘরবাড়ি তৈরি। রাজ্য দখল করে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরণ করা হয়েছিল তা ব্যয় করা হয় মিশরের নগরগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন এবং প্রকাণ্ড বাণিজ্য জাহাজের পেছনে। টাকা ও নানা জিনিসের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে তা প্রভূত উপকারে আসে সওদাগর, কারিগর, শিল্পী, দোকানদার ও কৃষকদের, মিশরের জীবন যাত্রার মান উঁচু হারে বেড়ে যায়।

ওই সময় থেকে যে সব দালান কোঠা এখনো টিকে আছে তার মধ্যে রানি হাতসেপুসুতের কবরও রয়েছে। রানিকে কবর দেয়া হয় থেবস-এর কাছে ভ্যালি অব দ্যা কিংস-এর চুড়োয়। এ কবর রানির বাবা ও তার নিজের স্মৃতিমন্দির হিসেবে তৈরি করা হয়। অপূর্ব সুন্দর কবরটি তৈরিতে মিশরের অন্যতম সেরা ডিজাইনার এবং রানির প্রধান স্থপতি সেলেমুট কোন সময় দেননি।

হাতসেপসুত-এর উত্তরাধিকারীরা নীল উপত্যকা বা নাইল ভ্যালির এ অংশে গোপন প্রবেশপথ সহ কবর তৈরি করেন। তারা আশা করেছিলেন এর ফলে কবর চোররা ফারাওদের বিশ্রামের জায়গার সন্ধান পাবে না।

হাতসেপসুত প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যকে মারাত্মক দুর্বল করে ফেলেন। ফলে তৃতীয় থুতমোস ক্ষমতায় এসেই রাজ্য সীমানা বৃদ্ধির আগেকার নীতিতে ফিরে যান। থুতমোস রাজ্য শাসন করেছেন খ্রী. পূ. ১৪৮০ থেকে ১৪৫০। তিনি ছিলেন শক্তিশালি ও আক্রমণাত্মক স্বভাবের শাসক এবং সম্ভবত অষ্টাদশ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাও। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়াসহ এ দেশ ছাড়িয়ে বহুবার অভিযান চালিয়েছেন তিনি এবং মিশরীয় শক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বিজিত দেশে স্থায়ী সেনা দুর্গ গড়ে তোলেন। তিনি স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন এবং মিশরীয় বংশোদ্ভূত সৎ কর্মকর্তাদেরকে বড়

বড় পদে বসান। থুতমোস-এর শাসনের ফলে এ এলাকায় তার উত্তরাধিকারীরাও ক্ষমতায় থাকতে পেরেছেন এবং সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ীত্ব গোটা মিশরকে সমৃদ্ধির স্বাদ পাইয়ে দেয়।

পরবর্তী ফারাও যার শাসনামল বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে তিনি চতুর্থ আমেনহোটেপ (বা আখেনাতন)। ইনি খ্রী. পূ. ১৩৭৫-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। টানা আশি বছর একটি ধনী ও শক্তিশালি রাজ্য চালিয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে। ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল আমেনহোটেপের, অন্য কোন দিকে খেয়াল করতেন না। ফলে সাম্রাজ্যে ধস নামতে শুরু করে। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন শাসন করতেন যে মিশরীয় বংশোদ্ভুত কর্মকর্তারা, তারা হিতিতদের সহজ শিকারে পরিনত হন। হিতিতরা ফার্টাইল ক্রিসেন্টের উত্তরে তাদের রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং দুটি দেশই তারা জয় করে ফেলে।

আমেনহোটেপ ক্ষমতার অপব্যবহার করে চটিয়ে দিয়েছিলেন পুরোহিতদেরকে। সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরোহিতরা ভয়ঙ্কর দেবতা আমেনের অনুসারী ছিলেন তাই আমেনহোটেপ আতন নামে এক দেবতার পুজো শুরু করেন। আতন হয়ে ওঠেন 'একমাত্র দেবতা' এবং তার প্রতীক ছিল সূর্য। আমেন দেবতার পূজারীদেরকে ঠেকাতে রাজা রাজধানী থেবস থেকে দরবার সরিয়ে নিয়ে আমারনায় স্থাপন করেন। এবং ওখানে আতনের নামে মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি এমন ঘোষণাও দিয়েছিলেন কেউ আতন ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজো করতে পারবে না। তিনি এমনকি নিজের নাম পাল্টে রাখেন আখেনাতন যার অর্থ যিনি আতনকে সুখী রাখেন। আখেনাতন নতুন পারিষদবর্গ বেছে নেন ও সদস্যপদ থেকে বহিস্কার করেন পুরোহিতদেরকে।

আখেনাতন প্রথম মিশরে সিভিল সার্ভিস চালু করেন। তিনি মিশরের বিভিন্ন জেলায় গভর্নর নিয়োগ দিয়ে আদেশ করেন কাউন্সিল মিটিং এর যাবতীয় কার্যপ্রণালী লিখিতভাবে সংগ্রহ করা হবে।

নেফারতিতি নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রানিকে বিয়ে করেছিলেন আখেনাতন। নেফারতিতির আবক্ষ ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই সময় থেকে মিশরের লোকেরা পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি আঁকা শুরু করে।

খ্রী. পূ. ১৩৬০-এ আখেনাতনের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন তার জামাতা তুতানখামেন। তখন তুতানখামেন বালক মাত্র। আখেনাতনের মৃত্যুর পরপরই আমুন-এর পুরানো ধর্মের পুরোহিতরা ফিরে পান তাদের ক্ষমতা এবং বালক-ফারাওর নাম থেকে বোঝা যায় তারা আবার আমুন-এর পুজো শুরু করে দেন এমনকি আখেনাতনের রাজধানী আমার্নাও পরিত্যক্ত বলে ঘোষিত হয়।

তুতানখামেন অল্প কিছুদিন রাজত্ব করেছেন। কৈশোরেই তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর কবর ছিল সকল মিশরীয় নৃতত্ত্ববিদদের সবচেয়ে আগ্রহের বস্তু। এ কবর

আবিষ্কার করেন হাওয়ার্ড কাটার, ১৯২২ সালে। কবরের ভেতরে মহামূল্যবান জিনিসপত্র নিতান্তই অবহেলায় ছড়ানো ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম চেয়ার। তুতানখামেনের লাশ পাওয়া যায় কবরের মধ্যে, মমি করা, দারুণভাবে সংরক্ষিত।

তুতানখামেনের পরে মিশর শাসন করেছেন এক সেনা প্রধান, হারেমহাট। ইনি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি খানিকদূর অগ্রসর হতে পারলেও তার পরবর্তী শাসনকর্তা প্রথম রামেসিসকে (ইনি হারেম হাটের একজন কর্মকর্তা ছিলেন) ভাগ্য মোটেই সহায়তা করেনি।

রামেসিসের পরে ক্ষমতায় আসেন তার ছেলে প্রথম সেটি, ইনি খ্রীঃ পূঃ ১৩১০ থেকে ১২৯০ পর্যন্ত ফারাও ছিলেন। সেটি নিজেকে শক্তিশালি শাসক হিসেবে প্রমাণ করেন, সেনাপ্রধানের ভূমিকাতেও তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদেরকে বরখাস্ত করেন; দেশের কার্যক্রমে কিছু শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করেছেন; এবং দরবারে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন ও তাঁর আন্তরিকতার কমতি ছিল না। তিনি প্যালেস্টাইন দখলেরও চেষ্টা করেছেন। ওই দেশে তিনবার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন এবং হিতিতিরা তার বিরুদ্ধে যে ক'বার সৈন্য পাঠিয়েছে প্রতিবারই তাদেরকে পরাজিত করেছেন।

সেটি নাইলভ্যালিতে, হাতসেপুসুত-এর কবরের কাছে নিজের জন্যে প্রকাণ্ড একটি মন্দির প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

সেতির পরে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে দ্বিতীয় রামেসিস, ইনি খ্রী.পূ. ১২৯০ থেকে ১২২৫ পর্যন্ত ফারাও ছিলেন। তাকে অভিহিত করা হতো 'রামেসিস দ্য গ্রেট' বলে। তার খ্যাতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে একটি মহাকাব্যে।

রামেসিস ক্ষমতা হাতে পাবার কিছুদিন পরেই সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্যালেস্টাইনে। কাদেশ নামে একটি জায়গায় হিতিতিদের সাথে ভয়ানক লড়াই হয় তাদের। সারাদিন দু'পক্ষই প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যায়, সূর্যাস্তের সময় দেখা যায় উভয়েই প্রচুর লোক বল হারিয়েছে। হিতিতিরা রণে ভঙ্গ দিলে রামেসিস ওই দিনটিকে নিজের বিরাট বিজয় বলে ঘোষণা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তিনি ফিরে আসেন মিশরে এবং বিজয় উৎসব পালন করেন।

মিশরীয়রা তাদের ফারাওকে আনন্দের সাথে অভিনন্দিত করলেও কিছুদিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় আসলে কে জিতেছে যুদ্ধে। হিতিতিরা রণে ভঙ্গ দিয়েছিল তাদের শক্তি একত্রিত করতে, তারা আবার দক্ষিণে পা বাড়ায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্যালেস্টাইন দখল করে ফেলে এবং কাদেশ থেকে দুশো মাইল দূরের জেরুজালেমও তাদের হস্তগত হয়। শুধু তাই নয় তারা নতুন জেতা রাজ্যগুলো নিজেদের অধিকারে রাখতে সমর্থ হয় এবং রামেসিসকে তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করে।

প্যালেস্টাইন দখল হবার কারণে রামেসিসের যে ঝামেলা হয়েছিল তা নয়, তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন দেশের প্রজাদের নিয়ে। তারা আন্দোলন পাকিয়ে তুলছিল। কর সংগ্রহ, স্থানীয় সরকার এবং বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল জনগণ। কারণ ফারাও প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়ে নিজের নামে মনুমেন্ট তৈরিতে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। আবু সিম্বেল-এ তিনি নীল উপত্যকায় প্রকাণ্ড মন্দির তৈরির আদেশ দেন। পাহাড় চুড়োয় নিজের চারটে মূর্তিও বসানো হয়, প্রতিটি ৬০ ফুট উঁচু। করনাকেও তিনি মনুমেন্ট বানিয়েছেন। এগুলোকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা স্থাপত্যবিদ্যার মাস্টারপিস বলে অভিহিত করেছেন। প্রধান মনুমেন্ট ছিল বিশাল একটি হলঘর, তিনশ ফুট লম্বা, ছাদটাই ছিল সত্তর ফুট উঁচু।



*তুতান খামেন ও তার রানী।*

রামেসিস দ্য গ্রেট যখন মনুমেন্ট তৈরিতে ব্যস্ত ওইসময় মিশরে অভ্যন্তরীন নানা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল যার প্রতি খেয়াল ছিল না ফারাওর। আর এ সময় থেকে মূলতঃ পতন শুরু হয়ে যায় মিশরের।

খ্রী.পূ. দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে মিশর দখল করে নেয় লিবিয়ান ও ইন্দো-ইউরোপিয়ানরা, এরা হিতিতিদেরও পতন ডেকে আনছিল। বিশাল ও শক্তিশালি সাম্রাজ্য মিশর ক্রমে হারাতে শুরু করে তার প্রভাব, তবে পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখতে পাব কিভাবে মিশরীয় সভ্যতা উত্তরকালীন সভ্যতাগুলোর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে আসিরিয়ান ও গ্রীকদেরকে।

# বেবিলোনিয়ান

সুমেরিয়ান ও মিশরীয়দের চারপাশে যে সব জাতি ছিল তারা তেমন সভ্য কিংব রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল না। কিন্তু এই অল্প সভ্য প্রতিবেশীদে সাথে বাণিজ্য করতে হতো তাদের–সুমেরের দরকার ছিল ধাতু আর পাথর এব মিশরের কাঠ।

খ্রী. পূ. ৩০০০ ও ২০০০ বছরের মাঝখানের সময়টাতে সুমেরিয়ান ও মিশরীয়রা উভয়েই বিভিন্ন জাতির হামলার শিকার হয়েছে, যদিও শাসকরা শত্রুদেরকে দমন করতে পেরেছেন। কখনো হামলাকারীদেরকে সুমেরিয়ান ও মিশরীয় সমাজে স্থান দেয়া হয়েছে, কখনোবা তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে নিজেদের দেশে। তবে এ ধরনের হামলার সংখ্যা খ্রী. পূ. ২০০০ সালের পরে বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়, পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নেয়।



*বিখ্যাত বেবিলোনিয়ান শাসক ও আইন-প্রণেতা হাম্মুরাবি।*

খ্রী.পূ. ১৯৫০-এ পশ্চিম আরব মরুভূমি থেকে আসা সেমিটিক অ্যামোরাইট ও পূব থেকে আসা সেমিটিক এলামাইটরা মেসোপটেমিয়ার সমৃদ্ধতর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তারা নগরী দখল করে এবং উরসহ অন্যান্য সুমেরিয়ান নগর-রাজ্য ধ্বংস করে দেয়। উর দখল করে এলামাইটরা, উরের রাজা ইনিসিন ধরা পড়েন, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইলামে।

অ্যামোরাইটরা এদিকে উত্তরের আরো সুমেরিয়ান উপনিবেশ দখল করে চলছিল। ইউফ্রেটিস নদীর একটি গ্রাম, যা বেবিলন নামে বিশাল নগরে পরিণত হয়েছিল ওটিও দখল করা হয়। বেবিলন ছিল বেবিলোনিয়ার প্রধান নগরী। খ্রী.পূ. ১৮০০-র কিছু কাল আগে আমোরাইটরা সুমনাবাম নামে এক রাজাকে ক্ষমতায় বসায়। ইনি ছিলেন বেবিলনের প্রথম আমোরাইট রাজা। শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। পরবর্তী কয়েকশ বছর তিনি এবং তার উত্তরসূরীরা মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

তবে বেবিলন ষষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবির আগে এ কাজে সফল হতে পারেনি। হাম্মুরাবি ছিলেন প্রাচীন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন। হাম্মুরাবি সুমনাবামের বংশধর, বেবিলন শাসন করেছেন চল্লিশ বছরেরও বেশি (খ্রী.পূ. ১৭৯০-১৭৫০)। তার রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময় যুদ্ধবিগ্রহে কেটে গেলেও তিনি উল্লেখযোগ্য বহু সামাজিক সংস্কার করেছেন।

হাম্মুরাবি যখন সিংহাসনে বসেন ওই সময় বেবিলোনিয়ানরা সভ্যতার উচ্চ মাত্রায় অবস্থান করছিল। নিজেদের একটি আলাদা ভাষা ছিল তাদের। তবে সুমেরিয়ান ভাষায় শুধু পুরোহিতরাই কথা বলতেন, যেভাবে আজকাল রোমের চার্চ ল্যাটিন ব্যবহার করে। সুমেরিয়ান সংস্কৃতি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করে তারা নিজেদের উন্নতি ঘটায়। অঙ্কের জ্ঞান তাদেরকে মিশরীয়দের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং সম্ভবতঃ খ্রী. পূ. ১৭০০ সালে বেবিলিয়নরা নামতা, বর্গমূল, এমনকি কিছু বীজগণিতও শিখে ফেলেছিল। তারা জ্যামিতির অঙ্ক কষতে পারত, বিশেষ করে সেই নিয়মগুলো যেগুলো পিথাগোরাস মূল উপপাদ্য হিসেবে বর্ণনা করে গেছেন।

পৃথিবীর প্রথম পাঠাগার স্থাপিত হয় বেবিলনে। তবে সেখানে যে সব বই ছিল তা ভল্যুম কিংবা মিশরীয়দের মত প্যাপিরাসের রোল নয়, গল্প, কবিতা, এমনকি চিঠিপত্রও লেখা হতো পাথর অথবা মাটির ফলকে বিভিন্ন আকৃতিতে। কোনটার চেহারা অতসী কাচের মত, কোনটি সিলিন্ডার, আবার কিছু চ্যাপ্টা সেলেট-পাথর। এগুলো লাইব্রেরিতে শুধু যে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হতো কিংবা ধর্মীয় ও ইতিহাস ভিত্তিক লেখা থাকত তা নয়, পড়া এবং লেখার ব্যাপারেও উৎসাহ দেয়া হতো জনগণকে। বিশেষ করে কবিতার ব্যাপারে। বেবিলোনিয়ানরা কবিতা পড়তে খুব ভালবাসত; তাদের অন্যতম প্রিয় মহাকাব্য ছিল গিলগামেশের কিংবদন্তীর কাহিনী। গিলগামেশ ছিলেন এক কাল্পনিক সুমেরিয়ান নায়ক রাজা। এ গল্প আধুনিক সাহিত্যেও ভিন্নরূপে আছে।

বেবিলনের একটি নিয়মিত, সদাপ্রস্তুত সেনাবাহিনী ছিল। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে তারাই প্রথম এরকম সেনাবাহিনী গঠন করে। স্থায়ী যুদ্ধবাজ শক্তি থাকার ফলে রাজাদের পক্ষে সম্ভব হতো প্রতিবেশী দেশগুলোর উপরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে বসা; এ ছাড়া বেবিলোনিয়ান সমাজে এরা নতুন শ্রেণী বা যোদ্ধা শ্রেণী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যায়। এ শ্রেণীভুক্ত মানুষ ছিল মূলতঃ সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক। এদের সাহায্যে রাজা ক্ষমতা ধরে রাখতেন বলে স্বাভাবিকভাবেই এরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। এর মধ্যে একটি সুবিধে ছিল জমির ভোগ দখল। প্রাচীন সময়ে রাজা নিজে কৃষকদেরকে জমি দিতেন চাষ করার জন্যে। ইচ্ছে করলেই প্রজার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিতে পারতেন তিনি। তবে ব্যাপক হারে জমি দখল করতে গেলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল।

হাম্মুরাবির শাসনামলের প্রথম ত্রিশ বছর গেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে মারামারি করে। এরপরে তিনি মেসোপটেমিয়ার উত্তরে আসিরিয়ারদেরকে এবং পুবে এলামাইটদেরকে পরাজিত করে মেসোপটেমিয়ার বড় একটি অংশ বেবিলনের কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন।

এসব সফল বিজয় শেষে হাম্বুরাবি নজর দেন বেবিলনের সরকার গঠনের দিকে এবং শান্তি নিয়ে আসেন রাজ্যে সাফল্যের সাথেই। তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত হন 'কোড অব ল' প্রেরণ করে। হাম্মুরাবির এই 'কোড' বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম কোড অব ল। বেবিলনের এ মডেল অনেক রাষ্ট্রই অনুসরণ করেছে। ওল্ড টেষ্টামেন্টের 'বুক অব এক্সোডাস'-এর কয়েকটি আইনের কথা হাম্মুরাবির আইন থেকে নেয়া। আর আইনের নির্দেশ কালো আগ্নেয়শিলার পিলার বা থামের গায়ে লেখা থাকত। মূল থামটি রয়েছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে, একটি কপি আছে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

ওই কোড থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় হাম্মুরাবি সাংঘাতিক কড়া শাসক ছিলেন। আইনের নির্দেশ থেকে বোঝা যায় সরকারের প্রতি তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট এবং জনকল্যাণেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। কোডের মোট অংশ ছিল ২৮৬টি। এতে বেবিলোনিয়ান সমাজকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমেলু (অভিজাত, যোদ্ধা ও সরকারি কর্মকর্তা), মুশকিনু (অনাভিজাত, সওদাগর, কারিগর, কৃষক) এবং ভার্দু (ক্রীতদাস)।

কোড বা আইন অনুসারে, কোন অভিজাতের ঘরে চুরি হলে তাকে ত্রিশগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তবে অনভিজাত বা সাধারণ লোকের ঘরে চুরি হলে দশগুণ দিলেই চলত। কোন ঘর বা বাড়ি ধ্বসে গিয়ে ঘরের মালিক মারা গেলে ওই বাড়ি যে বানিয়েছে তার মৃত্যুদণ্ড হবে; ঘর চাপা পড়ে বাড়ির মালিকের ছেলের মৃত্যু হলে বাড়ি নির্মাতার ছেলের প্রাণ হরণ করা হবে।

নিঃসন্দেহে এগুলো ছিল কঠিন আইন, তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে ওই সময়টা ছিল কঠিন ও কঠোর। তবে এ আইনের ভাল দিক ছিল এই যে সবল যেন দুর্বলের উপরে অত্যাচার করতে না পারে সে ব্যাপারে হাম্মুরাবি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ।

হাম্মুরাবি মহিলাদের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, বিশেষ করে বিধবাদের প্রতি ছিলেন সদয়। তিনি আইন করেছিলেন মহিলারা তাদের স্বামীদের বাড়ির মালিকানা পাবে, পাবে জমি এবং অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি। ব্যবসার চুক্তির বিষয়েও বৈধতার উপরে জোর দিতেন তিনি। কেউ লিখিত চুক্তি ছাড়া সম্পত্তি বিক্রি কিংবা হস্তান্তর করতে পারত না, এবং যথাযথ স্বাক্ষর ও স্বাক্ষীও লাগত। হাম্মুরাবি বিভিন্ন কাজে শ্রমিকদেরকে সর্বোচ্চ মজুরী দিতেন।

তবে এসব আইন হাম্মুরাবি নিজে আবিষ্কার করেন নি; আইন আগেই ছিল। তিনি শুধু ওগুলোকে গ্রন্থিত এবং পরিমার্জন করেছেন এবং দেশের স্বার্থে ও নিজের

সুবিধার জন্যে কিছু নতুন আইন যোগ করেছেন। বড় বড় থামে আইনের নীতিমালা লেখা থাকত বলে জনগণ তাদের বৈধ অধিকারের কথা জানতে পারত।

হাম্মুরাবি আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হননি ওগুলো ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রেখেছেন। তিনি লোকজনকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিতেন তাদেরকে এটা বা ওটা করতে হবে। একবার এক কর্মকর্তা একটি খাল পরিষ্কার করতে অতিরিক্ত সময় নিচ্ছিল। হাম্মুরাবি তাকে কঠোরভাবে লিখিত নির্দেশ দেন তিনদিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

হাম্মুরাবি একজন নির্মাতাও ছিলেন। তিনি বেবিলনের উন্নতি করেছেন, নগরীর চারদিকে চমৎকার একটি দেয়াল তুলে দিয়েছেন। তিনি খাল খনন করেছেন, মেসোপটেমিয়ার দুটি নগরী নিপ্পুর ও ইরিদুতে মন্দির বানিয়েছেন।

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পরে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায় বেবিলন। যে শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন এবং শক্তির সাহায্যে শাসন করে গেছেন রাজ্য, সেই শক্তিকে ধারণ করার মত কোন উত্তরসূরী তিনি রেখে যেতে পারেননি। ফলে বেবিলন শীঘ্রি বহিরাগতের হামলার শিকার হয়, প্রথমে আসে হিতিতিরা, পরে কাসিটিরা। দ্বিতীয় দলটি ইন্দো ইউরোপিয়ান জাতি, ইরানের পাহাড়-অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করত। বেবিলোনিয়ান সভ্যতা কাসিটিদেরকে এতটাই মুগ্ধ করে তোলে তারা বেবিলনেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। নগরীর কর্তৃত্ব সুলভ অবস্থানকে তারা বহুবছর ধরে রাখতে পেরেছিল, তবে শক্তিশালি আসিরিয়ানরা এসে বেবিলন দখল করে।

আসিরিয়ানরা এসেছিল উত্তর-পূর্ব মেসোপটেমিয়ার একটি রাজ্য থেকে। সুমেরিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্বের যখন সমাপ্তি ঘটে এবং বেবিলন হয়ে ওঠে মেসোপটেমিয়ার প্রধান নগরী, আসিরিয়ানরা ওইসময় টাইগ্রিস নদীর ধারে, উত্তরাঞ্চলে নিজেদের সভ্যতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছিল। তাদের সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিল এশিয়া মাইনর ও পারস্য উপসাগরের মাঝখানের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ। তবে তারা বেবিলনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, যদিও শত বছর ধরে লড়াই চালিয়ে গেছে মুক্ত হবার জন্যে, অবশেষে, যাহোক, আসিরিয়ানরা অসাধারণ এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যার বিস্তৃতি ছিল মিশর থেকে ভারত পর্যন্ত।

# মাইনোয়ান সভ্যতার উত্থান-পতন

গ্রীসের দক্ষিণে, ভূমধ্যসাগরে শুয়ে আছে ছোট্ট সরু দ্বীপ ক্রিট। এই দ্বীপটি লম্বায় ১২০ মাইল, সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গাতেও চওড়ায় ৩০ মাইলের বেশি নয়। দ্বীপটি একদা ১৫০০ বছর ধরে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম ছিল। এ সভ্যতা মাইনোয়ান সভ্যতা বলে পরিচিত। কারণ প্রধান পুরোহিত ও শাসককে বলা হতো মাইনো।

ক্রিট দ্বীপ এবং সে সময় নৌ যুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল না বলে মাইনোয়ানদেরকে হিংসুকে প্রতিবেশীর হামলার শিকার বেশি হতে হয়নি যেটা ঘটেছিল সুমেরিয়ান ও বেবিলোনিয়ানদের ভাগ্যে। শান্তিপূর্ণ সময় ও পরিবেশে অবস্থানের সুযোগ ক্রিটে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করে।

মাইনোয়ানরা ব্যবসার জন্যে পুরোপুরি নির্ভর করত জাহাজের উপরে, আর তাদের সওদাগররা এজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরের বহু জায়গা চষে বেরিয়েছে এ উদ্দেশ্যে। বাণিজ্যের কারণে তারা নিকট প্রাচ্য, বিশেষ করে মিশরীয় সভ্যতার সাথে পরিচিত হতে পেরেছে এবং অন্যদের সংস্কৃতি ও আবিষ্কার সম্পর্কে জ্ঞান তাদেরকে নিজেদের সভ্যতার উন্নয়ন ঘটাতে ভূমিকা রেখেছে।



*ব্রোঞ্জের ড্যাগার ব্লেড ও মাটির জার (খ্রী. পূ. ১৮ শতক) পাওয়া গেছে ফিষ্টোসে।*

মাইনোয়ান সভ্যতার শুরু প্রায় খ্রী. পূ. ৩০০০ সালে। তবে এ সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে আরো পনেরশ বছর পরে, এবং স্থায়ীত্ব ছিল প্রায় দুশো বছর। বিংশ শতকের প্রথম দিকে স্যার আর্থার ইভান্স প্রথম ক্রিট সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পান খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে। তারপর থেকে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ক্রিট সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন স্যার ইভান্সের সূত্র ধরে।

আমরা এখন মোটামুটি জানি কিভাবে ক্রিট দ্বীপের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো বসবাস করত, বাণিজ্য করত। সাগর পাড়ের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে মাইনোয়ানরা লেখার কৌশল শিখলেও তারা বেবিলনের হাম্মুরাবির মত বিশেষ ব্যবস্থায় রেকর্ড সংরক্ষণ করত না। ফলে অন্য সভ্যতার মত একইভাবে মাইনোয়ানদের ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়।

মাইনোয়ান সভ্যতার প্রথম কালকে আমরা প্রারম্ভিক যুগ (খ্রী. পূ. ৩০০০–২০০০) বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ইন্দো-ইউরোপিয়ানরা গ্রীসের মূল ভূমি পাড়ি দিয়ে ক্রিটে পৌছে। আবহাওয়া সুবিধেজনক, মাটি উর্বর দেখে তারা এখানেই থেকে যায় এবং জীবন নির্বাহ শুরু করে দেয়। তাদের চাষাবাদ ব্যবস্থা এতটাই সফল ছিল যে শস্য ও মদ গ্রীস, এশিয়া মাইনর এবং নিম্নতর মিশরে রপ্তানী করত।

এই প্রারম্ভিক মাইনোয়ানরা বাস করত গ্রামে, চৌকোণা ছোট ছোট ঘরে এবং প্রস্তর শিল্পে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তারা ব্রোঞ্জের কাজও জানত, পারত ছুরি বানাতে, কুঠার, চিমটা তৈরি করতে এবং অসাধারণ দক্ষতায় চমৎকার সুন্দর গহনা তৈরিতেও তাদের জুড়ি ছিল না। সোনা এবং রূপার গহনায় নানা ডিজাইনও করত তারা। কুমোর হিসেবেও মাইনোয়ানদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, চমৎকার সব তৈজসপত্র বানাত তারা, তৈরি করত গহনা, জ্যামিতিক নকশা ও প্রাণীদের নানা ডিজাইন দিয়ে।

খ্রী. পূ. প্রায় ২০০০ সালে মাইনোয়ানরা যেন লাফ মেরে তাদের সভ্যতাকে নিয়ে যায় অনেক দূরে, কারণ এ সময়ে ব্যাপক উন্নতি ঘটে তাদের। এ সময়কে বলা হতো মধ্য যুগ (খ্রী. পূ. ২০০০–১৭০০) এ শতকে মাইনোয়ানরা বড় বড় শহরে বানিয়েছে প্রাসাদ ও পাবলিক বিল্ডিং। তারা একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি উদ্ভাবন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শিল্প ও কলার উল্লাস ঘটে এবং সম্ভবতঃ এ দুটি বিদ্যায় নিকট প্রাচ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

মাইনোয়ানদের তৈরি প্রধান শহরটির নাম নসোস, এর অবস্থান ক্রিটের উত্তর দিকে, সাগর থেকে অদূরে একটি পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের উপরে ছিল প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ, এখানে বাস করতেন মাইনোয়ানদের শাসক। প্রাসাদটি আসলে ছিল অনেকগুলো দালানের সমষ্টি, মাঝখানে শান বাঁধানো উঠোন। প্রধান দালানে থাকতেন শাসনকর্তা। উঠোন থেকে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে এ দালানে যেতে হতো। সাগর ও উপত্যকার দিকে মুখ করা জানালাও ছিল দালানে।

ভেতরের ঘরগুলো ছিল উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত। ঘরের দেয়াল রঙিন, তাতে লাগানো থাকত ফ্রেসকো বা দেয়াল চিত্র, ভেজা প্লাস্টারের উপরে আঁকা হতো এসব ছবি–যা ক্রিট দ্বীপের বাসিন্দাদের নিত্যদিনের জীবন যাত্রাকে তুলে ধরত।

ফ্রেসকোতে ফুটিয়ে তোলা হতো মাইনোয়ান নাগরিকদের চেহারা। নসোসের প্রাসাদের দেয়ালে আঁকা হতো ষাঁড়ের ছবি–প্রাণীরা সবসময়ই ক্রীটবাসীদের খেলাধুলা ও উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তরুণ তরুণীরা অংশ নিত ষাঁড়-নৃত্যে। কিংবদন্তীতে আছে, আধা-পশু, আধা-মানব মিনোটার গোলোক ধাঁধার মত একটি অট্টালিকায় বাস করত, সম্ভবতঃ এটা নসোস প্রাসাদের একটি অংশ ছিল। সে মানুষ খেতে চাইত। মিনোয়ানরা যে ধরনের ধর্মের পূজারী ছিল তাতে ষাঁড় পূজো ছিল অন্যতম। আর ষাঁড় পূজোর সাথে মিনোটারের গল্পের একটা সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা হয়।

প্রাসাদের বাথরুম এবং রান্নাঘরে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা ছিল, সম্ভবতঃ নিকট প্রাচ্যের সবগুলো দেশের সেরা ব্যবস্থা ছিল ওখানে। বাইরের কুয়ো থেকে জল তুলে মাটির পাইপ বা নল দিয়ে সরবরাহ করা হতো জল এবং বর্জ্য পদার্থ অন্য পাইপ দিয়ে মাটির নিচের বড় ড্রেনে ফেলে দেয়া হতো।

শাসনকর্তার বাড়ির পাশাপাশি প্রাসাদে কারিগরদের জন্যেও ঘর ছিল যারা মাইনো বা শাসকদের খেদমত করত। মুচির দোকান, স্বর্ণকার, কুমোর, রাজমিস্ত্রীসহ ধাতব নির্মাতারাও ছিল প্রাসাদের অংশ বিশেষ। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে বাড়ি ও অফিসের ব্যবস্থাও ছিল।

দীর্ঘ একটা সময় ক্রিট বহিরাগত শত্রুর হামলা থেকে মুক্ত থাকার কারণেই প্রাসাদগুলোকে দুর্গের আকার দেয়া হয়নি বা শক্তিশালি করা হয় নি। তবে এমনিতে খুব মজবুত ছিল প্রাসাদ। থাম, পাথরের দেয়াল এবং পাঁচিল ছিল দারুণ-মজবুত। যে কোন ক্ষয়-ক্ষতি সামলে ওঠার ক্ষমতা ছিল প্রাসাদগুলোর। খ্রী.পূ. ১৫৫০ অব্দে নসোসের প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে নৃতত্ত্ববিদদের মতে, শত্রুর হামলায় নয়, ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল ওই প্রাসাদ। প্রাসাদের নিচে গড়ে উঠেছিল নসোস নগরী। সেখানে দুই/তিন তলা বাড়িতে বাস করত মানুষজন। বাড়ির ভিত্ এবং নিচতলাগুলো ছিল পাথরের, ওপরতলাগুলো ইট-পাথরের মিশ্রণে তৈরি। সবগুলো বাড়িতেই পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা ছিল এবং সুন্দরভাবে সাজানো থাকত।

মাইনোয়ানরা কেমন লোক এবং তারা কি করত? যারা শাসন কর্তা নয় তারা কাজ করত মাঠে, মাছ ধরত সাগর উপকূলে কিংবা জাহাজ বানাত সওদাগরদের জন্যে অথবা দক্ষ কারিগর হিসেবে কাজ করত। মাইনোয়ানরা অত্যন্ত উদ্যমী স্বভাবের ছিল। সওদাগর নাবিকরা মেইনল্যাণ্ডে শুধু পণ্য নিয়েই যেত না তারাই প্রথম ইতিহাসে ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির ব্যবস্থা করে। নানা জিনিসের সাথে লিনেন নিয়ে আসত মিশরীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে, বিক্রি করত এশিয়া মাইনরে হিতিতিদের কাছে।

মাইনোয়ান মহিলারা সুন্দর সাজগোজ করত, সাধারণতঃ উলের পোশাকই পরত তারা। পরত গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট, খোলা জামা, কোমরে জড়ানো থাকত চওড়া ও টাইট কোমর বন্ধ। তারা অনেক লম্বা চুল রাখত। তরুণ-তরুণীরা যারা ষাঁড়ের নাচ নাচত তারা পরত উরু পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট এবং কোমরবন্ধ।

মাইনোয়ান চিত্রকলা এ সময়ে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করে। সমসাময়িক যে কারো চেয়ে তাদের চিত্রকলার উৎকর্ষতা ছিল বেশি। তারা এমন পাতলা তৈজসপত্র বানাতে শিখেছিল বা আজকের যুগের কারিগরদের পক্ষেও সম্ভব নয়। জার (বড় বোতল) এবং কুজো বানাত তারা চাকার সাহায্যে, পা চালিত যন্ত্রের সাহায্যে চলত চাকা, আকার পেত অসাধারণ সুন্দর সব তৈজস। কোনটির চেহারা সামুদ্রিক মাছের মত, কোনটি ঝিনুকের খোলা আবার স্কুইড কিংবা পদ্মফুল।

মাইনোয়ানরা কাদামাটির ফলকে লিখত, এটা তারা শিখেছে মিশরীয় ও সুমেরিয়ান মডেল অনুসরণ করে। তারা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি দিয়ে শুরু করে, সেই সাথে যোগ করে সিল্যাবিক সিস্টেম। এর মধ্যে কিছু কিছুর অর্থ এখনো উদ্ধারযোগ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা পরীক্ষা করে দেখছেন Linear A ও Linear B-এর পাণ্ডুলিপির অর্থ উদ্ধার করে ক্রিট সম্পর্কে আরো তথ্য উদঘাটন করা যায় কিনা।

ক্রিটে নসোসই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল না। আরেকটি বড় শহরের নাম ফিস্টোস, এটার অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিমে, ধারণা করা হয় এক সময় দ্বীপটি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় এবং অপেক্ষাকৃত আরেকটি ছোট শহর ছিল, হাগিয়া।

খ্রী. পূ. ১৫০০ সালের দিকে গোটা ক্রিট ধ্বংস হয়ে যায় ভূমিকম্পে। ভূকম্পন ইজিয়ান সাগরে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার ছিল না। নসোস ভূমিকম্পে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন মিনোসের জন্যে আবার প্রাসাদ তৈরি করতে হয়েছিল।

মাইনোয়ান সভ্যতার তৃতীয় এবং শেষ কাল বা শেষ যুগের শুরু এই ভূমিকম্পের পরে এবং একশ বছর বা তারও খানিকটা বেশি সময় ছিল ক্রিটের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। মধ্য ও শেষ যুগের ক্রিটান সভ্যতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো আরেকটি মধ্যযুগের চেয়ে অনেক বিলাসপূর্ণ ছিল। নসোসের নব নির্মিত প্রাসাদ ছিল অনেক বেশি সুন্দর, মাইনোয়ান নৌ বহর ছিল আকারে বড় এবং দেশ ছিল আগের চেয়ে সমৃদ্ধ। মিশর ও লেভান্টের (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল) সাথে বাণিজ্যও ছিল অনেক বেশি প্রাণচঞ্চল ও ব্যাপক পরিসরের। চিত্রকলারও অনেক বেশি সমৃদ্ধি ঘটে এ সময়টাতে। ভাষার যে বিবর্তন হয় তার সাথে প্রারম্ভিক গ্রীকের মিল ছিল।

খ্রী. পূ. ১৪০০ অব্দের শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে মাইনোয়ান সভ্যতার পতন শুরু হয়ে যায়। ক্রিটকে বেশ কয়েকবার গ্রীক থেকে আসা অশিক্ষিত লোকজন ঘেরাও করে। এদেরকে আমরা মাইসেনিয়ান বলব মূলতঃ তাদের প্রধান নগরী মাইসিনের জন্যে। নসোসও দখল হয়ে যায় এবং নগরীতে আগুন ধরিয়ে দেয় বর্বর মাইসেনিয়ানরা। অবশ্য প্রতিরক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না বলেই আগুনে পুড়তে হয়েছে নসোসকে। রাজধানী শহর ধ্বংস হয়ে যাবার ধাক্কা মাইনোয়ানরা কোনদিনই সামলে উঠতে পারেনি। তাদের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে প্রায় ক্রীতদাসের মত, প্রাক্তন সমৃদ্ধি স্মৃতিতে পরিণত হয়।

মাইসিনিয়ানরা মাইনোয়ান কিংবা গ্রীক মেইনল্যাণ্ড থেকে আসা ইন্দো-ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক কম সভ্য ছিল। মাইসিনিয়ানরা মাইনোয়ান সংস্কৃতি নিয়ে যায় মেইনল্যাণ্ডে এবং দুশো বছর যে সভ্যতাকে তারা উপভোগ করেছে তার ভিত্ মূলতঃ গড়ে উঠেছিল ক্রেটান মডেলকে উপজীব্য করে।

মাইসিনিয়ানরা মাইসিন ও তিরিনে (এথেন্সের পাইলোসে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, প্রাসাদ বানিয়েছে উত্তর গ্রীসেও (থেসেলি)। প্রাসাদের সাজসজ্জায় অনেকটা মাইনোয়ান প্রাসাদের আদল ছিল, প্রাসাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বড় বড় খিলানের সারি। তারা তাদের নেতা বা সর্দারকে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইর নিচে কিংবা পাথুরে কবরে কবর দিত। মাইসিনিয়ানরা মাইনোয়ান লেখার ধাঁচও অনুসরণ করত এবং নব্বুইটি বর্ণ-মালায় মডেল কমিয়ে আনে।

তবে মাইসিনিয়ানরা কখনোই মিনোয়ানদের মত সভ্যতার উৎকর্ষে পৌছুতে পারেনি। তারা বড় বড় শহর নির্মাণ করেনি। বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছে যুদ্ধবিগ্রহে, হামলা আর বিজয়ের লক্ষ্যে। বন্দিদের সাথে তারা অত্যন্ত নির্মম আচরণ করত। অভিযানে ধৃত সৈনিক কিংবা ব্যবসায়ীদেরকে গ্রীসে নিয়ে এসে বাধ্য করত ক্রীতদাস হতে, মাঠে কাজ করতে।

মাইসিনিয়ানরা সিরিয়ান উপকূল ঘেরাও করেছিল; সাইপ্রাসে তারা ঢুকে পড়ে; এবং এশিয়া মাইনরের বিশাল উপকূলেও অনবরত অভিযান চালিয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম ঘেরাও ছিল ট্রয় নগরীকে ঘিরে। খ্রী. পূ. বার শতকের শুরুর দিকে গ্রীকরা মাইসিনিয়ান রাজাদের সাথে আলগা একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং রাজা আগামেমননকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সহায়তা দেয়। এ অভিযান কিংবদন্তীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছে ট্রয়ের যুদ্ধ হিসেবে।

মাইসিনিয়ান সভ্যতার আকস্মিক পতন ঘটে। খ্রী. পূ. বার শতকের শেষ নাগাদ মাইসিন আক্রমণ করে বসে ডোরিয়ান হামলাকারীরা। এরা এসেছিল বর্তমান

বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া থেকে। মাইসিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তারা। পাইলস এবং তিরিনও ধ্বংস হয়ে যায়। মাইসিনিয়ানদের একটি দালানও ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পায়নি শুধু এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস ছাড়া।

নতুন হামলাকারীরা ছিল প্রায় বর্বর জাতি। তারা শিল্পকলা বুঝত না এবং সুন্দর স্থাপত্য নিয়ে কোন মাথাব্যথাও ছিল না। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও কোন আগ্রহ তারা দেখায় নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জয় করো এবং ধ্বংস করে দাও।

এ হামলায় মাইসিনে অন্ধকার নেমে আসে। অনেকেই গ্রীসের নানা জায়গায় ছিটকে যায় এবং মিনোয়ান-ইজিয়ান সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন বহুকাল অব্দি অদৃশ্য থাকে। তবে এ তন্দ্রাচ্ছন্ন দশা থেকে উঠে আসে গ্রীকরা সমস্ত সৌন্দর্য ও শক্তি নিয়ে।

# এশিয়া মাইনরে হিতিতির

বেবিলনের শুরুর দিকের গল্পে আমরা দেখেছি সুমের ও মিশর হয় বহিরাগতদের হামলার শিকার হয়েছে নতুবা নতুন মানুষদেরকে গ্রহণ করেছে। তারপর খ্রী. পূ. প্রায় ২০০০ বছর পরে হামলাকারীদের ঘেরাও বা অবরোধ আরো বিপজ্জনক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (২০০০–১০০০ খ্রী. পূ.) নিকট প্রাচ্যে অভিবাসন ও হামলার দুটি প্রধান ধারা দেখা যায়–সেমিটিক এবং ইন্দো ইউরোপিয়ান।




*খ্রী. পূ. ২০০০সালের হিতিতি ও অন্যান্য রাজ্যের মানচিত্র*

দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা একদল উপজাতি সেমিট এবং উত্তরপুবে তাদের জাতি গোষ্ঠী পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে এবং সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও আসিরিয়াতে আস্তানা গেড়ে বসে।

দ্বিতীয় ধারার হামলাকারীরা ছিল আর্য্য বা ইন্দো ইউরোপীয়ান জনগণ। এরা বিরাট একটি দল, এসেছিল নিকট প্রাচ্যের উর্বর ভূমির একটি অঞ্চল থেকে যা বর্তমানে রাশিয়া নামে পরিচিত। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত। এ ভাষার সাথে সম্পর্ক ছিল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার। আর এ ভাষা থেকে উদ্ভব ঘটে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, রাশান এবং ওয়েলস সহ আরো কয়েকটি ভাষার।

বেবিলনকে দখল করে কাসিটরা, ভারতের মতই। কাসিটরা ছিল ইন্দো-ইউরোপিয়ান। আরেক গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-ইউরোপিয়ান দল ছিল হিতিতি। ইন্দো-ইউরোপিয়ানরা নিকট প্রাচ্যের সভ্য অংশে হামলা চালায়, তারা নিজেরা ছিল অনুন্নত। মিশরীয় সুমেরিয়ান এবং ভারতীয় সভ্যতাকে তারা হিংসা করত। তাই এসব অঞ্চলে তারা আক্রমণ চালিয়েছে। খ্রী. পূ. ২০০০ সালে হিতিতিরা আসে আর্মেনিয়ার ককেশাস পর্বত থেকে, আস্তানা গেড়ে বসে কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে, এশিয়া মাইনরে। অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপিয়ানদের মতই বর্বর ছিল তারা, তবে একটি বিষয়ে তারা সুমের মিশর, ভারত কিংবা বেবিলনের থেকে এগিয়ে গিয়েছিল; তাহলো হিতিতিরা লোহার ব্যবহার জানত। ব্রোঞ্জের চেয়ে মজবুত ধাতু লোহা উচ্চ তাপে গলানো যায়। আর হিতিতিরা এই গোপন ব্যাপারটি অনেকদিন লুকিয়ে রেখেছিল। খ্রী. পূ. ১২০০ সালে হিতিতিদের পতন ঘটলে আসিরিয়ানরা লোহার ব্যবহার শিখে যায় এবং নিকট প্রাচ্যে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

হিতিতিরা আঁকাবাঁকা নদী হেলিস-এর উপত্যকায় থিতু হয়ে বসে এবং উর্বর সমভূমিতে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের মধ্যে তারাই প্রথম সভ্যতার মুখ দেখে। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সাথে যোগাযোগ তাদেরকে নিজেদের ভাষায় পাণ্ডুলিপি তৈরিতে সহায়তা করেছে। তারা দু'ধরনের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করত– বেবিলনের মত কিউনিফর্ম টাইপ এবং অন্যটি ছিল হিয়েরোগ্লিফিক চিত্র লিখন পদ্ধতি। হিতিতিরা ছিল মিত্র জাতির একটি দল, এশিয়া মাইনরে বসতি গড়ার পরে তারা আলাদা 'রাজ্যে' বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে হেলিস নদীর তীরে যারা বাস করত তারা এক ধরনের কর্তৃত্ব গড়ে তুলেছিল এবং তাদেরকে খুব একটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা রাজা নির্বাচন করত, তাঁকে পরামর্শ দিতেন অভিজাতদের একটি কাউন্সিল বা সভা। সময়ের সাথে সাথে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে আর অভিজাতরা ক্ষমতা হারাতে থাকেন।

হিতিতি রাজা হিসেবে প্রথম যিনি ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন তার নাম হাণ্ডুসিলিস। ইনি খ্রী. পূ. ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়টাতে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি বিশাল এক নগরীর পত্তন করেন যা হেলিস নদীর দক্ষিণের বাঁকে পঁচাত্তর মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ নগরীর প্রাচীর ছিল প্রকান্ড, বড় বড় মন্দির , সুবিশাল প্রাসাদ এবং পারিষদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ির সুবিন্যস্ত সারি। পরে এ নগরীর নামকরণ করা হয় রাজার নামে–হাত্তুসাস। আধুনিক তুর্কী শহর বোঘাজকয়ে এ শহরের মূল নিদর্শন রয়েছে।

হাত্তুসিলিসই প্রথম রাজা যিনি হিতিতি ক্ষমতা আনাতোলিয়ার বাইরেও বিস্তৃত করেছেন। এ এলাকা নিয়েই আধুনিক তুরস্কের মূল অঞ্চল গড়ে উঠেছে। তিনি এমন একটা সময় সিরিয়া আক্রমণ করে বসেন যখন নিকট প্রাচ্যের লেভান্ট অঞ্চলটির দুর্দশা চলছিল। ওখানে হিতিতিদের লোহা নিয়ে গোপন ব্যবহার তাদের হামলার সিদ্ধান্তকে ফলপ্রসূ করে তোলে।

হাত্তুসিলিস-এর উত্তরাধিকার মুসিলিস (মারা যান খ্রী. পূ. ১৫০০-এ) আসিরিয়া ছাড়িয়ে অগ্রসর হন বেবিলনের দিকে। বেবিলন তিনি লুঠ করেন, কোতল করে ফেলেন হাম্মুরাবি'র শেষ বংশধরদের। তারপর ফিরে আসেন হাত্তুসাসে।

মুসিলিস গুপ্তঘাতকের শিকার হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তার মৃত্যুতে হিতিতি রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতার মধ্যে পতিত হয়। খ্রী. পূ. ১৪৫০ সালে এ অবস্থার অবস্থান ঘটে সফল উত্তরাধিকারের আগমনে। কেন্দ্রীয় সরকার আরো সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং কয়েক কদম এগিয়ে যায়। হিতিতিরা আবার সিরিয়া, মিতান্নি এবং আসিরিয়ায় হামলা চালাতে শুরু করে। ওইসব হামলা তাদেরকে মিশরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে, মিশরের তখন প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল।

এ ধরনের বহিরাক্রমণ কিছু সময় ধরে সফল হয়েছে। রাজা সুপ্পিলিউলিয়ামাস (খ্রী. পূ. ১৩৮০–১৩৪৫)-এর অধীনে হিতিতিরা উত্তর সিরিয়ায় ভালই জাঁকিয়ে বসে। মিতান্ন হিতিতি এবং মিশরীয়দের মাঝখানে বাফার ষ্টেট (দুই বড় রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধে তাদের মাঝখানে স্থাপিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র)-এর ভূমিকা রাখত ওই দুটি দেশের প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল বলে। কিন্তু মিতান্নিতে অরাজকতা শুরু হলে হিতিতিরা দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

সুপ্পিলিউলিয়ামাস ছিলেন সম্ভবত সবশ্রেষ্ঠ হিতিতি রাজা। হাত্তুসাসের আয়তন তিনি বৃদ্ধি করেন এবং পাথর দিয়ে চমৎকার সব দালান-কোঠা নির্মাণ করে নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনও করেছেন। খুদে হিতিতি রাজ্যগুলোর অরাজকতা দূর করতে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেন, এবং এশিয়া মাইনরের বাইরে হিতিতিদের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তার রাজ্য শাসনের শেষ দিকে হিতিতি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল ঈজিয়ান সাগরের তীরের আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূল থেকে সিরিয়া ছাড়িয়ে জেরুজালেমের লেভানটাইন উপকূল পর্যন্ত।

তার সময়ে সুপ্পিলিউলিয়ামাস নিকটপ্রাচ্যের নানা দ্বন্দ্বের ছিলেন মধ্যস্থতাকারী। বলা হয় তুতানখামেনের তরুণী বিধবা সুপ্পিলিউলিয়ামাসকে নাকি অনুরোধ করেছিলেন তার (বিধবা) সঙ্গে রাজার কোন ছেলের বিয়ে দেয়ার জন্যে। তাহলে তিনি একজন স্বামী পাবেন যে মিশর শাসন করতে পারবে। তবে রাজার ছেলে মিশরে পৌছার পরে মারা গেলে হিতিতিদের সঙ্গে মিশরীয়দের যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল।

হিতিতি সমাজ ব্যবস্থা কি রকম ছিল? হিতিতিরা ছিল কতগুলো উপজাতির একটি সংঘবদ্ধ দল, যাদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসন করতেন হাত্তুসাসের রাজা। রাজার অধীনে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল গোটা হিতিতি রাজ্য জুড়ে। উপরের শ্রেণী ছিল মারিয়ামুন, এরা বংশগতভাবে হাত্তুসাসের উত্তরাধিকারী ছিল। সম্ভবত এরাই ছিল দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং সবচেয়ে বেশি জমির মালিক। এরপরে ছিল হানিয়াহু। এ শ্রেণীভুক্ত ছিল ব্যবসায়ী, কৃষক, মালী, রাজকীয় কৃষক, সহিস ও সরকারি কর্মকর্তা। একেবারে নিচুস্তরে ছিল হুপসু বা শ্রমিক শ্রেণীর

মানুষজন। এদেরকে কর দিতে হতো এবং মারিয়ানুরা চাইলেই সেনাবাহিনীতে যোগদানে তারা ছিল বাধ্য। এই তিন শ্রেণীর নিচে ছিল ক্রীতদাস, বিশেষ করে বিদেশী বংশোদ্ভূত।

হিতিতি আইনে স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস উভয়ের জন্য কানুন ছিল। তবে আসিরিয়া, বেবিলন ও মিশরের তুলনার এ আইন ছিল অনেক মানবিক। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো শুধু গুরুতর অপরাধীকে। সাধারণত স্বাধীন মানুষ আইন লঙ্ঘন করলে এ ধরনের শাস্তি পেত। তাও মৃত্যুদণ্ডের হুকুম আসত রাজার নিজস্ব দরবার থেকে।

হিতিতিরা নিজস্ব লিখন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটায়। তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল ইতিহাস ও রেকর্ড সংরক্ষণের প্রতি। ফলক আকারে তাদের বহু ডকুমেন্ট আবিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে আছে রিপোর্ট, রাজার ভাষণ এবং আইনের নানা অধ্যাদেশ।

সুপ্পিলিউলিয়ামাসের এক উত্তরাধিকারী মুয়াতাল্লিশ মিশরীয়দের সঙ্গে লড়াই করেছেন। মিশরীয়দের পক্ষে ছিলেন ফারাও দ্বিতীয় রামেসেস। খ্রী. পূ. ১২৮৫ তে কাদেশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দুপক্ষই নিজেদেরকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে– রামেসেস বিজয় উৎসব করেন দেশে ফিরে। তবে হিতিতিরাই যুদ্ধ থেকে মূল সুফল পেয়েছিল। তারা সিরিয়া থেকে দামাস্কাসে গিয়ে পৌছে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে।

কয়েক বছর পরে (খ্রী. পূ. ১২৬৯) মুয়াতাল্লির উত্তরাধিকার হাত্তুসিলিস তৃতীয় রামেসেসের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। এ রেকর্ড সংরক্ষণ করে হিতিত ও মিশরীয় উভয়ই। চুক্তিতে একত্রে বাণিজ্যে করা ও অর্থনৈতিক সহায়তাদানের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল। দ্বিতীয় রামেসেস পরবর্তীতে হাত্তুসিলিসের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। হিতিতি রাজা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মিশর গিয়েছিলেন।

তৃতীয় হাত্তুসিলিসের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন বাদে হিতিতি রাজ্যে উত্তর থেকে বর্ববরা হামলা করে বসে। এরা ছিল বলকানের ফিরগিয়ানসহ আরো কয়েকটি নোম্যাডিক জাতি। হিতিতিরা নিজস্ব কোন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনি, তারা পুরাতন সংস্কারকেই গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বহিরাগতদের হামলা ঠেকানোর মত শক্তিশালী ভিত্ তারা গড়ে তুলতে পারে নি।

খ্রী. পূ. ১২০০ অব্দে হিতিতি ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং এশিয়া মাইনর বহুদিন প্রায়-বর্বর রাজ্যে পরিণত হয়ে থাকে। হিতিতিদের কথা আর শোনা যায় নি। তবে তারা নিকট প্রাচ্যের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলঃ তারা লোহার সাথে এ অঞ্চলের মানুষদের পরিচয় করিয়ে দেয়, মিশরীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিও বন্ধ হয়ে যায় তাদের কারণে এবং তারা পূর্ব নোমাডিক হামলাকারীদেরকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিল বলে নিকট প্রাচ্যের সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটার সুযোগ ঘটেছিল।

# সিন্ধু উপত্যকার প্রথম সভ্যতা

ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ যা এখন পাকিস্তান নামে পরিচিত, তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে প্রকাণ্ড সিন্ধু নদ। ইন্ডিয়া থেকে ইন্দুস রিভার বা সিন্ধু নদের নামের উৎপত্তি। সিন্ধু উপত্যকা সুবিশাল এক সমভূমি, হাজার মাইল লম্বা এবং কোথাও পাঁচশ মাইল চওড়া। একদা এ উপত্যকা ছিল দারুণ উর্বর, আর ওখানে, ৪৫০০ বছর আগে শুরু হয় সিন্ধু সভ্যতা।

এ সভ্যতার মানুষদের আগমন কোথেকে? এর সঠিক ইতিহাস জানা যায় না, তবে কারো কারো ধারণা এরা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। তুরস্ক, আসিরিয়া এবং উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে এসে ওই অঞ্চলে ঢুকে গেছে। আবার কারো মতে, 'কালো মাথার' লোকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে যাত্রা করে এবং প্রতিষ্ঠা করে সুমেরিয়ান সভ্যতা, কেউ ভারতেই থেকে যায়। তারপরে, অনেক অনেক বছর বাদে, সুমের থেকে পর্যটকরা যখন তাদের কাছে আসে এবং সভ্য জীবনের নিদর্শন দেখায়, তারা তখন দক্ষিণের পাহাড় ছেড়ে সিন্ধু উপত্যকার উর্বর জমিতে ঢুকে পড়ে।



*মহেঞ্জোদারো শহরের একটি দৃশ্য।*

এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতার কি করে রাতারাতি আবির্ভাব ঘটেছিল। এ সভ্যতার লোকজনকে শুধু সুমেরিয়ানদের অনুকরণ করতে হয়েছে

একটি উঁচু মানের সংস্কৃতি পাবার জন্যে। যেভাবেই অগ্রসর হোক না কেন, সিন্ধু সভ্যতার নিজস্বতা ছিল এবং এ সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্যই অন্য সভ্যতার সঙ্গে মেলে না বা তারা অংশ নিতে যায় নি।

সিন্ধু উপত্যকায় কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে খনন করা হয় এবং অস্তিত্ব মেলে দুটি প্রকাণ্ড শহরের। দুটি শহরই ছিল সিন্ধুর সমভূমিতে, একটি থেকে অপরটির দূরত্ব ৩৫০ মাইল। দুটি শহরই এক বর্গমাইলেরও বেশি ছিল আয়তনে, নাম হরপ্পা এবং মহেঞ্জো-দারো। এই আবিষ্কার নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদেরকে প্রথম বারের মত ভারতীয় জনগণের প্রারম্ভিক সভ্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ যোগায়।

এ শহর দুটি ছাড়াও সমভূমিতে আরো অনেক ছোট ছোট শহর ছিল, তৈরি হয়েছিল একই আকারে, এতে বোঝা যায় গোটা অঞ্চল ওই বড় শহর দুটিই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে শাসন করত। দুটি শহরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় হরপ্পার কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল অন্য শহরগুলোর উপরে। সম্ভবতঃ শহরের কোন শাসনকর্তা গোটা অঞ্চল হরপ্পার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছেন।

সিন্ধু উপত্যকা নীল উপত্যকার মতই প্রতি বছর প্লাবিত হতো বন্যায়, মে থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত। ভারতীয়দেরও মিশরীয়দের মত একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এবং তারাও খাল খনন করেছিল। তবে সম্ভবতঃ নীলের মত নিয়মিত বন্যা হতো না সিন্ধু নদে, কিংবা খালগুলো তেমন কাজে লাগত না, কারণ হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোতে বেশ কিছু নব-নির্মিত ঘর বাড়ির সন্ধান মিলেছে যেগুলো বন্যার জলে ডুবে যেত বলে সন্দেহ করা হয়।

এ দুই শহরের বাড়িঘর ও খাল-বিল কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সুমেরের মত শহর-রাষ্ট্র ধাঁচে সিন্ধু উপত্যকাতেও শহর ও নগর গড়ে উঠেছিল।

সিন্ধুর লোক আর সুমেরিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় খনন করে পাওয়া ভারতীয় পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন সীল মোহর এবং চিঠিতে। সুমের ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সুমেরিয়ান নগর-রাষ্ট্রের আসিরিয়ান শাসক প্রথম সারগনের আমলে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর গল্প অদ্ভুত। খ্রী. পূ. ২৫০০ সালে সিন্ধু সভ্যতা দ্রুত পূর্ণতা পায়। পরবর্তী হাজার বছরে এ সভ্যতা তেমন অগ্রসর হতে না পারলেও কম-বেশি আগের মতই ছিল। বন্যার কবলে পড়ে মাঝে মাঝেই ধ্বংস হয়েছে দালান-কোঠা, পুরানো ভিতের ওপরে তৈরি করা হয়েছে নতুন ঘর, তবে ঘর-বাড়ির মান বৃদ্ধির চেয়ে হ্রাসই পেয়েছে বরং। গঠনপ্রণালীতে তেমন চমক না থাকলেও যেভাবে বিল্ডিং তোলা হয়েছে তাতে একটা জবরজং অবস্থার সৃষ্টি হয়। নির্মাতারা অতিরিক্ত লোক সংস্থানের জন্যে দালানের পরিমাণ না বাড়িয়ে বা নতুন বিল্ডিং তৈরি না করে বড়গুলোকে ভাগ করে দিয়েছে।

সিন্ধু উপত্যকার শহরগুলো, বিশেষ করে বড় দুটির স্থাপত্য ছিল সুন্দর। শহর দুটি আয়তক্ষেত্রাকারে তৈরি করা হয়, চওড়া, প্রধান রাস্তাগুলো আয়তনে ছিল সমান, ছোট ছোট রাস্তায় আবার সঠিক কোণ নিয়ে চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে ছিল প্রচুর ঘরবাড়ি, বেশির ভাগ দোতলা এবং সবগুলো সমতল ছাদের।

ভারতীয়রাই প্রথম দেয়াল, ছাদ ও মেঝেতে বিটুমিন ব্যবহার করে বাড়ি স্যাঁতসেঁতে ভাব থেকে রক্ষা করার জন্যে। বাড়িগুলো ছিল পোড়ানো ইটের তৈরি। দোতলার ঘরে যেতে হতো বাড়ির পেছন দিকের সরু, পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে। মাঝে মাঝে এ সব সিঁড়ি বেয়ে সোজা ছাদে ওঠা যেত। প্রতিটি বাড়িতেই বাথরুম, পানির সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা ছিল। ড্রেন দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। আবরন-যুক্ত স্যুয়েয়ার লাইনের সাথে যোগ ছিল ড্রেনের। স্যুয়েয়ার লাইন থাকত রাস্তার পাশে। রান্না ঘরের দরজা দিয়ে খাবার ঘরে ঢোকা যেত।

সিন্ধুবাসীরা নানা আসবাব ব্যবহার করত। বেশিরভাগই ছিল কাঠের সিন্দুক, খাট, বেঞ্চি ইত্যাদি। তারা বাঁকানো পায়ের চেয়ারও বানাত খ্রী. পূ. ২০০০ সালে।

ভারতীয়দের সবার বাড়িতেই কুয়োর ব্যবস্থা ছিল। কারণ প্রচুর জল ব্যবহার করত তারা। প্রতিদিনই গোসল করত তারা। ছিল গণস্নানাগার এবং এগুলো নিয়মিত ব্যবহার করত সিন্ধুবাসী; গণ স্নানাগারে আড্ডা মারার উৎকৃষ্ট জায়গাও ছিল।

আমরা ঠিক জানি না শুরুর দিকে ঠিক কি ধরনের সামাজিক গঠন ছিল সিন্ধুবাসীদের। মহেঞ্জো-দারো এবং হরপ্পার কিছু বাড়ি একটির চেয়ে অন্যটি আকারে বড় ছিল। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় একটি ধনী শ্রেণী ছিল যাদের স্থান সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচুতে ছিল। ভারতীয়রা খুব ভাল ব্যবসায়ী ছিল। তাদের তৈজসপত্র, গহনা এবং ধাতব কাজ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া গেছে। এ কারণে সম্ভবতঃ বড় বড় বাড়ির মালিক থাকত সওদাগররা।

ভারতীয়রা তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করত ব্যাপক হারে। তারা রাজপুতনার খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে শিখেছিল এবং ওই ধাতু দিয়ে বানাত মাছ ধরার বড়শি, তামার মাথাঅলা তীর, ক্ষুর ও ব্রোঞ্জের আয়না। ভারতীয় মহিলারা বেশ রঙ ঝলমলে কাপড় পরত। তারা খাটো ঘাগরা পরত। তাদের জামাকাপড় ছিল উল কিংবা লিনেনের তৈরি। সোনা, রূপা কিংবা খোলা দিয়ে তৈরি গহনা পরত তারা। এসব গহনায় জেড পাথর কিংবা নীলকান্তমণি লাগানো থাকত। পুরুষরা পরত রোমান টোগার মত আলখেল্লা।

সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা অত্যন্ত দক্ষ কারিগর ছিল। চাকা ঘুরিয়ে কিভাবে সুন্দর সুন্দর মাটির তৈজসপত্র বানানো যায় তা ভালই জানা ছিল তাদের। তাদের কিছু কিছু কাজ আধুনিক যুগের কারিগরদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত।

কুমোররা তাদের তৈজসপত্রে ছবি আঁকত কিংবা রঙ মেখে দিত। জ্যামিতিক নকশা প্রিয় হলেও প্রাণীর ছবিও তারা আঁকত। ডিজাইনগুলো বেশিরভাগ আঁকা হতো কালো কালিতে।

ভারতীয়রা গায়ক পাখি এবং কুকুর পুষত। গবাদিপশুও পালত, ভেড়া, শুয়োর, ইত্যাদি পালত মাংসের জন্যে, গরু বা মোষ চাকায় চালিত যান টেনে নিত ভারতীয়রা গরুর গাড়ি আবিষ্কার করেছে বলে ধারণা করা হয়। ভারতীয়দের জীবনে প্রাণীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মিশরীয়দের মত তারাও অন্যান্য দেবতার মত কিছু পশুপাখির পুজো করত।

সিন্ধু সভ্যতার ভারতীয়রা যেমন দক্ষ কারিগর ছিল তেমন স্থাপত্য বিদ্যাতেও হাত ছিল দারুণ। তাদের কিছু স্থাপত্য খুবই সুন্দর, বেশ কিছু স্থাপত্য মহেঞ্জো-দারোতে আবিষ্কার হয়েছে।

সামর্থ ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রী. পূ.'র এ সময়ে খুব একটা অগ্রসর হতে পারে নি। তারা কোন প্রাসাদ কিংবা মন্দির বানায় নি, তাদের শাসকদের কারুকার্য মন্ডিত কবরের প্রতিও তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের পিতৃপুরুষরা যা করেছে তারা সেসব অনুকরণ করেছে মাত্র। ফলে একটি নিশ্চল জাতি হয়ে থেকেছে। বহিরাগতদের সহজ শিকার ছিল তারা।

খ্রী. পূ. ১৫০০ সালের দিকে কাসিটরা, যে উপজাতিরা বেবিলন দখল করেছিল, তারা সিন্ধু উপত্যকায় ঢুকে পড়ে এবং শহরগুলো দখল করে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে। তারা সরল, বর্বর স্বভাবের লোক ছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির কোন কিছু গ্রহণ করেনি বা এ সভ্যতার উন্নয়নের চেষ্টাও চালায় নি। হরপ্পা, মহেঞ্জো-দারো সহ ছোট ছোট শহরগুলো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

পরবর্তী হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব হয় নি। আবার ভারতীয়রা যখন একটি সভ্য ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করে ওই সময় তার মধ্যে আগেকার সভ্যতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। হয়তো নৃতত্ত্ববিদরা এক সময় আবিষ্কার করতে পারবেন খ্রী. পূ. ১৫০০ থেকে ৫০০ অব্দের মাঝখানের সময়টাতে কি ঘটেছিল।

# চীনা সভ্যতার শুরু

সুমের, মিশর, বেবিলন ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয় : সবগুলো সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর তীরে উপত্যকায়। চীনা সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ সভ্যতার শুরু উত্তর চীনের হোয়াংহো (হলুদ) নদীর তীরে, বর্তমান বেইজিং-এর ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণে।

দেশটির প্রাচীন কিংবদন্তী বলে চীনা সভ্যতার শুরু খ্রী. পূ. ৩০০০ সালে। তবে এ সভ্যতা যে এত প্রাচীন তার কোনরকম ঐতিহাসিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওই সময় নিওলিথিক মানব অগ্রসর প্রস্তর যুগের সুযোগ সুবিধা গুলো উপভোগ করছিল। এবং এরা ছড়ানো ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। এবং এ কথাও ভুললে চলবে না ১৯২৭ সালে তৎকালিন পিকিং (বর্তমান বেইজিং)-এর কাছে হোমো ইরেকটাসের নমুনা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এই নিওলিথিক মানবরা হোয়াংহো উপত্যকায় উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং এর উর্বর, হলুদ মাটিতে কৃষি কাজ শুরু করে দেয়।

হোয়াংহো নদীর পাড় প্রায়ই ভেঙে পড়ে বিশাল এলাকা নিয়ে প্লাবিত হতো। মাঝে মাঝে স্রোতের গতি এত তীব্র ছিল যে গোটা নদীর গতিপথই যেত বদলে। বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা প্রাচীন উপনিবেশগুলো এ বন্যায় ধ্বংস হয়ে যেত, ভেসে যেত মাঠের ফসল। চীনের গল্পের বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে বন্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনী এবং যে সব নেতা জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এ সমস্যার মোকাবেলা করতেন, তাদের কথা।

অনেক আগে থেকেই উর্বর সমভূমি কেটে খানা বা নালা তৈরি উপনিবেশকারীদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নদীর তীর থেকে গভীর পরিখা খনন করা হতো দূরের মাঠ পর্যন্ত। এই পরিখা বা গর্ত ফসল উৎপাদনে সেচের কাজে খুব লাগত এবং অবশেষে উপত্যকার কৃষকরা সমৃদ্ধির মুখ দেখে। পয়োনালী ব্যবস্থায় কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল যাতে গর্ত বা পরিখাগুলো খুব বেশি অগভীর না হয়। এ কাজে প্রচুর শ্রম দিতে হতো। ফলে শ্রমিক জোগাড়ও করতে হতো। এভাবে, গ্রাম এবং শহর গোষ্ঠী যে কোন সভ্যতার শুরুতে যা ছিল প্রয়োজনীয় উপাদান– উন্নতি লাভ করে দলবদ্ধ লোকদের সাহায্যে যারা একত্রিত হয়ে লড়াই করত বন্যার বিরুদ্ধে।

গোড়ার দিকের চীনা ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক রেকর্ডে উল্লেখ আছে সিয়া (Hsia) ডাইন্যাষ্টি নামে একটি রাজবংশের শাসকরা দেশ শাসন করতেন। সিয়া ডাইন্যাষ্টির শুরু খ্রী. পূ. ২০০০ অব্দে এবং কয়েকজন শাসক যেমন ফুসি, শেন নুং, য়ু দ্য গ্রেট (সম্ভবতঃ প্রথম শাসক) পৃথিবীকে রক্ষা করেন ভয়াবহ বন্যার কবল থেকে। য়ু দ্য গ্রেট অত্যন্ত ভাল প্রকৌশলী ছিলেন। ইনি হোয়াংহো নদীর ভয়ঙ্কর বান ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন বাঁধ তুলে।

চীনা আরো যে সব ডাইন্যাষ্টির কথা জানা যায় তার মধ্যে একটি শ্যাং ডাইন্যাষ্টি। এ রাজবংশের প্রথম রাজা বা সম্রাট রাজত্ব করে গেছেন খ্রী. পূ. ষোড়শ শতকে। তার নাম ট্যাং। তিনি হোয়াংহোর তীরে চেংচুর রাজধানী থেকে শাসন করতেন। তিনি শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন, চীনে নতুন শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক একটি সমাজ গঠন করেন (এ রকম সমাজ গড়ে উঠেছিল উত্তর পশ্চিমে ইউরোপে, শার্লেমেনের সময়ে এবং পরে)। ট্যাং গোটা দেশের সমস্ত জমির মালিকানা ভোগ করতেন, পরে এ জমি লিজ দিয়ে দেন তার অনুগামীদেরকে যারা তার সঙ্গে কাজ করত। এদের মধ্যে সশস্ত্র মানুষজনও ছিল। সম্রাট যুদ্ধে গেলে তার সঙ্গে যেত। রাজত্বকালে প্রতিবেশী রাজ্যও দখল করেছেন ট্যাং। তিনি শ্যাং সম্রাটদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করেন। তার মৃত্যুর পরে তার ছেলে সিংহাসনে বসেন।



*ঐতিহ্যবাহী পোশাকে একজন শ্যাং যোদ্ধা।*

শ্যাং সময়ের গোড়ার দিকে চীনা সভ্যতা দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। চীনারা একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে যা অন্যান্য পাণ্ডুলিপি থেকে ছিল আলাদা। এটি কতগুলো ক্যারেক্টার বা চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত, প্রতিটি ক্যারেক্টারে ছিল একটি করে ছবি যা সম্পূর্ণ একটি শব্দের ধারণা দিত। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য হলো হাজার বছরেও এর পরিবর্তন ঘটেনি এবং চীনারা আজও প্রাচীন চিহ্ন বা ক্যারেক্টার পড়তে পারে অনায়াসে। প্রকারান্তরে ব্রিটিশদের পক্ষে ডুমস ডেবুক-এর আসল লেখা পড়া এবং বোঝা প্রায় অসম্ভব, যদি না তাদের ১০৮০ সালে লেখা এ ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে।

চীনারা এক ধরনের পরিবর্তশীল টাইপের ধরন আবিষ্কার করেছিল যাকে প্রিন্টিং-এর পূর্বপুরুষ বলা চলে। তবে দুভার্গ্যবশত এই চীনা আবিষ্কার অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা মিশর, গ্রীস কিংবা রোমে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। চীনাদের সাহিত্য, আইন এবং নথিপত্র শুধু হাতে লেখার ছাঁচে সংরক্ষিত থাকত। তাছাড়া, আরো অনেক প্রাচীন সাহিত্য এবং বৈধ নথিপত্র চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। প্রিন্টিং বা ছাপার কাজ পশ্চিমা পৃথিবীতে ১৫ শতকের আগে শুরু হয় নি।

শ্যাং সম্রাটদের অধীনে চীনারা ব্রোঞ্জসহ অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল এবং সময়ের সাথে লোহার ব্যবহারও। ধাতুর আকরিকের স্থানীয় সরবরাহ ছিল সীমিত, তাই চীনাদেরকে পশ্চিমের আমদানীর উপরে নির্ভর করতে হতো, বিশেষ করে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণের অঞ্চলে। মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং ভারতও একই এলাকায় ব্যবসা করত এবং চীন এসব সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। কিছু পরিচিত ক্ষেত্রে, গোড়ার দিকের চীনা ধাতুর কাজে এদের খানিকটা প্রভাব ফেলেছিল। তবে চীনারা নিজেদের পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে ওঠে এবং অত্যন্ত উঁচু মানের কাজ দেখায় তারা। এদের কিছু চমৎকার কাজ সংরক্ষিত রয়েছে লণ্ডনের ইংল্যাণ্ড'স ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে। কিছু ডিজাইন সমসাময়িক সভ্যতাগুলোর যে কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে।

চীনারা ইতিমধ্যে নিজেরা চাকাও বানিয়ে ফেলেছিল এবং তারপর থেকে তারা গাড়ি, যুদ্ধ রথ ইত্যাদিও তৈরি করে। তারা লাঙল বানায় এবং সর্ব প্রথম লাঙলের পেছনে জুতে দেয় ঘোড়া। আরেকটি শ্যাং আবিষ্কার ছিল চীনা পঞ্জিকা। এ পঞ্জিকায় কখন মাঠে ফসল ফলাতে হবে, কখন শস্য তুলতে হবে তার উল্লেখ থাকত। সাধারণত জুলাইর মধ্যে শস্য ফলানোর কাজ শেষ হয়ে যেত। কারণ এর পরপরই এসে যেত বন্যা।

রেশম পোকার গুটি থেকে সিল্কের সুতো তৈরির গোপন ব্যাপারটা চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করে। এ আবিষ্কারের কথা তারা বহু বছর গোপন রেখেছে। অন্য

সভ্যতার মানুষজন যখন প্রথম তাদের সিল্কের তৈরি অসাধারণ উৎপাদন সামগ্রী দেখে তাদের জানার খুব আগ্রহও হচ্ছিল কিভাবে এগুলো বানানো হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদেরকে কখনো গোপন ব্যাপারটি জানানো হয়নি। ফলে রেডিমেড সিল্কের গাঁইট নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বাড়ি ফিরতে হতো। অন্যদের মত উলের শিল্পে অগ্রসর হতে পারেনি চীনারা, সম্ভবতঃ মেষপালন তাদের কাছে তেমন লাভ জনক বলে মনে হয়নি। তাই তারা নিকট প্রাচ্য থেকে উলেন দ্রব্যাদি কিনত। তবে বাণিজ্যের রাস্তাটা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ 'চেনা' পৃথিবী থেকে বহুদূরে বাস করত চীনারা।

খ্রী. পূ. ১৪০০ অব্দের কোন এক সময় শ্যাংদের রাজধানী হোয়াংহো উপত্যকা থেকে অ্যান-ইয়াং-এ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর খনন চলেছে। একবার মাটি খুঁড়ে এক রেজিমেন্ট সৈন্য, যুদ্ধরথ, গাড়ি এবং ঘোড়ার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। বলা হয় লোকগুলোকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। একই কবরে ধাতু এবং জেড পাথরের চমৎকার সংগ্রহের সন্ধান মিলেছে। গোড়ার দিকের একজন সম্রাট, শ্যান কেং নাকি অ্যান-ইয়াং এ রাজধানী স্থানান্তর করেন, শ্যাংদের আমলে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে শহর এবং চীনা সমাজ গ্রাম্য অবস্থা থেকে ক্রমে শহুরে হয়ে উঠেছে। স্তরে স্তরে গঠিত হয়েছে সমাজ; উপরের শ্রেণীর অভিজাতরা ছিলেন সেনাবাহিনীতে; তাদের নিচের পদের কমকর্তারা সম্রাট এবং সেনাধ্যক্ষদের সেবা করতেন; তারপরে অবস্থান ছিল সওদাগর, কারিগর এবং কৃষক শ্রেণীর। প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতার মত চীনা সমাজেও ক্রীতদাস ছিল, সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দী বিদেশীদেরকে ক্রীতদাসের জীবন বেছে নিতে হতো। এদেরকে বলা হতো চি'য়াং।

উপরের শ্রেণী বা উচ্চস্তরের লোকজন কিভাবে বাস করতেন প্রাচীন চীনে? তারা বিলাসবহুল, অভিজাত ও সহজ জীবন কাটাতেন শিকার করে, মাছ ধরে, খেলাধূলা করে। অবশ্য যখন যুদ্ধে যেতে হতো না ওই সময়টুকুতেই শুধু এ আয়েশ উপভোগ করা যেত। কাঠের থাম দিয়ে তৈরি বাড়িতে বাস করতেন তারা, ওগুলোর ভেতরের অংশ আবার প্লাস্টার করা থাকত মাটি দিয়ে। ছাদ ছিল কার্নিশ ওয়ালা, ত্রিকোণ বিশিষ্ট, দেয়ালে সাজানো থাকত বহুরঙা সিল্ক, তাতে চমৎকার সব প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা।

নিচুশ্রেণীর লোকজনের বাড়িতে আভিজাত্যের ছিটে ফোঁটাও থাকত না, আরো গরীব মানুষ মাটিতে গর্ত করে নখলখাগড়ার মাদুর পেতে ঘুমাত।

শ্যাংরা কয়েক শতাব্দী তাদের ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। তারা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ধাতব জিনিস তৈরিতে, ছিলেন দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার এবং রথচালক। ফলে উত্তর ও পশ্চিমের পাহাড় থেকে নেমে আসা বর্বর উপজাতিরা নদীর তীরের

শান্তিময় এ সভ্যতার জন্যে তেমন একটা হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে নি। শ্যাং সৈনিকরা ছিল প্রায় অজেয়। ব্রোঞ্জ হেলমেট, গ্রীভ (হাঁটুর নিচে পায়ে পরার বর্ম), ব্রেষ্ট প্লেট, ক্ষুরধার কুঠার, তীর এবং ব্রোঞ্জের ডগা লাগানো তীরে সজ্জিত হয়ে, দুই বা চার ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যখন তারা বেরিয়ে পড়ত যুদ্ধাভিযানে, ওই দৃশ্য শত্রু পক্ষের পিলে চমকে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

শ্যাংরা নিজেদের স্বার্থেই সামরিক অভিযানে আগ্রহী ছিল না, তবে প্রতিবেশীদের মাঝে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন ছিল। চু নামে একদল লোক শ্যাংদের নজর কেড়ে নেয়। চুদের আগমন চীনের পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চল থেকে। তারা হোয়াংহো ও ইয়াজিং নদীর মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় সমভূমিতে ঢুকে পড়ে এবং শ্যাং সংস্কৃতির অনেক কিছুই গিলে খায়। অবশেষে, চুংরা খ্রী. পূ. ১০৩০-১০২০ অব্দে শ্যাংদেরকে সিংহাসনচ্যুত করে। সর্বশেষ শ্যাং সম্রাট সম্ভবতঃ ১০২৭ খ্রী. পূর্বে মারা যান অথবা সিংহাসনচ্যুত হন।

# পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় জনগণ

মানব জাতির গোড়ার দিকের সভ্যতার পুরোটাই গড়ে উঠেছে একেক-ধরনের সাম্রাজ্যের উপরে ভিত্তি করে। নিকট প্রাচ্যে, মিশরের উত্থান এবং পরবর্তীতে হিতিত শক্তির অগ্রসরতার মানে এই দুই সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের লেভানটাইন উপকূলকে নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রী. পূ. ১২০০ শতকে হিতিত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় ইন্দো-ইউরোপীয়ান হামলায়, আর মিশর ঠিক ওভাবে ধ্বংস না হলেও দুর্বল শক্তিতে পরিণত হয়। লেভানটাইন উপকূলীয় এলাকা ছিল ফার্টাইল ক্রিসেন্টের অংশ এবং আরব থেকে আসা সেমিটিকদের কাছে লোভনীয় বস্তু। শুধু সেমিটিক নয়, উত্তর-পশ্চিমের বর্বর জাতিও চাষ উপযোগী জমির সন্ধান করছিল, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ব্যবসায়ীরাও আকৃষ্ট হয়েছিল ওই অঞ্চলের প্রতি। লেভান্টের উত্তর অংশ সিরিয়া সে সময় বাণিজ্যের জন্যে উপযুক্ত স্থান ছিল। এমনকি লেভান্টের উপরে কে কর্তৃত্ব করবে তা নিয়ে মিশর এবং হিতিতরা পরস্পরকে হিংসার চোখে দেখত।

সিরিয়ার নগরীগুলো ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। উগারিট ও দামাস্কাস সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছিল এবং গোটা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্যে সিরিয়া হয়ে ওঠে ক্রস-রোড বা বাণিজ্যের সংযোগস্থল। সিডন, বিবলস ও টায়ারের রূপান্তর ঘটে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রে, ফিনিসিয়ায়। ফিনিসিয়া হলো উত্তর উপকূলের এক ফালি সরু জমি। প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে জেরিকো, জেরুজালেম ও গাজাও ক্রমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল।



*সলোমন, হিব্রুদের রাজা।*

এসব শহরের লোকজন ওই সময়ের বৃহৎ সাম্রাজ্য দ্বারা ছিল প্রভাবিত।

উদাহরণ হিসেবে উগারিটের কথা বলা যায়। খ্রী. পূ. ১২০০ শতকে এ শহর বহিরাগতদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায। এ শহর খুঁড়ে মিশরীয়, সুমেরিয়ান, হিতিত ও বেবিলোনিয়ান উৎপত্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। উগারিট ছিল ফিনিসিয়ার উত্তরে একটি কসমোপলিটান ও উপকূলীয় শহর। আসিরিয়ান অঞ্চলে এর সীমান্ত ছিল। এ শহর নানা রকমের কাঠের জিনিস ও গহনা, প্রসাধনী এবং রঙিন বস্ত্র রপ্তানী করত। কাপড় রাঙানো হতো শেল ফিস দিয়ে বানানো বিখ্যাত টাইরিয়ান রঙ দিয়ে। উপকূলে শেলফিশ মিলত প্রচুর।

উগারিট ও তার প্রতিবেশী শহরগুলো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে থাকত। তাদের নিজস্ব সরকার ছিল। তবে কোন রকম মিত্রসঙ্গ তারা তৈরি করেনি শাসকদের জন্যে তা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে। ফিনিশিয়ান ও সিরিয়ান শিল্পকলারও নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। লেভানটাই শহরে স্থাপত্য, গহনা ও তৈজসপত্র অন্য লোকদের শিল্প ও কলার ভাল অনুকরণ ছিল।

যেবার ইন্দো-ইউরোপীয়ান হামলাকারীরা আসে, তাতে শুধু লেভানটাইন শহরের মানুষই আক্রমণের শিকার হয়নি, হিতিত এবং মাইসেনিয়ান শহরও ধ্বংস হয়ে যায়, নিকট প্রাচ্য ভরে যায় যুদ্ধবাজ উপজাতিতে।

এই হামলাকারীরা কে ছিল? তারা ছিল উত্তরের অর্ধ-সভ্য ইন্দো-ইউরোপিয়ান উপজাতি। এদের কেউ কেউ সুদূর ইতালি এবং পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত পৌছেছে। অন্যেরা এগিয়েছে পারস্য উপসাগরের দিকে, আবার কেউ চীনের শ্যাং সাম্রাজ্যের সীমান্তেও গেছে। অনেক হামলাকারীই আস্তানা গাড়েনি। কারণ তাদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল শুধু লুন্ঠন।

উগারিটসহ অন্যান্য শহর ধ্বংস হয়ে গেলেও যেগুলো ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে বেঁচে যায় সেগুলো আর বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্য ছিল না। এরা একাকী নিজেদের উন্নতি করার সুযোগ পেয়েছে। লেভান্টের তিনটি এলাকায় মূল উন্নয়ন ঘটেছে : প্যালেষ্টাইন, ফিনিসিয়া ও সিরিয়া।

আব্রাহামের উত্তরসূরি ইহুদিরা, যারা সুমেরিয়ান সময়ের গোড়ার দিকে একদা কিছু দিনের জন্যে বাস করেছে উরেরে, তারা প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রটি গঠন করে এবং নির্মাণ করে জেরুজালেম শহর।

ফিনিসিয়া দুশো মাইল লম্বা এবং কুড়ি মাইল চওড়া একখণ্ড জমি, লেবানন পাহাড় ও ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে শুয়ে আছে, ছড়িয়ে পড়েছে অরোন্টেস নদী ঘেঁষে মাইন্ট কারমেলের উত্তরে। নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল সামুদ্রিক শহর, এসব শহর নিয়ন্ত্রণ করতেন স্থানীয় রাজবংশ। এসব শহরে চওড়া রাস্তাঘাট ছিল এবং রাস্তার পাশে তিন/চার তলা বাড়ি ছিল।

প্রধান শহর ছিল বাইব্লস (এখানে প্রথম প্যাপিরাস তৈরি হয় এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের অধ্যায় প্রথম ওতেই লেখা হয়), আভাডাস, সিডনন এবং টায়ার। সম্ভবতঃ ফিনিসিয়ার শ্রেষ্ঠতম শহর ছিল টায়ার।

টায়ারের এক শাসক, হিরামের (খ্রী. পূ. ৯৭০-৯৪০) সঙ্গে ইহুদি রাজা সলোমনের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। ইনি ডেভিডের ছেলে। দুই শাসনকর্তার যৌথ নৌবহর ছিল। হিরাম টায়ারের নদী বন্দরের উন্নয়ন সাধন করেন। ফিনিসিয়ানরা খুব ভাল নাবিক ছিল, তাদের ক্রমবর্ধমান নৌবহর এবং যুদ্ধ জাহাজের জন্যে ভাল বন্দরের প্রয়োজন হতো।

টায়ারে ফিনিশিয়রা বেশির ভাগ জাহাজ নির্মাণ করেন। তাদেরকে বিভিন্ন গাছ আমদানী করতে হতো জাহাজ তৈরির জন্যে। যেমন ডেকের তক্তার জন্যে ফার, মাস্তুলের জন্যে সিডার (দেবদারু) এবং বৈঠার জন্যে ওক। মিশর থেকে কিনে আনা লিনেন দিয়ে তৈরি হতো পাল। বিনিময়ে তারা বিক্রি করত দামী পাথর, কারুকাজ করা পোশাক, মসলা, মদসহ মূল্যবান পণ্য লোহা। মাইনোয়ানরা সমুদ্রবন্দরে পণ্য আনা নেয়ার কাজ করত আগে, তবে ফিনিশিয়রা এই লাভজনক ও আকর্ষণীয় কাজটি শুরু করে দেয় এবং খ্রী. পূ. ৮০০ সালে তারা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত নতুন বন্দর ও উপনিবেশেও ছড়িয়ে পড়ে। তারা সাইপ্রাস, সার্ডিনিয়ার সাথেও বাণিজ্য করত এবং এসব উপনিবেশে তারা গড়ে তোলে নতুন জেটি ও গুদাম ঘর, এর মধ্যে কিছু মাটি খুঁড়ে অস্তিত্ব মিলেছে নানা জিনিস সহ। অনেক দিন গোটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে কর্তৃত্ব করেছে ফিনিশিয়রা।

ফিনিশিয়রা ছিল দক্ষ কারিগর। তারা তৈজসপত্র, গহনা এবং অস্ত্র বিপুল পরিমাণে তৈরি করত এবং গোটা নিকট প্রাচ্যে এই জিনিসগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারা হাতির দাঁত, ব্রোঞ্জ ও কাঠের কাজ খুবই ভাল জানত। বেগুনি রঙ বিক্রি করে তারা প্রচুর পয়সা কমিয়েছে।

ফিনিশিয়রা ছিল উদার মনা সেমিটিক জনসাধারণ এবং তারা নানা ভাষায় কথা বলত। তাদের যে ভাষাটি সবচেয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা হলো একটি সেমিটিক ভাষা যাতে প্রায় ত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ এবং কয়েকটি স্বরবর্ণ ছিল। এগুলোর সাহায্যে তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ বর্ণমালা। ফিনিশিয় ব্যবসায়ীরা তাদের বর্ণমালা ছড়িয়ে দেয় পারস্যবাসীদের মাঝেও, পরে গ্রীকদের কাছে। গ্রীকদের কাছ থেকেই আমরা বর্তমানের বর্ণমালা পেয়েছি। সকল পশ্চিমা বর্ণমালা রচিত হয়েছে মূল ফিনিশিয় বর্ণমালা থেকে যা তারা সম্ভবতঃ মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক থেকে গ্রহণ করে।

ফিনিশিয়রা উত্তর আমেরিকায় যে উপনিবেশটি স্থাপন করেছিল তা বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর নাম কার্থেজ, অবস্থান বর্তমান

বাইজেরটার কাছে। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের দখল নিয়ে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে দ্বন্দ্ব রোমান সাম্রাজ্যের উপরে বিরাট প্রভাব রেখেছিল।

ফিনিশিয়দের উন্নয়নের সময়ে সিরিয়া তেমন ব্যস্ত ছিল না। ওখানে ছিল কিছু ক্ষুদ্র নগর-রাজ্য– কয়েকটির প্রতিষ্ঠাতা শক্তিশালী হিতিতিরা– নতুন শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা, পরিবহন ও লৌহ ঢালাই কারখানা আবিষ্কার হয়ে চলছিল।

নিকট প্রাচ্যে লোহার ব্যবহারের সাথে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় হিতিতিরা, পরে এটা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে লোহার আকর পাওয়া যেত। ফলে লোহার যন্ত্রপাতি বেশি বেশি তৈরি এবং বিক্রি হতো। লোহার মজবুত অস্ত্র ব্রোঞ্জের জায়গা দখল করে, যুদ্ধে ব্যবহার হতে থাকে লোহার তরবারি, বর্শা, ছুরি ও কুঠার। ব্রোঞ্জের অস্ত্রের বিরুদ্ধে লোহার অস্ত্র–ফলে দ্বিতীয়টির জয় হতে থাকে বেশি।

গোড়ার সময়ে সিরিয়ানদের প্রধান ব্যবসায়ীতে রূপান্তর ঘটে। তাদের বাজারের সুনাম গোটা সভ্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত, মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং বহু দূরের বিদেশী বন্দরের জিনিসপত্রও সিরিয়ার নগরীতে কিনতে পাওয়া যেত।

খ্রী. পূ. ৮০০ শতকে আসিরিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এক শতক কিংবা তারও বেশি সময়ের মধ্যে গোটা লেভানটাইন উপকূল চলে যায় আসিরিয়ার অধীনে এবং শহরগুলো হারিয়ে ফেলে তাদের স্বাধীনতা। ফিনিশিয়া ও সিরিয়ানরা তখনো নিকট প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সওদাগর ও নাবিক হিসেবে খ্যাতিমান ছিল এবং আসিরিয়ান ও মিশরীয়রা লেভানটাইন শহর ও তাদের লোকজনের সাহায্য গ্রহণ করত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

খ্রী. পূ. প্রায় ৬০০ শতকে নেচো নামে এক মিশরীয় ফারাও প্রথমবারের মত জিব্রালটার প্রণালী ছাড়িয়ে সমুদ্র অভিযান করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস লিখেছেন ফিনিশিয় জাহাজ ও তাদের মাঝিমাল্লাদের দুই বছর সময় লেগেছিল আফ্রিকা ঘুরে বেড়াতে।

লেভানটাইন শহরের মানুষ নিকট প্রাচ্যের সভ্যতার অগ্রগতির জন্যে অবদান রেখে চলছিল তাদের সংস্কৃতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়ে– গ্রীস থেকে পরে রোমে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্র-প্রিয় লোকগুলোর সাথে বিশ্ব ইতিহাসের গল্পের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারণ তারা পুব ও পশ্চিম সভ্যতা এবং প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সময়ের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করে।

# ইহুদি

লেভান্টের নিম্নপ্রান্তে আরেকটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটছিল, এমন একটি সভ্যতা যা অন্যগুলো থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এ হলো ইহুদি সভ্যতা, এ সভ্যতা প্রাচীন এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলেই নয়, এটি অবশেষে খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম দেয় বলে গুরুত্ব সর্বাধিক।



*হিব্রু রাজা আহাব, ৮৫৩ খ্রী. পূর্বে কারকারের যুদ্ধে আসিরিয়ান সৈন্যদেরকে পরাজিত করেন।*

হিব্রু বা ইহুদিদের আগমন সম্পর্কে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে তাদের নিজেদের লেখা থেকেই অনেক কিছু জানা যায়। এ ছাড়া গত শতকে নানা খোঁড়াখুঁড়ি থেকেও বাইবেলের অনেক কাহিনীর পেছনের ঘটনার কথা জানা গেছে।

ইহুদিরা ছিল নিকট প্রাচ্যের ভবঘুরে সেমিট উপজাতিদের বংশধর। প্রথম উপজাতিরা মেসোপটেমিয়ায় বাস করত তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ লগ্নে। খ্রী. পূ. ১৯০০ শতকের দিকে তারা সুমেরিয়ান ও বেবিলনিয়ানদের অধীনে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অব্রাহাম নামে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী এক কৃষকের নেতৃত্বে পশ্চিমে অগ্রসর হয় নতুন দেশের সন্ধানে যেখানে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা যাবে।

অনেক ঘোরাঘুরি শেষে তারা নিম্ন কানানের হেবরনের কাছে এসে থিতু হয়। শীঘ্রি তাদের সঙ্গে আরেক সেমিটিক উপজাতি যোগ দেয় এবং কাছেই আলাদা কম্যুনিটি গড়ে তোলে। এই সেমিটরা, পরে যাদেরকে হিব্রু বা ইহুদি বলে

অভিহিত করা হতো, নিজেদের জীবন ধারণ শুরু করে ভেড়া বা মেষ চড়িয়ে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ফসল ফলিয়ে।

প্যালেস্টাইনে তেমন বৃষ্টি হতো না, ফলে শস্যের ফলন ছিল খুবই কম। ভেড়ার পালকে এ জন্যে কষ্ট সইতে হতো, আস্তে ধীরে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আব্রাহামের বংশধর এবং উপজাতিরা ভয়ঙ্কর খরার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। উদ্যমী কিছু ইহুদি দেশ ছেড়ে নতুন জায়গার সন্ধানে চলে যায় এবং উর্বর নাইল ডেল্টায় বসবাস শুরু করে। ফারাওরা তাদেরকে গ্রহণ করেন শারীরিক সামর্থ্য ও দক্ষতা দেখে।

খ্রী. পূ. ১৭৫০-এ মিশর আক্রমণ করে হাইকসসরা। এই সেমিটিক যোদ্ধারা ছিল ইহুদিদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তারা নাইল ডেল্টায় হামলা চালালে ইহুদিরা তাদেরকে স্বাগত জানায়। হাইকসসদের অধীনে তারা কিছু সমৃদ্ধিও অর্জন করে। এর মধ্যে একজন ছিলেন জোসেফ, জ্যাকবের এক সন্তান।

তবে ফারাও প্রথম আহমোস যখন হাইকসসদেরকে মিশর থেকে বিতাড়িত করেন, ইহুদিদেরকে হাইকসসদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার মাশুল গুণতে হয়। তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং ফারাওর আদেশে প্রকাণ্ড মনুমেন্ট ও কবর তৈরি করতে বাধ্য হয়। ইহুদিদেরকে এরকম দাসত্ব সহ্য করতে হয়েছে তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ইতিমধ্যে যেসব ইহুদি কানানে থেকে গিয়েছিল তারা টানা খরার মধ্যে বিপর্যস্ত দিন কাটাচ্ছিল। শুধু বিরূপ আবহাওয়ার জন্যে নয়, উপজাতিদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহও তাদের এ অবস্থার জন্যে দায়ী।

তবে একটি বিষয় ইহুদিদেরকে শত কষ্ট সহ্য করে সামনে নিয়ে যাচ্ছিল– তাহলো তাদের অগাধ বিশ্বাস। ওই সময় পৃথিবীতে তারাই একমাত্র মানুষ ছিল যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত।

খ্রী. পূ. ১২৫০-এ মিশরে, হিব্রুদের মাঝে নতুন এক ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে, তিনি মোজেস। এই মহান ব্যক্তিটি যেমন ছিলেন তীক্ষ্ণধী, তেমনই মজবুত ছিল তার ন্যায়নীতি। তিনি নিজের লোকদের জন্যে সুন্দর একটি জীবন উপহার দেয়ার জন্যে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি ইহুদি প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন। মোজেস গোটা মিশরকে ধরে এমন নাড়া দিয়েছিলেন যে ফারাও দ্বিতীয় রামেসেস মোজেসকে তার লোকদের একত্রিত করে দেশের বাইরে যাবার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। একে বলা হয় এক্সোডাস (মিশরত্যাগী হিব্রুদের দলবদ্ধ প্রস্থান)। এই এক্সোডাস ইহুদি ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, কারণ এর ফলে তারা প্রথমবারের মত জাতীয় একাত্মতাকে উপভোগ করার সুযোগ পায়।

মোজেস আইনের নির্দিষ্ট রূপ দান করেন এবং গঠন করেন ধর্মীয় নীতি। শতবর্ষের মধ্যে ইহুদিরা উন্নতি করতে শুরু করে এবং মোজেসের পরেও তাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। সম্পূর্ণ ধর্মীয় নীতিতে উদ্বুদ্ধ ছিল তারা। একে বলা হতো টোরা। টোরার ভিতে উল্লেখ আছে ওল্ড টেষ্টামেন্টের পাঁচটি বইতে (এগুলো হলো জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বারস এবং ডিউটেরোনোমি)। টোরার সাথে হাম্মুরাবির 'কোড' এর মিল ছিল, ওখান থেকেও কিছু অংশ নেয়া হয়। মোজেস এসব আইন ও নীতির নির্যাস একত্রিত করেন।

এর ফলে পরবর্তী কয়েকটি শতকে দেখা যায় কয়েকজন হিব্রু নেতা শুধু বিগ্রহ বা সরকার গঠনে ব্যস্ত থাকতেন না, তারা ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। অনেকেই ছিলেন প্রফেট বা নবী, এদের কথা বর্ণনা আছে ওল্ড টেষ্টামেন্টের বইতে।

ইহুদিরা কানানে পৌছার আগেই মারা যান মোজেস। কানানে পৌছে তারা উপজাতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই আইনের অধীনে এক ধরনের স্বাধীন জীবন-যাপন শুরু করে দেয়। তবে কানানে বসবাসরত ইহুদিরা শীঘ্রি পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ একটা সময়ের জন্যে। তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যুদ্ধবাজ ফিনিশিয় এবং প্যালেষ্টাইনিদের সঙ্গে। এরা মাউন্ট কারমেলের নিচের কয়েকটি ছোট শহর দখল করে নিয়েছিল। এই যোদ্ধারা লোহার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত এবং ক্রমে কানানের ভেতরের অংশ ঘেরাও করতে থাকে। লুটপাটের মালামাল দিয়ে তারা মজবুত ও সুন্দর এক সারি শহর গড়ে তোলে। এসব শহরের মধ্যে জোপ্পা ও গাজার কথা উল্লেখ আছে ওল্ড টেষ্টামেন্টে।

ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদেরকে তাদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি মনে করত। তাই প্রায়ই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। তবে ফিলিস্তিনিরা সব সময় জয়ের স্বাদ উপভোগ করতে পারে নি। ইহুদি নেতা স্যামসন পরাজিত করেন ফিলিস্তিনিদেরকে।

স্যামসনের মৃত্যুর পরে ইহুদিরা তাদের প্রথম রাজবংশের পত্তন ঘটায় সাউল নামে এক দক্ষ কূটনীতিককে রাজা বানিয়ে খ্রী. পূ. ১০৩০-এ। সাউল পূর্ণ সেনা কর্তৃত্ব পেয়ে যান। তবে সেনাপতি হিসেবে তেমন একটা সুবিধে করতে পারেন নি তিনি, যদিও একটি কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকর করে তোলেন তার জামাতা ডেভিড।

খ্রী. পূ. ১০১০-এ ইহুদিরা ডেভিডকে তাদের রাজা নির্বাচন করে। খুব ভাল ইহুদি নেতা ছিলেন তিনি, পাশাপাশি একজন দক্ষ সৈনিক, কূটনীতিক, প্রফেট ও আইন-প্রণেতা হিসেবেও তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইবেলে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ফিলিস্তিনি দানব গোলিয়াথকে হত্যা। ডেভিড গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে গোলিয়াথকে মেরে ফেলেন। ডেভিড প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছেন। ওই সময়ে তিনি ইহুদি রাজ্য সম্প্রসারণ করেছেন এবং

জেরুজালেম দখল করে ওটিকে তার রাজধানী বানিয়েছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কিছু তিনি দখল করেছেন, কয়েকটির সাথে মৈত্রী চুক্তিতে গেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। এ সরকার থেকে প্রাদেশিক রাজ্যগুলোর আঞ্চলিক সরকাররা কিছুটা ক্ষমতা ভোগ করতে পারত।

ডেভিড মারা যান খ্রী. পূ. ৯৭০ সালে। তার জায়গায় আসেন ছেলে সলোমন। ইনি প্রচণ্ড ধনী এবং জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। বাবার মতই দীর্ঘ সময় রাজত্ব করে গেছেন সলোমন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। যদিও ডেভিডের মত সামরিক দক্ষতা তার ছিল না। তিনি প্রতিবেশীদের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলেন, বিশেষ করে ফিনিশিয়দের সাথে যাদের শিল্পী ও কারিগরদেরকে জেরুজালেমসহ অন্যান্য শহরে কাজ করার আহ্বান জানান ডেভিড। এই মৈত্রী দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং সলোমনের দালান-কোঠা নির্মাণের বিশাল পরিকল্পনায় ব্যাপক প্রভাব রাখে। সলোমন হিব্রু দেবতার জন্যে একটি প্রকাণ্ড মন্দির তৈরি করেছিলেন। চৌদ্দ বছর সময় লেগেছে এ মন্দির তৈরিতে। শ্রমিকদের অনেকেই ছিল ফিনিশিয় কারিগর। সলোমন ইহুদি সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং এমন একটি কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যেখানে ধনী অঞ্চলগুলোকে বেশি কর দিতে হতো, গরীব অঞ্চলগুলোকে কম।

ইহুদিরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকলেও খ্রী. পূ. ৯৩০ সালে সলোমনের মৃত্যুর পরপরই তাদের রাজনৈতিক একাত্মতা ভেঙে যায়। দেশ দুটি অসম ও স্বাধীন রাজ্যে ভাগ হয়ে পড়ে, ইসরায়েল এবং জুদা। উত্তরে বৃহত্তর ইসরায়েলের রাজধানী ছিল সামানিয়া, আর ক্ষুদ্রতর দক্ষিণের জুদার রাজধানী ছিল জেরুজালেম। এই বিভক্তির পেছনে মিশরীয়দেরও ভূমিকা ছিল। কারণ ডেভিড ও সলোমনের উত্থানে তারা ভীত হয়ে পড়ে।

ইসরায়েলের পাশেই ফিনিশিয়া। এ রাজ্যের নেতারা শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে যথাসম্ভব সহযোগিতা করে চলছিল। খ্রী. পূ. নবম শতকে এক ইহুদি অভিজাত, ওমরি, ক্ষমতা দখল করে দেশ শাসন করতে থাকেন। তিনি তার সৈনিক পুত্র আহাবের সঙ্গে ফিনিশিয় রাজকুমারী জেজেবেলের বিয়ে দেন। ফলে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

খ্রী. পূ. ৮৫৩'র দিকে আহাব দারুণ একটি সেনাবাহিনী গঠন করে ফিনিশিয়, ইসরায়েলি ও লেভানটাইনের সম্মিলিত বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী আসিরিয়ানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কারকারের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। তবে এ সাফল্য বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি। শীঘ্রি আসিরিয়ানরা শক্তি বৃদ্ধি শুরু করে দেয়।

উপজাতিদের পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী সংঘর্ষ শুরু হলে ইসরায়েলের পতন ঘটতে শুরু করে। খ্রী. পূ. ৭২১-এ আসিরিয়ার রাজা দ্বিতীয় সারগন ইসরায়েল আক্রমণ করে দখল করে নেন আমারিয়া এবং ইসরায়েলি নেতাসহ বেশিরভাগ লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে পাঠিয়ে দেন মেসোপটেমিয়ায়, সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি তারা। ওদের জায়গায় আসিরিয়ানরা নিজেদের লোকজন এনে বসায় আর সবকিছুই করা হচ্ছিল ইহুদিদের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে।

তবে আকারে ক্ষুদ্রতর রাজ্য জুদাকে অবশ্য ভয়ঙ্কর আসিরিয়ান কর্তৃত্ব সহ্য করতে হয়নি। তবে খ্রী. পূ. ৫৮৬ তে বেবিলোনিয়ান রাজা দ্বিতীয় নেবুচাদরেজার এ দেশ আক্রমণ করে দখল করে নেন জেরুজালেম। সলোমনোর বিশাল মন্দিরের অনেকখানি অংশ ধ্বংস করে ফেলেন তিনি অন্যান্য পাবলিক বিল্ডিংসহ। এ দেশের নেতাসহ জনগনের কিছু অংশ পাঠিয়ে দেয়া হয় বেবিলনে।

পারস্যের বিখ্যাত সাইরাস দ্য গ্রেট ৫৩৯ খ্রী. পূর্বে বেবিলন জয় করেন এবং জুদিয়ান ও তাদের পরিবার যারা জু বা ইহুদি নামে পরিচিত ছিল, জেরুজালেম যেতে অনুমতি দেন। পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে জুদাকে সংযুক্ত করলেও সাইরাস জুদের নিজস্ব সরকার গঠনের জন্যে বড় একটি অংশ ছেড়ে দেন। গভর্ণরকে সাধারণত জুদের লোকজন থেকে নির্বাচিত করা হতো, এর মধ্যে বিশ্বাসের কোন ভূমিকা থাকত না এবং নতুন পুরোহিতরা তাদের পূর্ব পুরুষদের মতই ক্ষমতা ভোগ করতেন। তারা পারস্য আইনকে অনুসরণ করে রাজ্য চালাত।

জু'রা সলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণ করে ধ্বংস হওয়া জেরুজালেমের সংস্কার করে। পাঁচশ বা তারও বেশি বছর ধরে জু'রা নিজস্ব সরকার নিয়ে তুলনামূলক শান্তিতে দিন কাটিয়েছে, যদিও জেরুজালেম ১৬৭ খ্রী. পূর্বে সিরিয়ার অ্যান্টিওকাসের হাতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জুরা যখন কিছু রোমান অনুশাসনের বিরোধিতা করতে থাকে, সম্রাট ভেসপাসিয়ানের ছেলে টাইটাস ওইসময় জেরুজালেম দখল করে ফেলেন। জুরা সেবার বীরত্বের সাথে লড়াই করে অবাক করে দিয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীকে। এরপরে জু'রা নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে যতটা সম্ভব ভালভাবে জীবন ধারনের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত জু বা ইহুদিদের নির্দিষ্ট কোন থাকার জায়গা ছিল না। ১৯৪৮ সালে আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হলে ওখানে তারা বসতি স্থাপন করে। তবে জু'রা নানা দেশে কয়েকশ বছর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে ছিল অটল এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তাদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে হয়েছে চমকিত। খ্রীষ্টধর্মে জুদের প্রভাবের উপরে ছাব্বিশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

# আসিরিয়ান সাম্রাজ্য

আসিরিয়া নিকট প্রাচ্যের স্বল্প কয়েকটি রাজ্যের একটি যেটি ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয়ান হামলা থেকে বেঁচে যায়। তবে এ দেশটির শক্তি দারুণভাবে হ্রাস পায় এবং এর রাজ্য উত্তর মেসোপটেমিয়া ঘেরাও করেছিল। আসিরিয়া প্রাচীন বেবিলনকে আত্মভূত করে আগেই এবং খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ জুড়ে এটি ধীরে তবে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। হামলার সময়ে আসিরিয়া তার বিস্তৃতি বৃদ্ধি করে আশপাশের ধনী শহরগুলো আক্রমণ করে এবং জনগণকে বাধ্য করে ক্রীতদাসত্বের পেশা বেছে নিতে। এক আসিরিয়ান রাজা, টুকুলটি-নিনুরতা কয়েকটি হামলায় বিজয়ী হন এবং তার উত্তরসূরী প্রথম টিগলাথ-পিলেসার (১১১৫–১০৭৫ খ্রী. পূ.) হিতিত ভূমি দখল করে এশিয়া মাইনরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হন।

খ্রী. পূ. দশম শতকের প্রায় শুরুর দিকে আসিরিয়া ওই সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজ্য হিসেবে পরিচিতি পাবার পথে অগ্রসর হতে থাকে। তার লোকজন ছিল বলিষ্ঠ, যুদ্ধবাজ জাতি নিয়ে গঠিত, তারা যেমন ভাল চাষবাস করত, ব্যবসায়ী হিসেবেও ছিল সুচতুর। ফার্টাইল ক্রিসেন্টের উর্বরতাকে তারা খুব ভালভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং বেশ কয়েকবার বহিরাগতদের হামলা ঠেকিয়ে দিয়ে জাতি হিসেবে গর্বের পরিচয় দিয়েছে। এটা ছিল সাম্রাজ্য গঠনের প্রথম পদক্ষেপ এবং তিনশ বছরের মধ্যে আসিরিয়ানরা নিকট প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত অঞ্চলসহ মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া ও আরবে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

আসিরিয়ানরা অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী শাসকদের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট ছিল যদিও সব সময় উত্তরাধিকার প্রশ্নে সাফল্যের মুখ তারা দেখতে পারেনি। দ্বিতীয় আদাদনিরারি (৯১০–৮৯০ খ্রী. পূ.) প্রথম সিভিল সার্ভিস সৃষ্টি করেন এবং স্থানীয় সরকারের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে তোলেন। তার পৌত্র আসুরনাসিরপাল দ্বিতীয় (৮৮৫–৮৬০ খ্রী. পূ.) কালায় নির্মাণ করেন একটি সম্পূর্ণ সুন্দর নগরী এবং এটি হয়ে ওঠে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী। তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এদেরকে সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধ বন্দীদেরকে আসিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় একটি বিশাল প্রাসাদ তৈরির জন্যে।

আসুরনাসির পালের মৃত্যুর পরে তার জায়গায় আসেন শালমানেসের দ্বিতীয় (৮৬০–৮২৫ খ্রী. পূ.)। কয়েক বছর পরে ফিনিশিয়, হিব্রু ও সিরিয়ানদের যৌথ বাহিনী নিয়ে ইসরায়েলি সেনাপতি আহাব কারকারে আসিরিয়ানদের সাথে লড়াই করেন খ্রী. পূ. ৮৫৩ তে। আসিরিয়ানদের নেতৃত্বে ছিলেন শালমানেসের।

প্রায় ৭৫০ খ্রী. পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন অত্যন্ত শক্তিশালি একজন রাজা, টিগলাথ পিলসার দ্বিতীয় (এর কথা ওল্ড টেষ্টামেন্টে উল্লেখ আছে)। তিনি আসলে তার পূর্বসুরীর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং সবাইকে জানিয়ে দেন তিনি আসিরিয়ার ক্ষমতা পুনর্গঠন করবেন। তিনি ট্রেনিং দিয়ে এমন এক নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন যাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। তিনি বেবিলনের একটি বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটন করেন এবং সিরিয়ায় হামলা করে দখল করে নেন এর রাজধানী দামাস্কাস।

নতুন এই আসিরিয়ান বাহিনী অনেক বেশি সফল হবার কারণ এরা ছিল সুশৃঙ্খল, সুগঠিত ও ভাল অস্ত্রে সজ্জিত। এই বাহিনীর সদস্যদের তুলে আনা হয় আসিরিয়ান পরিষদ ও লড়াকু কৃষকদের মাঝ থেকে। তাছাড়া বড় সৈন্যদলের দরকার হলে রাজা প্রচুর পয়সা দিয়ে নিয়ে আসতেন ভাড়াটে সৈন্য। সবার উপরে, সেনাবাহিনীর কাছে থাকত লোহার অস্ত্র ও দ্রুতগতির রথ। রথগুলো সেনাবাহিনী ব্যবহার করত বিদ্যুৎগতি আক্রমণের জন্যে, চালকদের সঙ্গে থাকত তীর-ধনুক। এদের পেছনে সেনাবাহিনীর মূল সদস্যরা দল বেঁধে আসত, সবার মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে তীক্ষ্ণ ডগার বর্শা ও মজবুত ঢাল।


বেবিলনের ইশতার ফটক, প্রধান দেবীর নামে নাম

এই সেনাবাহিনী ছিল অপরাজেয়, বলা হতো টিগলাথ-পিলেসার পরাজয় কি জিনিস জানেন না। এরা দ্বিতীয় সারগনের সেনাবাহিনীর মত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, সুশৃঙ্খল ও অকুতোভয় ছিল। দ্বিতীয় সারগনের সৈন্যরা পরবর্তীতে ইসরায়েলের হিব্রুদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধ্বংস করে দেয় দেশ। নেতা আর জনগণ বিতাড়িত করা হয় দেশ থেকে। সারগনের উত্তরসুরি সেন্নাচেরিব। ইনি ৭০৫ থেকে ৬৮০ খ্রী. পূ. সময়ে রাজত্ব করে গেছেন। তিনি বেবিলন জয় করে শহর ধ্বংস করে দেন এর অধিবাসীরা

আইনের বিরোধিতা করেছিল বলে। এরপরে তিনি নিনেভেকে আসিরিয়ান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী করেন। নিনেভেকে পুনর্গঠন ছিল কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগের এক অপূর্ব দিক। নিনেভের রাস্তাঘাট নতুন করে তৈরি করা হয়, বড় খোলা পার্ক তৈরি করা হয় এবং শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় জোড়া দেয়াল ও আট মাইল লম্বা অনেকগুলো গভীর পরিখা দিয়ে। তিন মাইল দূরে, নদীর ওপরে তিনশ গজ লম্বা একটি কৃত্রিম নালা তৈরি করা হয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে। এটি তৈরি করতে পাঁচ লাখেরও বেশি পাথর লেগেছে, এ নালা থেকে জল গড়িয়ে পড়ত একটি খালে, এ খাল ছিল নগরীর কেন্দ্রস্থলে।

সেন্নাচেরিবের পরে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে ইসার হ্যাডন। ইনি বেবিলনের কিছু অংশ পুনর্নির্মাণ করেন সম্ভবতঃ এ আশায় যে বেবিলনের লোকেরা তাহলে আসিরিয়ান আইনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকবে। তিনি মিশর ও সাইপ্রাসেরও অনেকখানি অংশ জয় করেন। তার অধীনে শক্তিশালি আসিরিয়ান সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর এবং আরারাত থেকে থেবস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইসার হ্যাডনের ছেলে আসুরবানিপাল (৬৭০–৬২৫ খ্রী. পূ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত নেতা, তাকে বলা হতো 'পৃথিবীর রাজা।' মিশরে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে খবর পেয়ে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে নীল নদের তীর ঘেঁষে দেশটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। থেবসে তিনি বিদ্রোহ পক্ষকে দমন করে লুণ্ঠন করেন নগরী।

সাম্রাজ্যের শক্তি ও একতা সংহত করার জন্যে যখন সময় দিতে হতো না, আসুরবানিপাল মনোযোগ দিতেন বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর দিকে। তিনি তার পরিষদ ভৃত্য ও সৈন্যদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি হাজার হাজার মাটির ফলক দিয়ে বিশাল এক পাঠাগার স্থাপন করেন। এসব ফলকের অনেকগুলোই ছিল বাইরের দেশের। তিনি সিভিল সার্ভিসও পুনর্গঠন করেন এবং রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের বিশাল কর্ম আরো বিস্তৃত করে তোলেন। রাস্তাঘাট সংস্কারের ফলে সম্রাটের কর্মচারীদের তার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরীতে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করতেন, ব্যবসায়ীদেরকে সুনজরে দেখতেন এবং প্রায় সব ধরনের সামাজিক বিষয়ের ওপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছিলেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে।

আসিরিয়ান সাম্রাজ্য সাফল্যের চূড়ান্তে ওঠে আসুরবানিপালের সময়ে। তবে পরবর্তী রাজাদেরকে সাম্রাজ্যের প্রজাদের জাতিগত দ্বন্দ্ব মেটাতে হিমশিম খেতে হয়েছে আর সবচেয়ে সমস্যা হতো বেবিলনকে নিয়ে। স্থানীয় সরকারকে আসিরিয়ানরা যে সব রাজ্য প্রদান করেছিল বিজয়ের মাধ্যমে, সেখানকার ধনী, অভিজাত ব্যক্তি ও জমিদাররা নিজেরা ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে উৎসাহী

হয়ে ওঠে। ক্ষমতাবান এ লোকগুলোকে হঠিয়ে দেয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কারণ রাজা ও তার কর্মকর্তাদেরকে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হতো তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশাল এলাকা নিয়ে।

আসুরবানিপাল মারা যাবার পরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অনেক প্রদেশ আসিরিয়ান নিয়ন্ত্রণ থেকে ছুটে যায়। তবে আসিরিয়ানদের জন্যে বেবিলনই শুধু বিপজ্জনক ছিল না। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত পারস্যও দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে চলছিল। ৬১২ খ্রী. পূর্বে পারসিয়ান, মেডেস ও চ্যালডিনদের (এরা প্রথম বেবিলন দখল করে) সম্মিলিত বাহিনী হামলা চালিয়ে বসে আসিরিয়ায়। ওই সময় আসিরিয়া শাসন করতেন দুর্বল রাজা ও সরকার। নিনেভ খুব সহজে দখল হয়ে যায়। নিনেভের পতনের পরপর আসিরিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বিশ্বসেরা সাম্রাজ্য মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, এর এলাকাগুলো ভাগ করে নেয় হামলাকারীরা।

চালডিন উপজাতিও নিনেভ লুঠ করেছিল। তারা বেবিলনে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে জয় করে নেয় মেসোপটেমিয়ার বেশির ভাগ অংশ এবং ওখানে আসিরিয়ানদের মত নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এক বেবিলোনিয়ান রাজা, নেবুচাডরেজার (৬০৫–৫৬০ খ্রী. পূ.) বেবিলন পুনর্গঠন করেন এবং দশ মাইল লম্বা জোড়া দেয়াল তুলে দেন এর চারপাশে। দেয়ালের ভেতরে তিনি বিখ্যাত ঝুলন্ত বাগান (শূন্য উদ্যান নামে পরিচিত) তৈরি করেন। এ বাগান প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।

নেবুচাডরেজারের প্রাসাদ অপূর্ব সব মূর্তি, গহনা আর টাইলস দিয়ে সাজানো ছিল। পাঠাগারটিও ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তার আমলে দক্ষ অদক্ষ বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

নেবুচাডরেজার একজন বিজেতাও ছিলেন। ৫৮৬ খ্রী. পূর্বে তিনি আক্রমণ করে দখল করে নেন জেরুজালেম, বন্দি করেন হাজারো হিব্রুকে এবং ইহুদি স্বাধীনতার শেষ বুরুজটিকে ভেঙে ফেলেন। তবে বেবিলনের নতুন বিজয় গৌরবের দিন শেষ হয়ে আসছিল। ৫৩৯ খ্রী. পূর্বে সাইরাস দ্য গ্রেট, পারস্যের রাজা দেশটিতে হামলা চালিয়ে রাজধানীতে ঝড় তুলে দেন। আশপাশের দেশ, যেগুলো ক্রমে ক্ষমতাবান হয়ে উঠছিল, সেগুলোর ক্রমাগত আক্রমণে দুর্বল বেবিলন এ হামলায় শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। সাইরাস তার বন্দিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। বেবিলন ছিল পারস্য বিজেতাদের জন্যে ধন সম্পদের উৎস। সাইরাসের লক্ষ্য ছিল আসিরিয়া যে সাম্রাজ্য একদা নিয়ন্ত্রণ করত তাকে পুনর্গঠন করা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে কাজে সফলকামও হয়েছিলেন। পারস্য ছিল আসিরিয়া ও বেবিলনের প্রকৃত উত্তরসুরি।

# পারস্যের শক্তি

পার্সিয়ান বা ফারসীরা ইন্দো ইউরোপীয়ানদের একটি জাতি। তারা পারস্য উপসাগরের উত্তর ও পুবের এলাকা দখল করে। ওই এলাকা বর্তমানে ইরান নামে পরিচিত। ফারসীরা খ্রী. পূ. ১২০০ শতকে ওখানে বসবাস শুরু করে। ওই সময় নিকট প্রাচ্য বিধ্বস্ত করে ফেলছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান হামলাকারীরা।



*দারিউস প্রথম, ইনি পারস্য সাম্রাজ্যকে ইউরোপ থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।*

খ্রী. পূ. সপ্তম শতকে আসিরিয়ান সাম্রাজ্য যখন তার উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির চূড়ান্তে, তখন ফারসীরা একটি রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল এবং প্রতিবেশীদের থেকে খুব বেশি [illegible] ছিল না তারা। নিনেভের পতনের পরে আসিরিয়া খুব [illegible] অংশে বিভক্ত [illegible] যায় এবং নিকট প্রাচ্যে গড়ে ওঠে অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য।

খ্রী. পূ. ৫৬০ শতকে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এক বিখ্যাত তরুণ কাইরাস অব আনসান (যাকে আমরা সাইরাস হিসেবে চিনি)। ইনি শ্রেষ্ঠতম ফারসী রাজা হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি নিকট প্রাচ্যে সেরা শক্তি

হিসেবে আবির্ভূত হবার স্বপ্ন দেখতেন। আর এ জন্যে পারস্যকে সুসংগঠিত করে তোলার পাশাপাশি একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই এ কাজে নেমে পড়েন সাইরাস।

তিনি ফারসী লোকজনের সমর্থন আদায় শুরু করেন। বিশেষ করে নজর দেন জমিদারদের প্রতি যারা স্থানীয়ভাবে ছিল ক্ষমতাবান। এরপরে তিনি সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন এবং লোহার নতুন, চমৎকার অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে সুসজ্জিত করে তোলেন। খ্রী. পূ. ৫৫০-এ তিনি প্রথম অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান এবং প্রতিবেশী রাজ্য মেডিয়ার ওপরে হামলা চালিয়ে বসেন। কয়েক হপ্তার মধ্যে রাজ্যটি বিধ্বস্ত করে ফেলেন তিনি। সাইরাসের অধীনে মেডিস ও ফারসী যৌথ বাহিনী এশিয়া মাইনর হয়ে লং মার্চ করে এগিয়ে যায় এবং পশ্চিম উপকূলে দখল করে লিডিয়া। ওই রাজ্যের রাজা ছিলেন ধনবান ক্রোইসাস। লুঠ করে প্রচুর মালামাল পাওয়া যায়। ওগুলো ব্যবহার করা হয় পারস্যের রাজধানী পাসারগাদের উন্নয়নের জন্যে এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে।

৫৩৯ খ্রী. পূর্বে সাইরাস বেবিলন দখল করেন। নগর দখল করার পরে প্যালেস্টাইনিদেরকে নির্বাসনে যাবার আদেশ দিয়েছেন।

সিরিয়ার সাথে রাজ্যের বিস্তৃতি এবং এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগরগুলো নিজেদের দখলে থাকার কারণে পারস্য পরিণত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যে। এ সাম্রাজ্য দুশো বছর টিকে ছিল এবং তার প্রজাদের অনেক উপকার করেছে। পারস্যের দুর্ভাগ্য, ৫৩০ খ্রী. পূর্বে সাইরাস খুন হন আফগানিস্তানের কাছে, একটি বর্বর জাতির হাতে।

সাইরাসের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণে করেন তার ছেলে ক্যামবিসেস। অদ্ভুত, খিটখিটে মেজাজের এই তরুণ সেনাপতি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তবে তিনি এমন সব অন্যায় অবিচার করে যাচ্ছিলেন যে তাকে নিয়ে প্রজারা মোটেই সুখী ছিল না। তবু পারস্যবাসীর তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল তিনি সাইরাসের ছেলে বলে। ক্যামবিসেসও বাবার মত রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

৫২৫ খ্রী. পূর্বে ক্যামবিসেস মিশরে সেনা অভিযান চালিয়ে দখল করে নেন দেশটি এবং ফারাও হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেন। বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে তিনি ইথিওপিয়াও আক্রমণ করেন। তবে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি এবং ইরানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তড়িঘড়ি দেশে ফিরতে বাধ্য হন। তিন বছর পরে, অজ্ঞাত কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। পারস্যবাসীর জন্যে এটাও দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল যে ক্যামবিসেস কোন সরাসরি উত্তরাধিকার রেখে যাননি। ফলে গৃহযুদ্ধ লেগে যায়। নতুন সাম্রাজ্য মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়ে।

ক্যামবিসেস-এর এক শ্যালক, যুবরাজ দারিউস বিদ্রোহ দমন করে ৫২১ খ্রী. পূর্বে সিংহাসনে বসেন। দারিউস সাইরাসের মতই শক্তিশালি ও মহান রাজা ছিলেন এবং সকল শক্তি ব্যয় করেছেন পারস্যের সীমানা বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যের নগরগুলোর সৌন্দর্য বাড়াতে। খ্রী. পূ. ৪৮৬ তে, তার মৃত্যুর সময় পারস্য সাম্রাজ্য উত্তর গ্রীস থেকে ইউরোপের আধুনিক তুরস্ক এবং ভারতের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিশাল এ রাজ্য নিয়ন্ত্রণে দারিউস বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যের সরকারকে হতে হবে অত্যন্ত দক্ষ। তাছাড়া তার নিজের কর্তৃত্ব ভয় এবং শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছিল। নিজেকে তিনি প্রায় দেবতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দারিউসের দাড়ি ছিল লম্বা ও চৌকোণা। তিনি অত্যন্ত দামী পোশাক পরতেন। তার আলখেল্লার রঙ ছিল বেগুনী এবং পা মোড়ানো থাকত সিল্কের ট্রাউজারে। তিনি এরকম একটি ব্যবস্থা করেন যখন তিনি জন সম্মুখে উপস্থিত হবেন কিংবা নিজের দরবারে, তার পা সবসময় মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে থাকবে। কারণ দেবতাদের পা কখনো মাটি ছোঁয় না। ভৃত্যের দল পাখা হাতে তার পেছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করত মাছি আর পোকা তাড়াতে।

একটি পাহাড়ে পাওয়া শিলালিপিতে দারিউসকে বর্ণনা করা হয়েছে 'রাজার রাজা, সকল জাতির রাজা এবং পৃথিবীর জন্যে দীর্ঘদিনের রাজা' হিসেবে।

দারিউস ও তার পূর্বপুরুষরা দরবারের পারিষদ নির্বাচন করতেন ফারসী অভিজাতদের মাঝ থেকে। তারা শাসকদেরকে শান্তি এবং যুদ্ধের সময় নানা পরামর্শ দিতেন। সাম্রাজ্যের কুড়িটি করদ রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন ফারসী সাতরপ বা গর্ভনরগণ। এরা ছিলেন স্থানীয়। আইন শৃঙ্খলা, কর আদায় ইত্যাদির দায়িত্বে থাকতেন সাতরাপরা। প্রচুর পরিমাণে কর উত্তোলন করা হতো যার পুরোটাই পাঠিয়ে দেয়া হতো পারস্যে। শুধু টাকা নয়, ঘোড়া, জাহাজ কিংবা সেনাবাহিনীর বিনিময়েও কর দেয়া যেত। করের বিনিময়ে পারস্য সরকার বিদ্রোহ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন।

রাজা ও তার কর্মকর্তারা সাতরপদেরকে ও স্থানীয় কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণ করতেন সেক্রেটারি, মিলিটারি লিয়াজোঁ অফিসার এবং ভ্রাম্যমান পরিদর্শকদের সাহায্যে। এরা ছিল রাজার 'চোখ ও কান'। এদের কাজ সহজ হয়ে ওঠে চমৎকার রাস্তাঘাটের জন্যে। ফারসীরা আসিরিয়ানদের মত রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্যে ব্যাপক পরিশ্রম করেছে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থল থেকে এ রাস্তা গিয়ে মিলত প্রতিটি করদ রাজ্যের মূলে। সবেচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি ছিল 'কিংস হাইওয়ে'। ১৬০০ মাইল লম্বা এ রাস্তা সুসা থেকে এশিয়া মাইনরের ইফেসাস অব্দি পৌছেছে। অশ্বরোহীরা এক হপ্তায় এ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলেও বাণিজ্য ক্যারাভান ও যাত্রীবাহী গাড়িগুলোর সময় লাগত কমপক্ষে তিন মাস।

দারিউসের সময় পার্সিয়ানরা বিভিন্ন দিক থেকেই এগিয়ে ছিল। আসিরিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের উন্নতি করেছে। তারা করদ রাজ্যগুলোর ওপরে খুব কম অত্যাচার করত। তারা তাদের দেশে শান্তি স্থাপন করেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্যে সবসময়ই সচেষ্ট ছিল।

ফারসীরা বিভিন্ন ঐতিহ্যকে একই বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করেছে। কলা ও সংস্কৃতির মধ্যে ছিল এ বন্ধন। নিজেদের সাহিত্য রচনা খুব কম থাকলেও বিদেশী সংস্কৃতি প্রবেশে বাধা দেয়নি। বরং উৎসাহ দিয়েছে। বেবিলন, মিশর ও ফিনিশিয়রা বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল পার্সিয়ানদের প্রত্যক্ষ মদদে। পার্সিয়ান চিত্রকলায় মিশরীয় মডেলের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পার্সিয়ানরা অনেক সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা তৈরি করেছে। যেমন পার্সেপলিসে দারিউস ৫০০০ ফুট উচুঁ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সময় পার্সিয়ানরা নিকট প্রাচ্যে কর্তৃত্ব করত। তবে ভূ-মধ্যসাগরে, গ্রীসে বেড়ে ওঠা সভ্যতা সবসময়ই তাদের জন্যে একটা আশঙ্কা ছিল। লিডিয়ায় ক্রোইসাসকে পরাজিত করার সময় দারিউস এশিয়া মাইনরে প্রচুর গ্রীক ঘাঁটি দখল করেন। তার উত্তরসুরিরা ইউরোপের আরো ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। দারিউস মেসিডোনিয়া দখল করেন। ৫১২ খ্রী. পূর্বে তিনি বর্তমান বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং দানিউব নদী পার হয়ে রাশিয়ার পতিত জমি (ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড) থেকে আসা স্কিথিয়ান উপজাতিদেরকে ধাওয়া করেন।

ঈজিয়ান সাগরের পূব উপকূলের গ্রীক উপজাতিরা কখনো একা, কখনো সম্মিলিতভাবে পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলছিল। তারা এ কাজে গ্রীকদের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছিল। খ্রী. পূ. ৪৯০তে দারিউস এথেনিয়ান গ্রী কদের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ম্যারাথনের যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। খ্রী. পূ. ৪৮৬ তে মারা যান দারিউস, পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার ভার দিয়ে যান ছেলে জেরেক্সেসকে।

কিন্তু জেরেক্সেস সালামিস ও প্লাতিয়াতে গ্রীকদের সাথে লড়াইতে পেরে ওঠেন নি। শীঘ্রি পার্সিয়ানরা ইউরোপে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশার প্রদীপ নিভিয়ে ফেলে এবং এশিয়ায় অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে মন দেয়। তারা আরো দেড়শ বছর নিকট প্রাচ্য শাসন করেছিল, তবে মেসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তাদেরকে পরাজিত করেন।

প্রাচীন পারস্য আর কোন দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি, তবে তার উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিল পৃথিবীতে। কয়েক শতক ধরে রোমের অন্যতম ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল যে পার্থিয়া, এ জাতির উদ্ভব পার্সিয়ানদের থেকে।

# ভারতের আর্য জাতি

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অতি প্রাচীন এক সভ্যতার কথা যার উৎপত্তি সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগরীকে ঘিরে। এ সভ্যতা অগ্রগতি লাভ করলেও এক সময়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে। ফলে খ্রী. পূ. ১৫০০ অব্দে আর্য হামলাকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। এ আর্যরা ছিল প্রায় সভ্য এক উপজাতি যারা আর্য ভাষায় কথা বলত। ইন্দো ইউরোপীয়ান ভাষাটি সংস্কৃতে রূপান্তর হয়ে আর্যদের ভাষায় পরিণত হয়। সিন্ধু সভ্যতা আর্যদের শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করে এবং পরবর্তী নয়শো বছরে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি।

ভারতের উত্তরাঞ্চলের জীবন গড়ে উঠেছিল মূলতঃ কৃষির ওপরে নির্ভর করে। ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করত লোকে, কোন নগরায়নের বালাই ছিল না- হরপ্পার মত কোন শহর তো ছিলই না। উষ্ণ, গরম আবহাওয়ায় লোকের শক্তি ক্ষয় হতো বেশি, আর আর্যরা, যাদের আগমন ঠাণ্ডার দেশ থেকে, তারাও আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিয়েছিল নিজেদেরকে। আর্যদের জীবন সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে সিন্ধুসভ্যতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। সিন্ধু উপত্যকার লোকদের লেখার কৌশল, সংস্কৃতি কিংবা সরকার ব্যবস্থার কোনটার প্রভাবই আর্যদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই রহস্যময় চারশো বছর সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা প্রাচীন আর্য গোত্র এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ, লোকাচার বিদ্যা ইত্যাদি থেকে। এ বিষয়গুলো চারটে বইতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একত্রে 'বেদ' (জ্ঞান) নামে পরিচিত। ঋগ্-বেদ এর মধ্যে আবার ব্যাপক আলোচিত। ঋগবেদে বর্ণিত রয়েছে আর্য রাজাদের ধর্মকর্মের কথা। আর ধর্ম মানেই দেব-দেবী। আর্য দেবতাদের মধ্যে আছেন আকাশ দেব বরুণ, বজ্র ও যুদ্ধের দেবতা ইন্দ্র প্রমুখ। বেদের সৃষ্টি শতশত বছর ধরে মানুষের বলা গল্প থেকে। আর গোটা সংগ্রহ থেকে আর্য ভারতের জীবন সম্পর্কে (৭০০–৬০০ খ্রীঃ পূঃ) পরিষ্কার একটি ধারণা পাওয়া যায়।

গোটা সম্প্রদায় চারটি প্রধান শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত ছিল। আর জাতিগত পার্থক্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। এর ওপরেই দু'হাজার বছর পরে গড়ে ওঠে ভারতীয় সমাজ।

সর্বোচ্চ বর্ণ বা জাত ছিলেন ব্রাহ্মণ, এরা ছিলেন শিক্ষিত পুরোহিত ও পণ্ডিত। তাদের কাজ ছিল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবন নির্দেশ, গোত্র এবং পূজা পাঠের ব্যবস্থা করা এবং দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান। তারা স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে লোকও পাঠাতেন।

পরবর্তী জাত ছিলেন ক্ষত্রিয়। এরা রাজা ও যোদ্ধা। তারা রাজা কিংবা স্থানীয় সর্দারদের জন্যে সৈন্য সরবরাহ করতেন। ব্রাহ্মণদের পরে তাদের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।

তৃতীয় শ্রেণীটির নাম বৈশ্য, যারা ছিলেন মূলতঃ ব্যবসায়ী, কৃষক রাখাল ইত্যাদি। সবার জন্যে খাদ্য জোগাতেন বলে সমাজে তাদের গুরুত্বও ছিল প্রচুর, তবে তাদের জীবনযাত্রার মান খুব একটা উন্নত ছিল না।

সবচেয়ে নিচু জাতের মানুষ ছিলেন শূদ্ররা। এরা শ্রমিক শ্রেণীর, মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রীতদাসের মত অবস্থান ছিল এদের। অন্যান্য সভ্যতায় এ শ্রেণীর মানুষকে ক্রীতদাসের ভূমিকাতেই দেখা গেছে যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এ জীবন মেনে নিতে বাধ্য হতো।

প্রধান এ চার শ্রেণীর পরে ছিল পারিয়া। এদের কোন জাত পাত ছিল না। এরা ছিল অস্পৃশ্য। এ শ্রেণী বৈষম্য এখনো প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠীতে বর্তমান। ভারতে কয়েক হাজার জাত রয়েছে। প্রতিটি জাতের আছে নিজস্ব আইন।



*আর্য্য সমাজের চারটি শ্রেণীঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র*

খ্রী. পূ. ৬০০ অব্দে আর্য ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু ধর্মে পরিচিতি লাভ করে এবং বিশ্বাসের বিভিন্নতা দূর হয়ে নানা জাতির সকল লোক এ ধর্ম গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণরা চিন্তা করতেন পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আবির্ভাব কিভাবে ঘটল তা নিয়ে। তাদের চিন্তা ভাবনা ধর্মের উন্নয়ন ঘটায় এবং আইনের মেরুদণ্ড গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল ব্রহ্মাকে নিয়ে। ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা।

ব্রাহ্মনরা তাদের শিক্ষা ও চিন্তাভাবনার কথা বেদ এবং উপনিষদ- এ লিখে রেখে গেছেন। সত্যের সন্ধান, আইন ও ধর্ম নিয়ে মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। বেদ ও উপনিষদ মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব রেখেছে।

ব্রাহ্মণরা শিখিয়েছেন মানুষ মারা যাবার পরে আবার পৃথিবীতে তার আবির্ভাব ঘটে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের চেহারায়। একে বলে জন্মান্তরবাদ। ভারতীয়দের প্রার্থনা থাকত ভাল কিছুর রূপে আবার জন্ম নেয়া।

খ্রী. পূ. ৫০০ শতকে যখন পারস্যের দারিউস ইউরোপ ও রোমে প্রবেশ করেছেন এদের রাজাদেরকে সিংহাসনচ্যুত করে, ওই সময় ভারতে বিরাজ করছিল একটি উন্নত সভ্যতা। ভারতে লোহার ব্যবহার করা হতো সাধারণতঃ অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, কৃষি কাজের জন্যে আনুষঙ্গিক উপাদান তৈরি এবং বাড়িঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরিতে। ধাতব মুদ্রার চল ছিল। বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল নিকট প্রাচ্য এবং চীনের সাথে। লেভানটাইন বর্ণমালার ওপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের লেখার কাঠামো তৈরি হয়।

এ সময় ভারতীয়রা আবার দালান-কোঠা নির্মাণ শুরু করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়, এতে আন্তঃনগর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিশাপ ডেকে আনে।

ভারতের নতুন সমাজ উপ-মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং শীঘ্রি উত্তরের চেয়ে পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ এ সভ্যতার উপযোগিতা উপভোগ করতে থাকে।

আর্য সভ্যতায় আবির্ভাব ঘটে গৌতম বুদ্ধের। তার আসল নাম গৌতম সিদ্ধার্থ। তার ভক্তরা তাকে 'বুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক।

বুদ্ধের জন্ম নেপালে, এক রাজার ঘরে। ক্ষত্রিয় জাত হলেও তিনি শান্ত জীবন যাপন করতেন এবং বাইরের জগতের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে তার মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে। উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন জীবনের মানে খুঁজে বের করার জন্যে।

বাকি জীবনটা বুদ্ধ উৎসর্গ করেছেন চিন্তা করে আর ধর্মোপদেশ দিয়ে। তার মূল কথা ছিল : দুই ভাবে জীবন চালানো যায় : অন্তরের বাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে জাগতিক সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া অথবা সকল অনুভূতি ঝেড়ে ফেলে, কোন রকম উপভোগের ধার না ধেরে জীবন অতিবাহিত করা। দুটোর কোনটাই ঠিক নয়। তাই তৃতীয় একটি পথ রয়েছে। আত্মসংযমের মাধ্যমে বাসনা পূরণ করো, সকলের প্রতি সদয় হও, কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না, দুর্ভাগা লোকজনকে সাহায্য করো।

বুদ্ধ'র এ শিক্ষা যথার্থই বাস্তবানুগ ছিল বলে তার ধর্মমতে দ্রুত বিশ্বাসী হয়ে ওঠে অনেকেই। যীশুর ভক্তদের মত বুদ্ধের ভক্তরাও সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটায়। তবে হিন্দুধর্ম তার জাত প্রথার ভিত্তিতে ভারতে অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে ছিল বলে বৌদ্ধধর্ম এ দেশে তেমনভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। যদিও ধর্মটি পুবের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ভারত এদিকে নিকট প্রাচ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রথমে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য, পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পারস্যের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ভারতের জন্যে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দেয়, তবে এই সময়টা পার হয়ে যাবার পরে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, যিনি স্বপ্ন দেখতেন গঙ্গা নদী পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, তিনি আশ্চর্যজনকভাবে তার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলেন। খ্রী. পূ. ৩২৬ এ আলেকজান্ডার ভারতের সীমান্তে পৌঁছানোর সময় ভারতীয় সভ্যতায় দোদুল্যমান একটা অবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থার অবসান ঘটে আরো একশ বছর পরে, মৌর্য সম্রাট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দক্ষিণে চু আর পশ্চিমে পার্বত্য এলাকার চিরাই ছিল মূল বিবাদকারী। চি'রাই শেষতক গোটা দেশে কিছু দিনের জন্যে কর্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ পেয়ে যায়। চি নামটি তারা পেয়েছিল চীন থেকে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কার মারামারি ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভেতরেও। জমি দখল করে রাখতেন শক্তিশালী জমিদাররা। তারা ক্ষুদ্র চাষীদেরকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা ছিলেন অত্যন্ত লোভী এবং কৃষকদের সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করতেন। অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে চাষীরা একত্রিত হয়ে দুষ্ট প্রভুদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। সরকারি কর্মকর্তারা কর ধার্য করে দুর্বিষহ করে তুলছিল গরীবদের জীবন, সেই সাথে নানা আইনী বাধ্যবাধকতা তো ছিলই। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা বড় ধরনের কাজ পেত এবং কাজ হারালে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো। এক কর্মকর্তার বিবরণীতে পাওয়া যায়, 'আপনি ভাল কাজ করলে প্রমোশন পাবেন; কাজ সন্তোষজনক না হলে আপনাকে জ্যান্ত সেদ্ধ করা হবে।'

সময়টা সবার জন্যেই ছিল অত্যন্ত কঠিন। আর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, চেংচোর সরকারের জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আঞ্চলিক জমিদারদের ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন ছিল বেশি, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এসব সত্ত্বেও চীনা সভ্যতা ওই সময়ে বেশ ভালই অগ্রসর হয়। মাঠে প্রচুর শস্য ফলত। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে মূলতঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হতো। ব্যবসা বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে ওঠে, দেশের সর্বত্র খোলা হয় বাজার এবং রপ্তানী বাণিজ্যও শুরু হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য সভ্যতার সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে চুদের। যেমন পারস্য চীন থেকে সিল্ক আমদানী করত। আর সিল্ক তৈরির রহস্য বহুদিন গোপন রেখেছিল চীনারা।

মোষ পুষে লাঙল টানার ট্রেনিং দেয়া হয়। ফলে কৃষকদের সময় ও শ্রম বেঁচে যায় অনেকটাই। টাকশালে মুদ্রা তৈরি হতো, লোহার ব্যবহার শুরু হলে তা বিশাল শিল্পে পরিণত হয়।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও চীনারা সারা বিশ্বের জন্যে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করে। শ্যাং আমলের উন্নত ব্রোঞ্জের কাজ চু আমলে আরো শাণিত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। লেখা হয় ইতিহাস এবং পুরাতন চীনা লোক গাঁথা ও কিংবদন্তীর কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই আশ্চর্য অগ্রগতি সম্ভব হতো না যদি না নতুন এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব ঘটত। এরা ছিলেন পণ্ডিত শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে ছিলেন আবিষ্কারক, শিক্ষক

# চুদের অধীনে চীন

ইউরোপ থেকে অনেক দূরে চীন, এমনকি নিকটপ্রাচ্য থেকেও। হিমালয়ের প্রকাণ্ড পর্বতসারি চীনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ভারত থেকে। আর এ হিমালয়েই রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট। সমুদ্র পথে চীনে পৌঁছাবার একমাত্র রাস্তা জাহাজে চড়ে মালয়ের বিপজ্জনক উপকূল ঘুরে যাওয়া। আর দেশটির উত্তর ও পশ্চিমে রয়েছে সুবিশাল মরুভূমি।



*কনফুসিয়াস তার ছাত্রদের সাথে দার্শনিক বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করছেন।*

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে-অন্যান্য সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন চীনের সুযোগ ছিল বাইরের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখা। ১০২৭ খ্রী. পূর্বে চুরা শ্যাং ডাইন্যাষ্টির পতন ঘটায় এবং ক্রমে শ্যাং সংস্কৃতি কলা, সরকার ও শিল্পের সেরা জিনিসগুলো আত্মভূত করে।

চীন খ্রী. পূ. প্রথম সহস্রাব্দে একটি একত্রিত সভ্যতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে গোটা নিকট প্রাচ্যে। তবে এ ক্ষমতা অর্জন মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

চুদের আগমন দক্ষিণ পশ্চিম থেকে। খ্রী. পূ. দশম শতকের মধ্যে তারা বিশাল একটি সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ শুরু করে, তবে বেশিদিন এটা ধরে রাখতে পারেনি। পশ্চিমের যুদ্ধবাজ বর্বর উপজাতিদের উপর্যুপরি আক্রমণে তারা সরে যায় পূবে এবং চেংচুর ১৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে গড়ে তোলে নতুন রাজধানী শহর লোয়াং। এ শহরেই কয়েকশ বছর ধরে কেন্দ্রীভূত ছিল চু সভ্যতা।

এই শতকগুলোতে চুরা বরাবরই সীমান্ত এলাকায় বর্বর উপজাতিদের হামলার শিকার হয়েছে। শীঘ্রি বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেয়।

খ্রী. পূ. তৃতীয় শতকে চীনে অবিরাম সংঘর্ষের পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, বিখ্যাত দার্শনিকদের চিন্তা চেতনাকে কেউ অনুসরণ করছিল না। আর প্রতিটি রাজ্য হয়ে উঠছিল স্বাধীন। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন করেন একজন শাসক।

খ্রী. পূ. ২০০ তে ক্ষমতায় আসেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তেজোদীপ্ত সম্রাট চিনশি হুয়াং তি। দশবছরের মধ্যে তিনি চীনের সমস্ত অঞ্চলকে একত্রিত করে ফেলেন। বর্বরদের হামলার কারণে শান্তি বারবারই বিঘ্নিত হচ্ছিল বলে তিনি এই দস্যুদেরকে ঠেকাতে চীনে বিখ্যাত গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর (২১৮-২০০৪ খ্রী. পূ.) গড়ে তোলেন। চোদ্দশ মাইল লম্বা এই বিশাল প্রাচীরের স্থানে স্থানে মিনার বা চূড়া তৈরি করা হয়। এগুলো সীমান্ত এলাকা পাহারা দেয়ার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

সম্রাট প্রচুর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খনন করেন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন। হুয়াংতিও নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অঞ্চলগুলোকে একত্রিত হবার পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করার জন্যে তিনি অঞ্চলভিত্তিক সমস্ত রেকর্ড, লিখিত আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদি সব কিছু ২১২ খ্রী. পূর্বে ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনা ইতিহাসে লেখা রয়েছে 'বই পোড়ানোর মহোৎসব' হিসেবে। সম্রাটের অনুচররা কনফুসিয়াস ও মেনসিয়াসের সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলে। এটা চীনাদের জন্যে একটা ট্র্যাজেডিই বলতে হবে। এরকম বন্য আচরণের কারণে তারা হুয়াংতিকে ঘৃণা করতে থাকে। সম্রাট চারশোরও বেশি পণ্ডিতকে হত্যা করেন এবং অনেক কৃষককে বাধ্য করেন চীনের মহা প্রাচীর নির্মাণের কাজে।

এত কিছুর পরেও হুয়াংতি চীনকে একটি ভাল, কেন্দ্রীয় সরকার উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতেন প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে। তাই লোকে তাকে ভয় পেত। চীনের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বক্ষমতাময়।

হুয়াং-তি'র উত্তরাধিকাররা সাম্রাজ্যের পারিষদ বর্গের হাতের পুতুল বৈ কিছু ছিলেন না। চি' সম্রাটের মৃত্যুর মাত্র চার বছরের মাথায় হ্যান ডাইন্যাষ্টি ক্ষমতায় চলে আসে। হুয়াং-তি'র সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারসহ একটি সংঘবদ্ধ জাতি উপহার দেয়া যারা হ্যান সম্রাটদের অধীনেও টিকে থেকেছে।

রোড-কীপার প্রমুখ। তারা খুব প্রভাবশালী ছিলেন এবং দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে গুরুত্ব পেতেন। কাজেই এটা আশ্চর্যের নয় যে সরকারের মাথা হিসেবে চীনা পণ্ডিতদের সিভিল সার্ভিসে দেখা যেত।

পণ্ডিতদের কেউ কেউ চীনের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দেশের নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতেন তারা। খোলা আলোচনা সভা বসত সব জায়গায়। ওই সময় তরবারির আঘাতে কল্লা কেটে নেয়া ছিল চূড়ান্ত শাস্তি কিংবা সংঘাত হয়ে উঠত একমাত্র সমাধান। এরকম পরিস্থিতিতে পণ্ডিতরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং চীনা সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনের পরামর্শও দিতে পারতেন।

এই পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কুংফু-জে, ইনি খ্রী. পৃ. ৫৫০ থেকে ৪৮০ সাল অব্দি বেঁচে ছিলেন। যদিও তাকে সবাই চেনে কনফুসিয়াস নামে। এ মানুষটিকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী রয়েছে। গোড়ার দিকে চীনা লেখকরা কনফুসিয়াসের শারীরিক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা, হাতির মত বড় বড় কান, লাউয়ের মত নাক এবং হরিণের মত দাঁত। মোট কথা চেহারার দিক থেকে তিনি ছিলেন চীনের কুৎসিততম মানুষ। যদিও শৈশব থেকেই ভয়ানক চতুর স্বভাবের ছিলেন কনফুসিয়াস। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেয়া যায় জীবনের প্রতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকলেই। ষাট বছর বয়সে তার প্রচুর ভক্ত জুটে যায় যারা কনফুসিয়াসের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেয় সারা দেশে।

কনফুসিয়াস নিজের ভাবনাগুলোর কিছু কিছু কাগজে, কবিতার আকারে লিখে রেখে গেছেন। তার বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানের বাণীগুলো 'দ্য অ্যানালেক্টস অভ্ কনফুসিয়াস' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সম্ভবতঃ চীনা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ বইতে কনফুসিয়াসকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। তার রসবোধও যে প্রখর ছিল তা বইটি পড়ে বোঝা যায়। কনফুসিয়াসের এক ছাত্র তার গুরু সম্পর্কে লিখেছেন : তিনি বিনা বিচারে কোন কিছু স্বীকার করতেন না; তিনি দুর্বিনীত ছিলেন না কিংবা কোন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবারও দাবি করতেন না এবং কখনোই কোন ব্যাপারে একগুয়ে মনোভাব পোষণ করতেন না। তার বক্তব্য ছিল সরল : রাষ্ট্র কিংবা পরিবারের বন্ধনের মাঝ থেকেই একটি ভাল, সুশৃংখল জীবন যাপন করো।

কনফুসিয়াসের চিন্তা চেতনা ও রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে গেছেন তার উত্তরসুরি পণ্ডিতরা। মেনসিয়াস (৩৭০–২৮৫ খ্রী. পৃ.) বিশ্বাস করতেন মানুষের কল্যাণই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

# গ্রীস প্রথম ইউরোপীয়ান সভ্যতা

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মাইনোয়ান এবং মাইসিয়ানরা মধ্য ইউরোপ থেকে আসা প্রায় বর্বর লোকজনদের হামলার শিকার হয়েছিল। এদেরকে গ্রীক কবি হোমার আখ্যায়িত করেছেন একিয়ান বলে। এরা অপূর্ব নগরী মাইসিন লুঠ করে, জবাই করে হত্যা করেছে মানুষ কিংবা খামারে ক্রীতদাস হিসেবে কাজে লাগিয়েছে, ধরে নিয়ে গেছে তাদের স্ত্রীদেরকে। মাইসিনে আস্তানা গেড়ে বসার পরে তারা তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে একের পর এক হামলা শুরু করে দেয়। বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলের নগরগুলো ছিল তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। তারা যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল বলে মনে করত লড়াই দিয়ে পুরুষালি যোগ্যতা প্রমাণ করা যায়।



*প্রাচীন গ্রীসের তিন দেবতা; হারমিস, দেবতাদের দূত, আফ্রোদিতি, প্রেমের দেবী, পসাইডন, সাগর দেবতা*

খ্রী. পূ. ১২০০ শতকে একিয়ানরা এশিয়ার যে সব শহরে আক্রমণ চালায় তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইলিয়াম (বা ট্রয়), এ শহর তারা দখল করে। এই ট্রয়ের গল্প হোমার এবং ভার্জিলের কবিতায় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী হিসেবে স্বীকৃত। হোমারের বর্ণনার কিছু অংশ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠলেও বেশিরভাগ ছিল কল্পনাশ্রিত। সত্য ঘটনার মধ্যে ছিল এটা যে একিয়ানরা ট্রয়ে হামলা চালিয়ে বহু বছর শহরটি দখল করে রাখে। ট্রয়ের চারদিকে সুরক্ষা দেয়াল ছিল। অবশেষে দেয়াল ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ধনসম্পদ লুঠ করে।

একিয়ানরা বহু বছর পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাদের আগ্রাসন চালিয়ে গেছে। তারপর তাদের নিজেদের অঞ্চল হামলার শিকার হয় প্রায় ১০০০ খ্রী. পূর্বে। হামলা করে উত্তরের লোকেরা। এদের মধ্যে প্রধান ছিল ডোরিয়ানরা। শক্তিশালী এ যোদ্ধার জাত একিয়ানদেরকে গ্রীক মূল ভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। অনেক একিয়ান আশ্রয় নিয়েছিল অ্যাটিকাতে।

ডোরিয়ানরা স্পার্টা, করিন্থ, মেগারা এবং আরগোসে শহর নির্মাণ করে এবং গঠন করে নতুন সরকার। ওখানে যেসব একিয়ান ছিল তাদেরকে তারা ক্রীতদাসে রূপান্তর ঘটায়, তবে কিছু এলাকায় ডোরিয়ানরা বিজিতদের সাথে খোলামেলাভাবে চলাফেরা করেছে, পরে তাদের সঙ্গে মিশেও গেছে। ডোরিয়ানরা সিসিলি ও উত্তর ইতালিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে ইতালিতে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে রোমানরা সংগ্রাম শুরু করে এবং গ্রীক উপনিবেশগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ('গ্রীক' নামটি একিয়ানদের দিয়েছিল মূলতঃ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে বসবাসরত ইতালিয়ানরা)।

একিয়ান কৃষকদের জমিজমা তেমন ছিল না এবং বেশিরভাগই ছোট খামার নিয়ে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করত। কাঠের লাঙল দিয়ে চাষ করতে গিয়ে ধারাল পাথরের আঘাতে লাঙল ভেঙে যেত কিংবা সামান্য ব্যবহারের পরে নষ্ট হয়ে যেত লাঙল। তারা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করত না এবং লোহার ব্যবহারও জানত না।

তবে ডোরিয়ান হামলাকারীরা লোহার ব্যবহার শিখে এসেছিল। নিয়ে এসেছিল লোহার নানা যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে একটি ছিল লোহার লাঙল। এ দিয়ে তারা ব্যাপকভাবে চাষাবাদ শুরু করে দেয়।

চাষাবাদে অগ্রগতি সাধিত হলে গ্রীকদের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রীকরা নগরে বসবাস শুরু করে, কেউ কেউ ছিল নবাগত, অন্যেরা গ্রাম থেকে আগত। তাদের চাষাবাদে এমনই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে থাকে যে তারা এ কাজে ক্রীতদাসদেরকেও ব্যবহার শুরু করে দেয়। নগরীর উন্নয়ন কাজও চলতে থাকে। এক পর্যায়ে নগরী হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এই নগরগুলোর রূপান্তর ঘটে নগর-রাজ্যে, প্রতিটির ছিল নিজস্ব সরকার।

এ দেশে গ্রীকদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে উপজাতি হিসেবে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত রাজা কিংবা সর্দাররা। তবে কয়েক বছরের মধ্যে রাজাদের পাঠ চুকে যায়, সরকার নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা। এরা নগরীর

সবচেয়ে যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিল। গরীব শ্রেণীর লোকজন নগরীর বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলেও সিদ্ধান্ত নিত ধনী কৃষকরা। এ ধরনের সরকারকে বলা হতো 'অ্যারিষ্টোক্রেসি।' দুটি শব্দ থেকে এর উৎপত্তি–aristos = সেরা ও Kratos = আইন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রীক ইতিহাসে অ্যারিষ্টোক্রেটরা সবসময় সরকার চালানোর জন্যে উপযুক্ত ছিলেন না।

খ্রী. পূ. ৮০০ শতক নাগাদ সমস্ত গ্রীক নগরী এভাবে পরিচালিত হতে থাকে এবং এ ব্যবস্থা বিরাজ করছিল দীর্ঘদিন। অ্যারিষ্টোক্রেটদের পরে যারা গুরুত্ব পেত তারা হলো ব্যবসায়ী ও সওদাগর, শিল্পী এবং কারিগর। এরা কিছু সুযোগ সুবিধে ভোগ করত। এদের নিচের স্তর ছিল কৃষক ও ক্রীতদাস। এদের কোন কিছুতে কোন অধিকার থাকত না।

নগর-রাষ্ট্র বৃদ্ধির সাথে গ্রীকরা অন্যান্য সভ্য লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দেয়, বিশেষ করে পার্সিয়ান ও ফিনিশিয়া। তবে মাঝে মাঝেই এ যোগাযোগ মোড় নিত যুদ্ধে, কারণ–পার্সিয়ানরা মনে করত দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের মেইনল্যাণ্ড গ্রীকরা নিয়ন্ত্রণ করার মানে এশিয়া মাইনরে তাদের (পার্সিয়ান) করদ-রাজ্যগুলোর জন্যে হুমকি স্বরূপ। আর ফিনিশিয়রা ভূমধ্যসাগরে ও কৃষ্ণসাগরে গ্রীক নৌশক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি মোটেই পছন্দ করতে পারছিল না। কারণ এখানে ফিনিশিয়রা কর্তৃত্ব করতে চাইছিল।

দেয়াল ঘেরা নগরীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে গ্রীকদের যখন হাঁসফাস অবস্থা তখন দলে দলে লোক পাঠিয়ে দেয়া হয় ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য অঞ্চলে, উপনিবেশ গড়ে তুলতে অনেকেই অ্যারিষ্টোক্রেটদের অধীনে এসব নগরীতে বাস করে শান্তি পাচ্ছিল না। তারা নতুন জায়গায় নতুন জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিল। মেগারার অধিবাসীরা বাইজেনটিয়াম শহরের পত্তন করে যা হাজার বছর পরে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে উঠেছিল। কোরিন্থ থেকে কোরিন্থিয়ানরা সিসিলিতে সাইরাকিউস নির্মাণ করে, এবং শীঘ্রি অন্যান্যরা ইতালিতেও এমনভাবে আসতে শুরু করে যে এ দেশ ভরে যায় গ্রীক উপনিবেশে।

গ্রীকরা প্রতিটি উপনিবেশ গড়ে তোলে আগেকার উপনিবেশের আদলে। প্রতিটি উপনিবেশে একই ধরনের সরকার ছিল, একই দেবতার পুজো করা হতো এবং একই কাঠামো বজায় রেখে এগুলো তৈরি হয়েছিল। শুরুতে প্রধান নগরী উপনিবেশগুলোতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করত। পরে উপনিবেশবাদীরা নিজেদের শিল্প কারখানা এবং বাজার গড়ে তোলে। এর মধ্যে কিছু কিছু বাণিজ্যকেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল।

গ্রীকদের তৃতীয় প্রজাতি ছিল আইওনিয়ান। প্রাচীন মাইসেনিয়ান প্রজাতি থেকে উদ্ভুত এই লোকেরা এশিয়া মাইনরে এসে ইন্দো ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে মিশে

যায়। আইওনিয়ানরা পশ্চিম উপকূলে নগর রাষ্ট্র গড়ে তোলে ঈজিয়ান দ্বীপের পাশাপাশি এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। তাদের সভ্যতা ছিল বেশ উঁচু মানের এবং পরবর্তীতে গ্রীসে তারা অঙ্কবিদ, দার্শনিক, প্রকৌশলীদের পাঠিয়ে দেয়। আইওনিয়ানরা উপনিবেশ স্থাপনও করেছে। এর মধ্যে একটি ছিল কৃষ্ণসাগরের তীরে, দার্দানলেসে, মিলেটাসে।

অষ্টম শতক (খ্রী. পূ.) নাগাদ গ্রীকরা ফিনিশিয়ান পাণ্ডুলিপি দেখে একটি বর্ণ-মালা তৈরি করে ফেলে এবং শীঘ্রি ব্যাকরণও চালু করে দেয়।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম নিয়ে বেশ একাত্মতা ছিল। প্রত্যেকের নিজস্ব, স্থানীয় দেবতা থাকলেও কয়েকজন দেবতাকে সবাই-ই বিশ্বাস করত। যেমন সকল গ্রীকের বিশ্বাস ছিল দেবতা পরিবার মাউন্ট অলিম্পাসে বাস করেন। দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। তিনি রাষ্ট্র ও বিদ্যুতের দেবতা। তার স্ত্রী হেরা বাড়ির দেবতা। জিউসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্তানরা ছিলেন জ্ঞানের দেবী এথেনি, শিকারের দেবী আর্তেমিস, যৌবন ও সঙ্গীতের দেবতা অ্যাপোলো, দেবতাদের দূত হার্মিস ও প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি। জিউসের দুই ভাই ছিলেন, সমুদ্রের রাজা পসাইডন ও পাতাল দেবতা হেডস। এই দেবতাদেরকে নিয়ে গ্রীক গল্প কবিতা ও উপন্যাসে যে কত কাহিনী আছে! সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এসব কিংবদন্তী।

নগর-রাষ্ট্রের সৃষ্টি কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে নি। তাদের বেশিরভাগই ছিল অত্যন্ত গরীব এবং শহর ও আইনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার অধিকার তাদের ছিল না। এই দুর্দশা তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। তবে এ অবস্থার অবসানও ঘটেছে এক সময়। এথেন্সে প্রথম পরিবর্তনটা আসে।

বিশাল পাহাড়ের ওপরে গড়ে ওঠা এথেন্সকে তার বাসিন্দারা বলত আক্রোপলিস। আক্রোপলিসের চূড়োয় তারা দেবী এথেনির একটি মন্দির স্থাপন করে। তার নামে শহরের নাম হয় এথেন্স। নগরীর বাইরের কিছু জমি ছিল খুবই উর্বর। সেখানে শস্য ও আঙুরের চাষ করত কৃষকরা। কাছে ছিল জলপাই গাছের ঝাড়, জলপাই তেলের উৎস। এই পণ্যটি এথেনিয়ানরা বিপুল পরিমাণে রপ্তানী শুরু করে দেয়।

পাহাড়ের ঢালে চাষীরা ছাগল আর ভেড়া চড়াত এবং আরেকটি মূল্যবান রপ্তানীযোগ্য পণ্য মধুর জন্যে মৌচাকেরও ব্যবস্থা করেছিল।

ভৌগোলিক এ সুবিধা ভোগ করত এথেন্সবাসী। প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণই হাতের কাছে ছিল বলে তারা শান্তি ও সুখে বাস করত। কিন্তু এ সুখ বেশিদিন ভোগ করতে পারে নি তারা। খ্রী. পূ. সপ্তম শতকে শহরে বেশ বড় ধরনের

গোলমাল শুরু হয়ে যায়। খামারের মালিকরা বিরাট বড়লোক হয়ে গিয়েছিল আর যারা মাঠে কাজ করত তারা চলে যায় দারিদ্র্য সীমার নিচে। অনেকেই ঋণের ভারে এমন জর্জরিত হয়ে পড়ে যে দেনার দায় থেকে মুক্ত হতে ভূমির মালিকের কাছে নিজেদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে তারা বাধ্য হয়। এথেন্সে কোন লিখিত আইনের বালাই ছিল না। তাছাড়া ক্ষমতাসীনরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সুবিধে মত আইনের পরিবর্তন করতেন। এর ফলে বিদ্রোহ দানা বাঁধে এবং এথেন্সের মানুষ অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

খ্রী. পূ. ৫৯০ তে সোলন নামে এক এথেনিয়ান জমিদার গরীব ঠকানো আইনের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা নিতে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সোলন বন্ধুদেরকে নিয়ে পুনর্গঠনের একটি দ্রুত প্রোগ্রাম পেশ করেন সরকারের কাছে। তিনি সকল এথেনিয়ানদের জন্যে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। গ্রানাইট পাথরের থামের গায়ে আইনের কথা লেখা থাকত। মূল বাজার বা আগোরাতে এই আইন লেখা থাকত। সবাইকে আইন মেনে চলতে হতো। তিনি সকল মর্টগেজ বাতিল করে দেন, ঋণের দায়ে জেলখাটা মানুষগুলোকে মুক্ত করেন এবং যারা ক্রীতদাস হিসেবে নিজেদেরকে বিক্রি করেছিল তাদেরকে সরকারি অর্থে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন, তিনি নাগরিকরা কতটুকু জমি কিনতে পারবে তাও সীমাবদ্ধ করে দেন। গরীবদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার পরে সোলন ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে তোলেন। সরকারের পুরো কাঠামোই তিনি বদলে ফেলেছিলেন। নগরীর কার্যক্রম আর ধনী কৃষক এবং রপ্তানীকারকদের একার এখতিয়ারভুক্ত ছিল না। বদলে চারশো সদস্যের গভর্নিং কাউন্সিল গঠন করা হয় শহরের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্যে। সকল শ্রেণী থেকে সদস্য গ্রহণ করা হতো, শুধু ক্রীতদাস ছাড়া। কারণ তারা মুক্ত নাগরিক ছিল না। আদালতের জুরীরাও আসতেন সমাজের সকল শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হয়ে। ইতিহাসে ওই প্রথম জুরীরা 'কেস' দেখার সুযোগ পান।

সলোনের মূল লক্ষ্য ছিল পুনর্গঠনের মাধ্যমে এথেন্সকে একটি বসবাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করে তোলা। কিন্তু তার অবসর গ্রহণের পরে নতুন কর্মপরিকল্পনার বেশ কিছু অংশ ফেলে দেন সুবিধাবাদী অভিজাতরা। তারা সলোনের সহকর্মীদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তবে ভাল সময়ের স্বাদ পাওয়া গরীব লোকেরা এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দেয়নি। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে অভিজাতদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং ৫৬০ খ্রী. পূর্বে নিজেদের নেতা নির্বাচন করে পিসিসট্রাটাসকে।

পিসিসট্রাটাস ছিলেন স্বৈরাচারী। তবে বিশ বছরের ক্ষমতাকালে নিজেকে তিনি দক্ষ নেতা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তিনি সলোনের পুনঃসংস্কারের কার্যক্রম

চালিয়ে গেছেন এবং নিজেও কিছু সংস্কার করেছেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেন এবং নতুন রপ্তানী বাজার খুলে দেন সদাগরদেরকে উৎসাহিত করে তোলার জন্যে, যাতে তারা আরো দূর-দূরান্তে তাদের মালামাল নিয়ে ব্যবসা করতে যায়। নতুন একটি ব্যবসায়িক এলাকা ছিল কৃষ্ণ সাগরের উপকূল। পিসিসট্রাটাস বেশ কিছু পাবলিক বিল্ডিং এবং মন্দির স্থাপন করেছেন। সোনা ও রূপোর খনিতে পাওয়া সোনা-রূপো দিয়ে দালান কোঠায় সোনার কাজও করিয়েছেন তাদেরকে দিয়ে।

পিসিসট্রাটাস মারা যান খ্রী. পূ. ৫২৭ অব্দে। উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান নিজের দুই ছেলেকে। কিন্তু মহান ও শক্তিশালী নেতাদের মৃত্যুর পরে সাধারণত যেমনটি ঘটে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরসুরিরা তাদের বাপদের মত নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারে না। পিসিসট্রাটাসের ছেলেদের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছিল। একজন খুন হয়েছিল, অপরজন, হিপিয়াসকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারপর জনগণ ক্ষমতায় বসায় নতুন নেতা ক্লিসথেনেসকে।

ক্লিসথেনেস ছিলেন একজন রাজনৈতিক সংগঠক। ইনি সলোনের চিন্তাচেতনাকে কাজে লাগিয়ে ওগুলো বিস্তৃত করার চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সূচনা করেন। ডেমোক্রেসি (demos= জনগণ) বা গনতন্ত্র ওই সময়ে এখনকার মত ছিল না। তখন ডেমোক্রেসি বলতে সেই ক্ষমতাকে বোঝাত যা ছিল সকল মুক্ত নাগরিকের হাতে যারা নির্বাচন করার অধিকার রাখত এবং নেতাকে অপছন্দ হলে তাকে বর্জন করতেও দ্বিধা করত না। তবে সবার এরকম ক্ষমতা ছিল না– নগরীতে বসবাসকারী বিদেশী কিংবা ক্রীতদাসরা ছিল এর বাইরে।

ক্লিসথেনেস কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন যাতে প্রতিটি মুক্ত গ্রীক নাগরিক জনগণের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে নগরীর নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেত। 'ফাইভ হান্ড্রেড' নামে একটি নতুন কাউন্সিল গঠিত হয়। এর সদস্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বিশাল এ কাউন্সিলকে কয়েকটি দল বা কমিটিতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল বছরে নগরীর এক দশমাংশ কার্যক্রম পরিচালনা করত। আর্কন বা কর্মকর্তারা কাউন্সিলের নির্দেশ পালন করতেন। এরাও নির্বাচিত হতেন জনগণ দ্বারা। জনগণ দশজন সেনাপতিও নির্বাচিত করত একটি বোর্ড গঠন করার জন্যে। এ বোর্ড যুদ্ধের প্রয়োজন হলে সৈন্য পাঠাত। এভাবে সবকিছুতে জনগণের কণ্ঠ সোচ্চার ছিল নগরীর কল্যাণের জন্যে এবং এথেন্স হয়ে ওঠে প্রথম সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ।

আরেকটি নগর রাষ্ট্র যেটির অবস্থান ছিল এথেন্স থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তার নাম স্পার্টা। এ নগরীতে দুই রাজা যৌথভাবে রাজ্য শাসন করতেন। তারপর ক্ষমতা

হস্তান্তর করা হয় নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেট বা ইফোরদের হাতে। নগরীর বাসিন্দারা এই ইফোরদেরকে নির্বাচিত করার অধিকার রাখত তবে কৃষক কিংবা ক্রীতদাসদের ভোটের অনুমতি মিলত না। সপ্তম শতকে ক্রীতদাসদেরকে বলা হতো হেলট। এরা বিভিন্ন সময়ে নগরবাসীর বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করেছে। অবশেষে, স্পার্টান নগরবাসী তাদের সেনাবাহিনী গঠন করে। ফলে আর বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। এর মানে এথেন্সের মত গণতন্ত্র গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি স্পার্টা।

স্পার্টান বালকদেরকে সাত বছর বয়সেই বাড়ি থেকে ধরে এনে রাষ্ট্রীয় মিলিটারি স্কুলে ট্রেনিং-এর জন্যে ভর্তি করে দেয়া হতো। ট্রেনিং চলত যতদিন না তারা লড়াই করার জন্যে উপযুক্ত হয়েছে ততদিন পর্যন্ত। এভাবে স্পার্টান সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী, তবে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইর চেয়ে স্পার্টা বেশি ব্যস্ত থাকত এথেন্সের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে। তারা এথেন্সের ওপরে কর্তৃত্ব ফলাতে চাইত।

গ্রীকরা প্রথম ঝামেলায় পড়ে যায় পার্সিয়ানদেরকে নিয়ে. দারিউস পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করার পরে। তিনি দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের বিরাট অংশ দখল করে ফেলেছিলেন, এর মধ্যে ছিল মেসিডোনিয়া ও তার পূর্বপুরুষরা, সাইরাস দ্য গ্রেট এবং ক্যামবিসেস এশিয়া মাইনরেব পশ্চিম উপকূলের অনেক নগরী দখল করেন। এসব অঞ্চলে স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল।

খ্রী. পূ. পঞ্চম শতকের শুরুতে কয়েকটি আইওনিয়ান নগরী পার্সিয়ান জমিদারদেরকে একসঙ্গে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। তারা এজন্যে মেইনল্যাণ্ডের গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য প্রার্থনা করে। স্পার্টা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেও এথেন্স কয়েকটি জাহাজ ও মাঝিমাল্লা পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদেরকে সাহায্যের জন্যে।

পার্সিয়ানরা কঠোর হাতে দমন করেছিল বিদ্রোহ। তখন দারিউস সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহীদেরকে মদদ জোগানোর জন্যে এথেন্সকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয় শহর দখল করার জন্যে।

খ্রী. পূ. ৪৯০ তে এথেনিয়ান কাউন্সিল স্পার্টাসহ অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রে পার্সিয়ান হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়। স্পার্টা আবারও তার জাতভাইদের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অন্যান্যরা এই বলে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যে পার্সিয়ানরা তাদেরকেও যদি আক্রমণ করে বসে সে জন্যে তারা নিজেদের সৈন্য হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। তবে একটি ব্যতিক্রম ছিল। ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র প্লাতিয়া এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেয় এথেন্সে।

এদিকে পার্সিয়ান সম্রাট তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন, ৪০,০০০ শক্তিশালী জওয়ান নিয়ে সেনাবাহিনী। সেই বিশাল নৌবহর নিয়ে আইওনিয়ান সাগর থেকে মেইনল্যাণ্ডের কাছের ক্ষুদ্র শহর ম্যারাথন যাত্রা করেন। ওখানে পৌঁছে দেখেন গ্রীক বাহিনী অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

ভোরবেলা, সূর্য ওঠার সাথে সাথে এথেনিয়ান জেনারেল ইন কমাণ্ড মিল টিয়েডস যুদ্ধ শুরুর সংকেত দেন। সুসজ্জিত ও সংগঠিত গ্রীক বাহিনী হাতে শক্ত ঢাল নিয়ে আঘাত হানে পার্সিয়ান বাহিনীর একেবারে কেন্দ্র মূলে। কয়েক ঘন্টা দু'পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ চলে, কেউই পিছু হঠতে রাজি নয়, অবশেষে দুর্বল হতে থাকে গ্রীকরা। তখন মিলটিয়েডস আরো দুই স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে দেন পার্সিয়ানদেরকে হামলা করতে। নতুন হামলায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে হামলাকারীরা এবং সাঁঝ ঘনাবার আগেই তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

গ্রীকদের জন্যে ম্যারাথনের বিজয় ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পার্সিয়ানরা গ্রীকদেরকে বহুবার পরাজিত করেছে, তবে এ যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। গ্রীকদেরও কম ক্ষতি হয়নি। আরো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত তেমন সংরক্ষিত বাহিনী তাদের ছিল না বললেই চলে।

পার্সিয়ানরা পিছু হঠতে শুরু করলে মিলটিয়েডস ব্যায়ামবীর ফিডিপাইডিসকে এথেন্সে পাঠিয়ে দেন বিজয়ের খবর পৌছে দিতে। সমস্ত পথ দৌড়ে গেছেন ফিডিপাইডিস, প্রায় ছাব্বিশ মাইল রাস্তা। এথেন্সে পৌছে, বিজয় সংবাদ ঘোষণার পরপরই তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে, আর উঠে দাঁড়াতে পারেন নি। তার এই বিখ্যাত দৌড় পরবর্তীতে ম্যারাথন দৌড় হিসেবে স্বীকৃতি পায় অলিম্পিক খেলায়।

এথেন্স নিজেকে এবং তার প্রতিবেশীদেরকে কিছুদিনের জন্যে বহিরাগতদের হামলা থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল প্লাতিয়ানদের সাহায্যে। প্লাতিয়ানদের খুব কম সংখ্যক যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। তবে গ্রীকরা কল্পনাও করেনি ওটাই ছিল পার্সিয়ান রাজার শেষ যুদ্ধ। পার্সিয়ানরাও উপলব্ধি করতে পারে তারা আসলে অজেয় নয়। তারা পরবর্তীতে পশ্চিমের বদলে পুবে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছিল ম্যারাথনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে।

# রোমের সাত রাজা

বিশ্ব ইতিহাসের সকল সভ্যতার মধ্যে রোমানদের ইতিহাস সবচেয়ে বিখ্যাত। ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, তারপরেও এর খুব ক্ষুদ্র অংশই ছিল মৌলিক। রোমানরা খুব অল্প কিছু শিল্পী কিংবা চিন্তাবিদ উপহার দিতে পেরেছে : বেশির ভাগ এসেছিল গ্রীস বা এশিয়া মাইনর, মিশর সহ অন্যান্য উপনিবেশ থেকে। বর্ণমালা, ভাষা এবং ব্যাকরণ গ্রীক থেকে গ্রহণ করা হয়, স্থাপত্য বিদ্যাও তেমনি। এমনকি আইনী ব্যবস্থা, যা ছিল ওই সময়ে অন্য যে কোন সভ্যতার চেয়ে সমৃদ্ধ, তাও বেবিলন, পার্সিয়া এবং গ্রীসের অবদান।

তাহলে রোমের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা কোথায়? প্রাথমিকভাবে বলা যায় রোমানরা ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ। তারা অদ্ভুত দক্ষতার সাথে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করেছিল। তাদের প্ল্যান প্রোগ্রামের অভাব ছিল না। তারা ছিল দুঃসাহসী যদিও প্রথম দিকে একের পর এক যুদ্ধে হেরেছে। তবে শেষের দিকে জয়লাভ করেছে। তাদেরকে লড়াই করতে হয়েছে কার্থাজিনিয়ান, হ্যানিবালের মত দুর্ধর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে রোমানদের যে রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর কোন সভ্যতাকে এতটা ক্ষতির স্বীকার হতে হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বেশ কয়েকবারই রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপরও টিকে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

রোমানরা কিভাবে বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল? অথচ তাদের শুরুটা ইতালির টিবের নদীর একটি ছোট শহর থেকে।

রোমানরা বিশ্বাস করত তারা সেই দলভুক্তদের বংশধর যারা ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের ছেলে ইনিয়াসকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল, একিয়ানরা ট্রয় নগরী জ্বালিয়ে দিলে তারা রাজা প্রিয়ামকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ইনিয়াস জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরে ভেসে পড়েন এবং ঝড়ের কবলে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে চলে আসেন টিবের নদীর মোহনায়। এখানে তিনি লাভিনিয়াম নামে একটি শহর পত্তন করেন।

খ্রী. পূ. ১২০০ শতকে ইন্দো-ইউরোপীয়ানরা এশিয়ায় বেশীর ভাগ অঞ্চল দখল করে অনেক সভ্যতা এবং সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়। কিছু ইন্দো-ইউরোপীয়ান পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আস্তানা গাড়ে ইতালীতে। ট্রোজানরাও ইন্দো-ইউরোপীয়ান সময়ের।

ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের যারা ইতালীতে বসতি গেড়ে বসেছিল তারা লোহার ব্যবহার জানত এবং এরা বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে ছিল

আমব্রিয়ান, ল্যাটিন, স্যামনাইট ও এট্রুসকান। প্রত্যেকেই ছিল যোদ্ধার জাত এবং তাদের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত মারামারিতে। এট্রুসকান ও ল্যাটিনরা টিবের নদী ও ইতালীর পশ্চিমে উপকূলের মাঝখানের অঞ্চল দখল করে নেয়। এ অঞ্চল ছিল অত্যন্ত উর্বর, বিশেষ করে সব্জি, আঙ্গুর ও জলপাই খুব ভাল জন্মাত। গরু-মোষ চড়ানোর জন্যেও ছিল চমৎকার তৃণভূমি। আরো দক্ষিণে, সামনাইট অঞ্চলও কম উর্বর ছিল না।

সিসিলি ও ইটালিয়ান উপদ্বীপের নিম্নাঞ্চলে গ্রীক ও ফিনিশীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কারণ তাদের ভূমি ছিল শুষ্ক ও ধুলোময়। ওখানে কাজ করা ছিল কঠিন।

খ্রী. পূ. ৭৫৩ অব্দে রোমের পত্তন হয়। টিবের নদী থেকে মাইল কুড়ি দূরে, একটি পাহাড়ি এলাকায় গড়ে তোলা হয় নগরীটি। রোমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ল্যাটিন সর্দার, রোমুলাস, লাভিনিয়ামের চেয়ে রোমকে তার অধিক নিরাপদ মনে হতো কারণ এ শহরের অবস্থান ছিল সাগর থেকে দূরে এবং গ্রীক ও ফিনিশীয় লুটেরাদের নাগালের বাইরে। এ শহরের পার্বত্য এলাকায় প্রথম যে ইমারত তৈরি করা হয়, পরে এর নামকরণ করা হয়েছিল প্যালাটাইন হিল। সম্রাটরা এখানে অপূর্ব সুন্দর সব প্রাসাদ নির্মাণ করেন।



*রোমানরা বিশ্বাস করত রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ও তার যমজ ভাই রেমাস নেকড়ে মা'র দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন।*

রোমুলাস রাজা হয়ে ৭১৬ খ্রী. পূ. পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। এ সময়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে প্রায়ই তাকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

রোমুলাসের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তারই এক বন্ধু, নুমা পম্পিলিয়াস। ইনি ভিন্ন জাতি স্যাবিন থেকে এসেছিলেন। ধারণা করা হয় রোমে তিনিই প্রথম গ্রীক ধর্মের অনুসরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। রোমানদেরও একই দেবতা ছিল গ্রীসদের মত, তবে ভিন্ন নামে। যেমন জিউস রোমানদের কাছে ছিলেন জুপিটার। হেরা জুনো, হারমিস মার্কারী ও এথেনি মিনার্ভা। রোমানদের সাগর দেবতা ছিলেন নেপচুন এবং পাতাল দেবতা প্লুটো।

নুমা (খ্রী. পূ. ৭১৬–৬৭৩) একজন জ্ঞানী ও বিবেচক শাসক ছিলেন, তার অধিনায়কত্বে নতুন শহরটি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। নুমা শহরের চারদিকে কিছু খামার গড়ে তোলেন যাতে নগরবাসীর খাদ্যের অভাব না হয়। তিনি দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করেছেন। একটি মন্দির ছিল দুই মাথা অলা দেবতা জানুসের। ইনি দুই দিকেই দেখতে পেতেন। তার একটি মাথা ছিল শান্তির, অপরটি যুদ্ধের। মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকত। শুধু যুদ্ধের সময় খোলা রাখা হতো। নুমার পরে অবশ্য মন্দিরের দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকত। এ দরজা খোলা হয় প্রথম সম্রাট অগাষ্টাসের আমলে (খ্রী. পূ. ২৭–১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

তুল্লাস হেস্টিলিয়াস (৬৭৩–৬৪১ খ্রী. পূ.) ছিলেন পরবর্তী রাজা। তিনিও জ্ঞানী শাসক ছিলেন। তবে যুদ্ধের নেশাও ছিল রক্তে। প্রতিবেশী রাজ্য আলবা লোঙ্গা দখল করে তিনি সেখানকার গ্রামগুলো ধ্বংস করে লোকজন ধরে নিয়ে আসেন রোমে। নগরীর ইমারত নির্মাণও তিনি চালিয়ে গেছেন।

তুল্লাসের পরে ক্ষমতায় আসেন আনকাস মার্সিয়াস (৬৪১–৬১৬ খ্রী. পূ.), বেশিরভাগ সময় তার কেটেছে শহরের পরিধি বিস্তৃতিতে। তিনিই প্রথম টিবের নদীর ওপরে সেতু নির্মাণ করেন এবং দক্ষিণ তীরে দালান কোঠা বানান ল্যাটিন লোকদের বসবাসের জন্যে। এদেরকে তিনি নানা যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। ফলে শহর নদীর দুই তীরেই আয়তনে বাড়তে থাকে। আনকাস টিবের নদীর মোহনায়, ওষ্টিয়ায় একটি বন্দর এবং জেটিও নির্মাণ করেছিলেন। ফলে রোমে নানা জিনিস সহজে আমদানী করা যেত। এক পর্যায়ে শহরের নিজস্ব মিলনস্থলে, গণ স্নানাগার ও গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র আকারে। আনকাসের মৃত্যুর সময়ে রোম বিশাল এক নগরীতে পরিণত হয়েছিল। উত্তর অঞ্চলে সাতটি পাহাড় জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। এ পাহাড়গুলো ছিল খুবই বিখ্যাত। নাম প্যালাটাইন, ক্যাপিটোলাইন, এসকুইলাইন, অ্যাভেন্টাইন, সেলিয়ান, কুইরিনাল ও ভিমিনাল। এ জন্যেই রোমকে বলা হয় 'সাত পাহাড়ের দেশ'।

স্পার্টানদের মত আদি সময়ের রোমানরাও ছিল জেদী, একগুঁয়ে, বেপরোয়া, সুশৃঙ্খল এবং যুদ্ধপ্রিয়। একজন মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করা। রোমানদের শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ তাদের ক্রম বিস্তৃতি ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিবেশীদের মনে। তারা রোমানদেরকে নানাভাবে হেনস্তা করছিল। রোমের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ইট্রুসকানরা। এরা ভয়ানক নিষ্ঠুর ও নির্দয় স্বভাবের মানুষ। এরাও লোহার খুব ভাল ব্যবহার জানত।

আনকাসের মৃত্যুর পরে তাকে অনুসরণ করার মত যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয় রোমে। তখন একদল এট্রুসকান রোম অবরোধ করে ফেলে। শহর থেকে পাঠানো একদল রোমান সৈন্যকে তারা পরাজিত করে। তবে দু'দলে

আলোচনাও চলছিল। এট্রুসকানদের নেতা টারকুইন বলেন তিনি নিজের কিছু লোক নিয়ে রোমে বাস করতে চান। রোমান কমিশনাররা এ প্রস্তাবে রাজি হন। একই সময়ে টারকুইনকে রাজা নির্বাচিত করা হয়। তিনি আটত্রিশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন এবং ওই সময়ে রোম এবং নগরবাসীর কল্যাণে অনেক ভাল ভাল কাজ করে গেছেন।

টারকুইন রোমের প্রধান পয়োনালী ব্যবস্থা গঠন করেন, এর নাম ক্লোকা ম্যাক্সিমা। এর ফলে নগরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। ক্লোকা ম্যাক্সিমার খানিক অংশ রোমে এখনও বিদ্যমান। টিবেরে বন্যা হবার সময় অতিরিক্ত পানি উপত্যকায় নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও তিনি করেছিলেন। এর ফলে মাঠগুলো উর্বর হয়ে ওঠে, শুষ্ক এলাকাতেও ফসল ফলানো সম্ভব হয়।

ক্যাপিটোলাইন পাহাড়ে টারকুইন দেবতাদের রাজা জুপিটারের একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন যা তীর্থ স্থানে পরিণত হয়। প্যালাটাইন পাহাড়ের নিচে তিনি বিন্যস্ত করেন সার্কাস ম্যাক্সিমাস। এটি ছিল গোলাকার, প্রকাণ্ড ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ওখানে রথ চালাবার প্রতিযোগিতা হতো। সার্কাসে প্রতিবছর উৎসবও হতো, খেলা হতো। স্পার্টান ও রোমান উভয়েই বিশ্বাস করত শরীর ঠিক রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই।

খ্রী. পূ. ৫৭৮-এ টারকুইন মারা গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ এক উপদেষ্টা, সার্ভিয়াস তুল্লিয়াস। তিনি ছিলেন শান্তিকামী মানুষ। সার্ভিয়াসের সময়ে রোম সুপরিচিত হয়ে ওঠে ল্যাটিন ভাষার প্রধান নগরী হিসেবে।

সার্ভিয়াসের বেশিরভাগ অবদান ছিল শহর কেন্দ্রিক। তিনি গোটা নগরীর চারদিকে মজবুত দেয়াল গঠন করেন। সাত পাহাড়কে ঘিরে রাখা সেই দেয়ালের কিছু অংশ কালের সাক্ষী হয়ে আছে এখনও।

সার্ভিয়াস রোমানদের শ্রেণী পদ্ধতিকে নিয়মিত করেন। রোমানদের মধ্যে যারা অভিজাত শ্রেণীর ছিলেন তারা অ্যাসেম্বলিতে যোগ দেয়ার সুযোগ পেতেন। এই অ্যাসেম্বলি গঠিত হতো উঁচু বংশে জন্ম নেয়া লোকজন দ্বারা। এরা ছিলেন রাজার উপদেষ্টা। এরা এক পর্যায়ে অভিজাতদের মতই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। এদের কারণে রোমে অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে চলছিল। এরা সরকারের সবগুলো পদ দখল করে রাখতেন দীর্ঘসময় ধরে এবং রোমান জনগণের স্বার্থের প্রতি তাদের কোন খেয়াল থাকত না।

প্লিবিয়ান শ্রেণী ছিল মুক্ত ক্রীতদাস কিংবা আগন্তুক যারা শহরে বাস করতে আসত কিংবা অভিবাসী অথবা তাদের পূর্ব পুরুষদের বংশধর। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও ক্রীতদাস ছিল। তবে রোমান আইনে তারা কিছু অধিকারও ভোগ করত।

সার্ভিয়াস সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত এবং প্লেবিয়ান বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন সাধারণের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার ছিল।

তাদেরকে ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হতো, দেয়া হতো অস্ত্র এবং দেশ দখল করতে পারলে লুণ্ঠনেও অংশ নেয়ার অধিকার তাদের ছিল। ফলে অনেক সৈনিকই লুটের টাকায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করত।

টারকুইন মৃত্যুর সময় কমবয়েসী একটি ছেলে রেখে যান। তবে অত্যন্ত অল্প বয়স বলে সার্ভিয়াসকেই রাজা বানানো হয়। কিন্তু যৌবনে পা দেয়ার পরে, এই ছেলেটি, এর নামও ছিল টারকুইন, সে নিজে রাজা নয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া স্বভাবের ছেলেটি সার্ভিয়াসের কোমল আচার আচরণ ও ভাল কাজগুলো ঘৃণার চোখে দেখত। সার্ভিয়াসের মেয়েকে বিয়ে করা সত্ত্বেও শ্বশুরের প্রতি তার প্রতিহিংসামূলক প্রবৃত্তি হ্রাস পায়নি। সে সার্ভিয়া দখল করে এবং খ্রী. পূ. ৫৩৪-এ হত্যা করে সার্ভিয়াসকে।

এ নৃশংস ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায় রোমের মানুষ। তবে টারকুইন প্রাসাদ রক্ষীদেরকে ঘুষ দিয়ে আগেই বশ করে ফেলায় কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পায়নি। টারকুইনকে রোমানরা নাম দিয়েছিল সুপারবাস। এর অর্থ একগুঁয়ে, অহংকারী এবং যে খুব খারাপভাবে রাজ্য শাসন করে। সে শহরকে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে ফেলে, অনেক মানুষকে বিনা বিচারে মেরে ফেলে এবং রোমে আতঙ্কের রাজ্য স্থাপন করে। তাকে সবসময় ঘিরে থাকত শক্তিশালী প্রহরীর দল। কারণ অত্যাচারী বলেই সে ছিল ভীরু আর এমনকি নিজের উপদেষ্টাদেরকেও বিশ্বাস করত না।

খ্রী. পূ. ৫১০-এ দু'জন অভিজাত রোমান নেতা, এল জুনিয়াস ব্রুটাস ও এল. কোলাটিনাস বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন রাজার বিরুদ্ধে। উচ্চ শ্রেণীর প্রায় সকলেই তাদেরকে সমর্থন যুগিয়েছিল–নিম্নশ্রেণী বা প্লেবিয়ানসহ। টারকুইন ও তার স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়া হয় শহর ছেড়ে চলে যেতে এবং বলা হয় তারা যেন আর কোনদিন দেশে ফিরে না আসে।

টারকুইনের বিভীষিকা দূর করতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় রোমে আর কোন রাজা থাকবে না। পরিবর্তে রাজ্য শাসন করবেন দু'জন কর্মকর্তা। যাদেরকে বলা হবে কনসাল। অ্যাসেম্বলি অফিস এক বছরের ভিত্তিতে তাদেরকে প্রতি বছর নির্বাচিত করবে। কনসালের কাজ হবে সরকারকে সাহায্য করা, যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব প্রদান এবং আইনের অনুশাসন জারী করা।

এট্রুসকানদের প্রতি রোমানদের এতই ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল অত্যাচারী টারকুইনের কারণে যে রোমান রাজ্যে এ রাজার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করত না কেউ।

নতুন পদ্ধতির অধীনে প্রথম দু'জন কনসাল ছিলেন ব্রুটাস ও কোলাটিনাস। এদেরকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ তে নির্বাচিত করা হয়। এদেরকে বলা যায় রোমান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

# পারস্য সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস

খ্রী. পূ. ৪৯০ অব্দে ম্যারাথনে পার্সিয়ান সেনাবাহিনীর পরাজয়ে পার্সিয়ান রাজা দারিউস বুঝতে পারেন তিনি যা অনুমান করেছিলেন তারচেয়ে অনেক কঠিন গ্রীকরা। তাই তিনি নতুন ও বৃহত্তর সেনাবাহিনী গঠন করেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। কিন্তু তার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয় মিশরে ভয়াবহ বিদ্রোহের খবর শুনে। ৪৮৫ খ্রীঃ পূর্বে দারিউস সিরিয়া থেকে নীল নদে অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহ দমন করার জন্যে, কিন্তু যাত্রাপথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেন তার ছেলে জেরেক্সেস। ইনি অত্যন্ত কঠিন স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু বছর কঠোর শাসন চালিয়ে গেছেন।

জেরেক্সেস মিশরে ঢুকে পড়েন সেনাবাহিনী নিয়ে, দ্রুত দমন করেন বিদ্রোহীদেরকে। তারপরে প্রত্যাবর্তন করেন এশিয়া মাইনরে এবং বাবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে গ্রীসে নতুন অভিযানের পাঁয়তারা কষতে থাকেন। খ্রী. পূ. ৪৮১ তে তিনি এক বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন কিংস হাইওয়ে ধরে, সার্দিস-এ অতিরিক্ত কিছু লোক সংগ্রহ করেন এবং হেলিসপন্টে যাবার জন্যে উত্তর অভিমুখে ঘুরে যান। জেরেক্সেস নদী পার হতে দু'সারি জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন। তাতে হাজার হাজার সৈন্য ছিল। হেলিসপন্ট পার হয়ে সৈন্যরা উপকূল ধরে এগিয়ে যায় গ্রীসের দিকে, ওদিকে পার্সিয়ান নৌবহরের জাহাজগুলো উপকূল রেখা বরাবর চলতে থাকে যাতে স্থল বাহিনীর সাহায্যে নেমে পড়তে পারে সহজেই।



৩০০ স্পার্টান পারস্যবাসীকে থার্মোপাইলি'র সরু গিরিখাদে পরাজিত করে।

এদিকে গ্রীকরা দশ বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল পার্সিয়ান হামলা ঠেকানোর জন্যে, কিন্তু নগর রাষ্ট্রগুলোর মতদ্বৈধতার কারণে তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপ্রস্তুত। জেরেক্সেসের বাহিনী হেলিসপন্ট ছেড়ে এগিয়ে আসছে শোনার পরেও তারা প্রস্তুতি নিতে পারে নি। তবে, সৌভাগ্যবশতঃ মিস্টোক্লিস এথেনিয়ানদের ধাওয়া করার জন্যে দুশো জাহাজের যে সম্পূর্ণ নতুন নৌবহর গঠন করেছিল, তা পিরাউস জেটিতে নোঙর করে ছিল। স্পার্টান বাহিনী ছিল গ্রীকদের নেতা, কারণ বহু বছর ধরে তারা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে, অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রগুলোও স্পার্টার নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হয়েছিল পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্বার্থে।

গ্রীকদের অধীনে ছিল কুড়ি হাজার মানুষের একটি সৈন্যবাহিনী। খ্রী. পূ. ৪৮০ তে পার্সিয়ানরা থার্মোপাইলে এসে পৌছে। গ্রীসের কেন্দ্রে পৌছার এটিই ছিল মূল রাস্তা। পার্সিয়ানরা দেখতে পায় স্পার্টান রাজা লিওনিডাস সশস্ত্র লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন। দু'দিন টানা যুদ্ধ হয়। তারপর এক গ্রীক বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। সে পার্সিয়ানদেরকে গ্রীসে পৌছার একটি গোপন রাস্তার কথা বলে দেয়। গ্রীকরা আগেই রণভঙ্গ দিত যদি না লিওনিডাস সাহসের সাথে স্পার্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলতেন। মাত্র তিনশ লোক নিয়ে শেষ লড়াই চালিয়ে যান তিনি।

শীঘ্রি উত্তর ও মধ্য গ্রীস চলে আসে পার্সিয়ানদের হাতের মুঠোয় এবং এথেন্স থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় গ্রীকরা। পার্সিয়ানরা শহরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয় অ্যাক্রোপলিসের দালান কোঠায়।

এদিকে গ্রীকরা আশ্রয় নিয়েছিল কোরিন্থের ইসথমুসে। ওখানে, বে অব সালামিসে এথেনিয়ান নৌবহর পার্সিয়ান পরিবহন জাহাজ ও রসদ বহনকারী নৌকার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হেমিস্টোক্লেস-এর নেতৃত্বে গ্রীকরা পার্সিয়ানরা ওই উপকূল এলাকায় পৌছা মাত্র তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধ্বংস করে ফেলে। তবে জেরেক্সেসের সৈন্যরা রসদবিহীন বেশিদিন অবস্থায় চলতে পারছিল না বলে রাজা থেসালি চলে যান। এতে গ্রীকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

ওই বছরই পার্সিয়ানরা গ্রীকদের ওপর প্লাতিয়ায় হামলা চালায়, তবে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়। গ্রীকদের বর্শার সামনে পার্সিয়ান তীর ধনুক দাঁড়াতেই পারেনি। এই গ্রীক বিজয় পরবর্তীতে ধরে রাখে স্যামোসের কাছে মাইসেলের নৌযুদ্ধেও। গ্রীক নৌ বাহিনী এখানেও জয়লাভ করে। পার্সিয়ানরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী ত্রিশ বছর পারস্য ও গ্রীস পরস্পরের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তবে বড় ধরনের লড়াই নয়। অবশেষে খ্রী. পূ. ৪৫০-এ তারা শান্তি চুক্তি করে।

পার্সিয়া বা পারস্য প্রতিশ্রুতি দেয় গ্রীক সাগরে তারা নৌবহর পাঠাবে এবং গ্রীকরা পার্সিয়ানদের অবরোধ তুলে ফেলে জেটি ও বন্দর থেকে।

গ্রীসের সাথে বারবার যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রচুর লোকজন, সম্পদ ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রকাণ্ড এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা একজন রাজার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ছিল। খ্রী. পূ. ৪৫৬ তে, জেরেক্সেস গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হবার পরে দুর্বল রাজারা সিংহাসনে আরোহন করতে থাকেন। ফলে সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকার প্রজারা বিভক্ত হয়ে যাবার সাহস পায়। তাদেরকে মদদ যোগাচ্ছিল গ্রীকরা।

খ্রী. পূ. প্রায় ৪০০ অব্দে পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় আর্টাজেরেক্সেস। তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় রাজ্য শাসন করেছেন, কিন্তু দেশে একটার পর একটা বিপর্যয় লেগেই ছিল। তার ভাই সাইরাস, যাকে এশিয়া মাইনরের ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়, তিনি সিংহাসনের দাবি তোলেন এবং প্রজাদেরকে নিয়ে স্বঘোষিত সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কুনাক্সার যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তবে ততদিনে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। গোটা পারস্য সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

দ্রুত বিপ্লবের মাধ্যমে মিশর স্বাধীন হয়ে যায়। এশিয়া মাইনরের প্রচুর প্রাদেশিক শাসক নিজেদেরকে স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে আর্টাজেরেক্সেসকে ব্যক্তিগত করুণ ট্র্যাজেডীর শিকার হতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তার তিন ছেলের মৃত্যু ঘটে। পরপর তিন ছেলের মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে রাজা নিজেই মারা যান।

আর্টাজেরেক্সেসের মৃত্যুর পরে খ্রী. পূ. ৩৫৯-এ সিংহাসনে বসেন তার চতুর্থ ছেলে তৃতীয় আর্টাজেরেক্সেস। ইনি কুড়ি বছর শাসন চালিয়েছেন। তিনি এশিয়া মাইনরের প্রাদেশিক সরকারগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম হন এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। তারপর মিশরে পার্সিয়ান ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালান। তবে তিনি খুন হন তার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রীর হাতে। এতে এশিয়া মাইনর ও মিশর আবারও বিদ্রোহ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

পরবর্তী রাজা ছিলেন তৃতীয় দারিউস– ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত রাজা দারিউসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইনি যখন রাজা হন ওই সময় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পারস্যে হামলা চালিয়ে বসেন। আরবেলায় বিখ্যাত মেসিডোনিয়ান সেনাপতি তৃতীয় দারিউসকে পরাজিত করেন এবং পার্সিয়ানদেরকে বিতাড়িত করেন। দারিউসের কর্মকর্তারাই তাকে হত্যা করেন আর আলেকজান্ডার নিজে পারস্যের রাজা হয়ে বসেন। আরবেলার অবস্থান কিংস হাইওয়েতে ছিল বলে আলেকজান্ডার বেবিলন, সুসা ও পার্সিপোলিসে সেনাবাহিনী নিয়ে সহজেই পৌঁছুতে পেরেছেন।

স্বাধীন পারস্য সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের অপরাজেয় সেনা বাহিনীর হাতে পরাধীন হয়ে যায়। বেবিলনে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে পারস্য শাসন করেন

তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলুকাস। সেলুকাস ডাইনাষ্টির তিনি ছিলেন প্রথম শাসক। তিনি প্রাচীন সম্রাটদের মত সাম্রাজ্য চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বারবারই বিঘ্ন ঘটেছে তার সেনাপতি ভাইরা হামলা চালানোর কারণে। খ্রী. পূ. ২৮০ তে সেলুকাস গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। সিংহাসনে আরোহণ করেন পঞ্চম অ্যান্টিওকাস (২৮০-২৬০ খ্রী. পূ.) তাকে 'ত্রাতা'ও বলা হতো। কারণ তিনি সাম্রাজ্যের হারানো আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি এবং তার ছেলে দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন, রাজ্য দখলে রাখতে তাদেরকে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। এতে সফলও হয়েছেন তাঁরা।

দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাসের মৃত্যুর পরে আবার ভাঙন শুরু হয়ে যায় সাম্রাজ্যে। পারস্য সাম্রাজ্যের মিশরীয় অংশ শাসন করতেন টলেমিক রাজারা। তারা ছিলেন আলেকজান্ডারের বিখ্যাত সেনাপতি টলেমির বংশধর। তবে বহু দশক ধরে এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় নি আসলে কে পুরানো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

খ্রী. পূ. ২২০-এ অ্যান্টিওকাস দ্বিতীয়র এক বংশধর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অ্যান্টিওকাস তৃতীয়, পরবর্তীতে অ্যান্টিওকাস দ্য গ্রেট নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সেলুকিড প্রদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল মেডিয়া, পার্থিয়া, বাকট্রিয়া (আফগানিস্তান) সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন। প্রাচীন পারস্য যেন আবার আগের চেহারায় ফিরে আসছিল। তবে পার্সিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের লোক ছিল। তারা গ্রীস ও মেসিডোনিয়া দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিল এবং একত্রে বসবাস করার কথা তারা ভুলে গিয়েছিল।

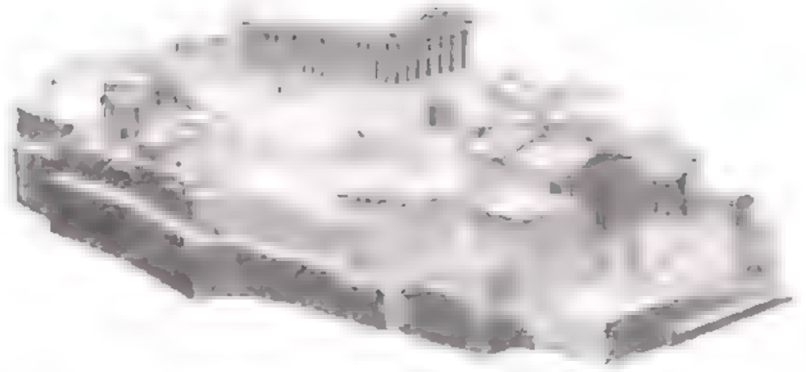
খ্রী. পূ. ১৮৭তে মারা যান অ্যান্টিওকাস। পারস্যে আবার শুরু হয়ে যায় অরাজকতা। ফলে এ দেশ অন্য সাম্রাজ্যগুলোর সহজ শিকার হয়ে পড়ে, বিশেষ করে পার্থিয়ার। এ অঞ্চলটি বহু বছর আগে নির্দয় শাসক আর্সাসের অধীনে পারস্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর্সাসের বংশধর আর্সাসিডরা পুব ও পশ্চিমে তাদের প্রতিবেশীদের ওপর নতুন করে আগ্রাসন শুরু করে দেয়। মিথ্রাডেটসের নেতৃত্বে (১৭১-১৩৮ খ্রী. পূ.) পার্থিয়ানরা মেডিয়া ও পারস্য দখল করে ও সেলুসিয়ান, টাইগ্রীসের তীরে পুরানো বেবিলন থেকে মাইল কয়েক দূরে গড়ে তোলে নতুন রাজধানী।

মিথ্রাডেটস-এর মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসেন তাঁর ছেলে দ্বিতীয় মিথ্রাডেটস। ইনি খ্রী. পূ. ১২৭-৮৭ পর্যন্ত শাসন করেছেন। রোমানদের জন্যে তিনি ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক।

# পেরিক্লিস ও আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

ম্যারাথনে গ্রীকদের কাছে পরাজয় সত্ত্বেও সালামিস ও প্লাতিয়া পার্সিয়ানদেরকে গ্রীক জয়ের স্বপ্ন না দেখতে বাধ্য করেছিল, তারা তখনো সকল গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের জন্যে ছিল হুমকি। একজন নেতার নেতৃত্বে একত্রিত হবার প্রয়োজন অনুভব করছিল তারা। কিন্তু নেতা কে হবে স্পার্টা, যার সৈন্যবাহিনী সবচেয়ে শক্তিশালী নাকি এথেন্স, যার নৌ বহর অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এ দুয়ের সমন্বয় ছিল হামলা ঠেকানোর জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, কিন্তু গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলো সহযোগিতা না করার মনোভাবের ইতিহাস দীর্ঘদিনের এমনকি আত্মরক্ষার জন্যে হলেও, তারা পরস্পরকে ধ্বংস করেই চলছিল। ফলে তারা মেসিডোনিয়ার ফিলিপ ও তার ছেলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সহজ শিকার হয়ে পড়ে।

স্পার্টানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উপদ্বীপ পেলোপোনেসাস-এর নগরীগুলোর প্রধান হিসেবে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপদ্বীপ বা পেনিনসুলা গ্রীক মূলভূমির নিচে আইওনিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্পার্টানরা পার্সিয়ানদের সম্ভাব্য হামলায় আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হোক তা চায়নি। তাই এথেনিয়ানরা চলে আসে নেতৃত্বে। যদিও নিজেদের অনেক সমস্যা তাদের ছিল– জেরেক্সেস এথেন্স ছাড়া আর সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলেন–তারা কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য গঠন করে, এর মধ্যে আইওনিয়ান নগরীগুলোও ছিল।



*আক্রোপলিস*

এই লীগ বা সঙ্ঘবদ্ধ রাজ্যসমূহকে বলা হতো ডেলিয়ান লীগ। কারণ মূল পরিকল্পনাগুলো করা হয়েছিল ডেলোস দ্বীপে বসে।

সদস্য রাজ্যগুলোর পাঠানো টাকা ডেলোসে রাখা হত নিরাপত্তার জন্যে। ডেলিয়ান লীগের দরকার ছিল একটি নৌবহরের যা ঈজিয়ান সাগরকে পাহারা দেবে এবং পারস্য হামলা থেকে রক্ষা করবে গ্রীক উপকূলকে। আর সদস্যদেরকে সোনা অথবা জাহাজ দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছে। এথেন্সে নৌবহরের কমান্ডার ইন চীফ নিয়োগ করে ম্যারাথন বিজয়ী মিলটিয়াডেসের ছেলে সিমনকে।

নৌবহর নিয়ে সিমন এক কি দু'বার অভিযানে নেমে ছিলেন। ইউরিমেডন নদীর মোহনায় তিনি একটি পার্সিয়ান নৌবহরকে পরাজিতও করেন। এতে ঈজিয়ান সাগর তীরের প্রতিটি গ্রীক নগরী পারস্য শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ডেলিয়ান লীগের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

তবে সিমন এথিনিয়ানদের বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন স্পার্টাকে ডেলিয়ান লীগে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে। তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন যদি সফল গ্রীক নগর-রাষ্ট্র লীগে যোগ দেয় তাহলে এটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্পার্টা এথেনিয়ানদের তাদের প্রতি ঘৃণার কারণে। স্পার্টানরা স্ব ইচ্ছায় ম্যারাথন ছেড়ে চলে যাওয়ায় এথেনিয়ানরা তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেনি। সিমনকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। অবশেষে, গ্রীক ও পারস্যবাসী খ্রী. পূ. ৪৫০ অব্দে শান্তিচুক্তি করে। গ্রীকরা ঈজিয়ান সাগর ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। এই সন্ধি বহুদিন বলবৎ ছিল।

সিমন নির্বাসনে থাকাকালীন এক নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটে এথেন্সে। তিনি পেরিক্লিস, প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম মহান এক ব্যক্তি। ক্লিসথেনেসের বংশধর পেরিক্লিসকে বোর্ড অভ কমান্ডার নির্বাচিত করা হয়। তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন, প্রতি বছর পরবর্তী পনের বছরের জন্যে পুনঃনির্বাচিত হতেন। এভাবে তিনি এথেনিয়ান রাজ্যের মাথা হয়ে ওঠেন।

পেরিক্লিসের জন্ম সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর শত্রুরাও ছিল তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। এ মানুষটি কোনদিন ঘুষ খাননি, ওই সময়ের এথেনিয়ান রাজনীতিকদের মাঝে এক দুর্লভ চরিত্র ছিলেন পেরিক্লিস। দুর্দান্ত বাগ্মী, স্বচ্ছ চিন্তাবিদ এ লোকটি মনে প্রাণে মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। বিশ্বাস করতেন সব মানুষই ভাল হৃদয়ের অধিকারী, সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে শুধু তাদের যথার্থ গাইড দরকার।

পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে, অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে শৃঙ্খলা সূচিত হয়। ফলে দেশটি তার শক্তি পুনর্গঠনের সুযোগ পায় এবং গ্রীক নগরগুলোর মাঝে কর্তৃত্বপরায়ন হয়ে ওঠে। পেরিক্লিস বিশ্বাস করতেন এথেনিয়ানরা রাষ্ট্র চালাবার জন্যে সবচেয়ে উপযোগী এবং সকল রাজ্যের বহির্বিশ্বের সমস্ত বিষয় একটি মাত্র নগরীর নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, তা হলো এথেন্স। এটি ছিল এথেনিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বীজ, যে স্বপ্নকে পেরিক্লিস তাঁর সময়ে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।

ডেলিয়ান লীগের হেডকোয়ার্টার্স ও কোষাগার ডেলোস থেকে সরিয়ে এথেন্সে নিয়ে আসেন পেরিক্লিস। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় এথেন্সই লীগের মাথা। এথেন্স অন্যান্য শহরকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে এবং কেউ তা মানতে না চাইলে সেখানে

নৌবহর পাঠাতে থাকে। ফলে লীগ ক্রমে পরিণত হতে থাকে সাম্রাজ্যে। একের পর এক নগরীগুলো হারাতে থাকে তাদের স্বাধীনতা।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলো এথেন্সের নিয়মকানুনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। কারণ গ্রীক চিন্তা চেতনার সাথে সাম্রাজ্যের বিরোধ দেখা দেয়। গ্রীক চিন্তাধারায় প্রতিটি নগরী ছিল মুক্ত, স্বায়ত্তশাসিত সরকারের রাজ্য। তবে এথেনিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ হবার কারণে নানা দিক থেকে সুযোগ-সুবিধেও পাওয়া যাচ্ছিল। এথেন্স ঈজিয়ান এলাকায় শান্তি বজায় রাখে। জলদস্যুতা ছিল নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে তোলা হয় এবং এথেনিয়ানরা কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিতে থাকে এ আশায় যে তাদের ধারণা ছিল এগুলোর অবশেষে সমৃদ্ধি ঘটবে। প্রতিটি রাজ্য এথেনিয়ান অনুকরণে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তাদের আদালত দক্ষতার সাথে, সৎভাবে চালাতে চায়। রাষ্ট্রদূতদেরকে প্যানাথেনিক উৎসব ও খেলাধুলায় আমন্ত্রণ জানানো হতো, এথেন্সে প্রায়ই আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো দেখাতে যে সকল রাজ্য একটি অবিচ্ছিন্ন ও সন্তুষ্ট সাম্রাজ্যের অংশ।

পেরিক্লিস ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা এথেনিয়ান গণতন্ত্রকে আরো ফলপ্রসু করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছিলেন। গণহারে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন কাউন্সিল অব ফাইভ হান্ড্রেড দেখতে যে এরা সত্যি তাদের কাজ চালিয়ে যাবার মত উপযুক্ত কিনা। অর্থ বিভাগের কোন কর্মচারী অর্থ তসরুফ করে পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না। যে কোন মুহূর্তে চাকরির হারানোর ভয় ছিল বলে কেউ জানত না কার কখন কি অপরাধে জুরীর সামনে ডাক পড়ে যায়। ঘুষ খাওয়ারও উপায় ছিল না।

জুরীর চাকরি যে কোন নাগরিকের জন্যে ছিল উন্মুক্ত। জুরী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কাউন্সিলের সদস্যদের বেতন মেটাত রাষ্ট্র—এটি ছিল এথেনিয়ান গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সবার উপরে, এথেন্সের গণতন্ত্র চালাত রাস্তার মানুষ। এথেন্সের বেশির ভাগ মানুষ ছিল কৃষক, কারিগর কিংবা ব্যবসায়ী। এদের মাঝ থেকে জুরী কিংবা কাউন্সিলের সদস্যপদের জন্যে লোক নির্বাচন করা হতো। শুধু দশজন সেনাপতি যেমন সিমন বা পেরিক্লিস, ধনবান পরিবারের মানুষ এরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন।

পেরিক্লিসের সময় লোকে প্রকৃত অর্থেই অনুধাবন করত তারা সরকারের অংশ। কারণ যে কেউ অ্যাসেম্বলির কাছে প্রস্তাব রাখতে পারত। তার প্রস্তাব জনপ্রিয়তা পেলে অ্যাসেম্বলি তা গ্রহণ করত। এই অংশীদারিত্ব এথেনিয়ান পদ্ধতিকে কাজ করতে সাহায্য করে।

মৃত্যুর এক বছর আগে পেরিক্লিস একটি বক্তৃতা দেন যা লিখে গেছেন ওই সময়ের গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইডস। তিনি উল্লেখ করেছেন, বিচার সবার জন্যে

সমান হওয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ করা যাবে না। লোকে ন্যায় বিচার পেত বলে আইন অমান্য করত না।

তুলনামূলকভাবে এথেনিয়ানরা ভাল সময় কাটালেও করদ রাজ্যগুলো অবাধ্য হয়ে উঠছিল। কেউ কেউ কর দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, অন্যেরা সরকারের নতুন ধ্যান ধারণাকে পছন্দ করতে পারছিল না। এথেন্স যখন স্পার্টার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (এ যুদ্ধের নাম পেলো পনেশিয়ান যুদ্ধ, ৪৩১–৪২১ খ্রী. পূ.) কিছু রাজ্য এথেন্সকে সমর্থন দেয় নি।

খ্রী. পূ. ৪২৯–এ ভয়ঙ্কর প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এথেন্সে, মারা যায় দশ লাখ মানুষ। এ হতভাগ্যদের একজন পেরিক্লিস, যিনি ত্রিশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন (৪৬১–৪২৯ খ্রী. পূ.)।

পেরিক্লিসের মৃত্যুর পরে গ্রীসের ইতিহাসে ফিরে যাবার আগে একবার চোখ ফেরাব এথেনিয়ানরা কিরকম জীবন যাপন করত, সেদিকে।

জেরেক্সেসের ধ্বংসযজ্ঞের পরে এথেন্সকে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়। নগর ও বন্দরের চারিদিকে ঘন পাথরের দেয়াল তোলা হয়, কয়েকটি দেয়াল পেরিক্লিস নিজেই নির্মাণ করেছেন। এথেনি দেবীর জন্যে নতুন মন্দির স্থাপন করা হয় পার্থেনন নামে, অ্যাক্রোপলিসে– এর ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে। অ্যাক্রোপলিসের একটি ঢালে একটি প্রকাণ্ড খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল দেবতা ডাইওনিসাসের নামে। এর চারিদিকে বৃত্তাকারে বসার আসন ছিল, আর গান-বাজনার জন্যে ছিল ফোরষ্টেজ। এই মঞ্চের অনেকখানি অংশ এখনো রয়ে গেছে।

এথেন্সের সাধারণ ঘরবাড়ি তৈরি করা হতো ইট আর প্লাষ্টার দিয়ে। যার বেশি টাকা থাকত সে তত বড় বাড়ি বানাতে পারত, তবে সকল ঘরবাড়ির গঠন প্রকৃতি ছিল একই রকম। এথেনিয়ানরা সবাই একই রকমের আসবাব ব্যবহার করত। বড় লোকেরা এথেন্স থেকে অল্প কয়েক মাইল দূরে, বড় গ্রামে থাকতেন।

এথেনিয়ানদের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত পাবলিক বিল্ডিং এবং রাস্তায় রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে গালগল্পে। কোন একটি দিনে একজন নাগরিক কাউন্সিলে বসতে পারলে সে জুরীর সদস্য হতে পারত। এরকম সদস্য সংখ্যা ছিল শ দুয়েক। এ ছাড়া আগোরা বা খোলা বাজারেও গল্পগুজবে সময় কাটাত এথেনীয়রা।

এথেনিয়ানরা খুব স্বাস্থ্য সচেতন ছিল। তাই লোকে রুটি, পনির ছাড়া কিছু খেত না। তারপরে খেলার মাঠ কিংবা ব্যায়ামাগারে গিয়ে এক/দুই ঘন্টা ব্যায়াম করত, খেলাধুলা করত।

গণ স্নানাগার, খেলার মাঠ, পাবলিক বিল্ডিং ইত্যাদি ছিল সবার জন্যে উন্মুক্ত। ফলে এথেনীয়দের পরস্পরের সঙ্গে মুক্তভাবে মেলামেশার সুযোগ থাকত। তারা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ভুলেই মেলামেশা করত এসব জায়গায়।

এথেনিয়ানরা পেট পুরে খেত সন্ধ্যাবেলায়। ধনীরা ভোজের আয়োজন করতেন। যে যত পারে খেত, পান করত। কেউ মানা করত না।

পেরিক্লিসের চোখে এথেনীয়রা ছিল সৌন্দর্যের পূজারী, তবে 'সরল রুচির মানুষ' জ্ঞান প্রেমী এবং শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী।' তিনি ওই সময়ের গ্রীসের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফিডিয়াস ছিলেন শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর, পরবর্তীতে প্রাক্সিটেলেসও তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা পার্থেননে অসাধারণ সব স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। এর কিছু ভাস্কর্য লর্ড এলগিন উনিশ শতকে ব্রিটেনে নিয়ে যান। ব্রিটিশ জাদুঘরে ওগুলো এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। অলিম্পিয়ান জিউসের বিখ্যাত মূর্তিটিও বানিয়েছেন ফিডিয়াস।

এথেন্সে আরো অসাধারণ সব শিল্পী ছিলেন। মাইনর তৈরি করেন ডিসকোবোলাসের বিখ্যাত মূর্তি যা অনেকেই মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গ্রীক ইমারতগুলো ডিজাইন ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। উদাহরণ হিসেবে পার্থেননের কথা বলা যায় যা ছিল একটি নিখুঁত সৃষ্টি। মন্দিরের প্রতিটি অংশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন সবগুলো একই সুরে গাঁথা।

গ্রীকরা ডাইওনিসাসের মঞ্চে নাটক উপভোগ করত। এ সময়ে চমৎকার সব নাটক রচনা করা হয়েছে; এগুলো এখনো মূল গ্রীক ও অনুবাদে মঞ্চস্থ করা হয়। তিন এথেনীয় নাট্যকার ছিলেন সবাইকে ছাড়িয়ে ঃ সফোক্লিস, ইজকিলাস ও ইউরিপাইদিস। এরা নাটকের কাহিনী বেছে নিতেন মূলতঃ গ্রীক কিংবদন্তী থেকে। আর প্রতিটি নাটকেই একটি সদুপদেশ বা মোরাল থাকত যা দর্শক বুঝতে পারত সহজেই। বেশিরভাগ কাজ ছিল করুণ রসের, তবে এথেনীয়দের জন্যে অনেকে হাস্যরসাত্মক নাটকও লিখেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অ্যারিস্টোফেনিস, ইনি পেরিক্লিসের মৃত্যুর পরে তার সেরা লেখাগুলো রচনা করেন। এর মধ্যে একটি ছিল লিসিসট্রাটা, এই কাহিনীতে দেখা যায় এথেন্সের নারীরা একের পর এক যুদ্ধে বিরক্ত হয়ে তাদের স্বামীদেরকে সাফ বলে দেয় স্বামীরা মারামারি, সংঘাত না বন্ধ করলে তাদেরকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেয়া হবে না। খুবই হাসির সংলাপ সমৃদ্ধ এ নাটকটি আজও মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে।

চীনাদের মত গ্রীকদেরও চিন্তাবিদদের নিজস্ব স্কুল ছিল। তাদের সেরা দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম সক্রেটিস। পেরিক্লিসের সময় বাস করতেন তিনি। তার দার্শনিক চিন্তাধারার কথা শোনার জন্যে সবসময় ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকত। তিনি জীবনের উদ্দেশ্য ও যথার্থ সরকার ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতেন। পেরিক্লিস প্রায়ই সক্রেটিসের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন এবং গ্রীক দার্শনিকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাখঢাক না করে কোন মন্তব্য করলেও কিছু মনে করতেন না। কিন্তু মহান নেতাটির মৃত্যুর পরে সরকার পক্ষের অন্যদের প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়

সক্রেটিসকে। তারা সক্রেটিসের চিন্তা চেতনাকে বিধ্বংসী আখ্যায়িত করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং হেমলক পানে বাধ্য করে হত্যা করে।

সক্রেটিসের সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন প্লেটো, (৪২৭-৪৭ খ্রী. পূ.) 'রিপাবলিক' গ্রন্থের জনক। এ বইতে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঠিক নির্দেশনা, যথার্থ মানব সমাজ এবং সাধারণ আচার আচরণের ব্যাপারে প্লেটোর মতামত স্থান পেয়েছে। প্লেটোও এক প্রতিভাবান ছাত্র পেয়েছিলেন অ্যারিষ্টোটল নামে (৩৮৪-৩২২ খ্রী. পূ.)। তাঁর সময়ে মেসিডোনিয়ার পুত্র আলেকজান্ডার ছিলেন তার ছাত্র।

পেরিক্লিসের রাজত্বকালে গ্রীস উপহার পেয়েছিল অসাধারণ একটি সরকার ব্যবস্থা, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান। কিন্তু এই চমৎকার যুগের অবসান ঘটে পেরিক্লিসের মৃত্যুর পরে। স্পার্টার সাথে দ্বিতীয় পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং এ যুদ্ধ পরবর্তী শতক পর্যন্ত গড়ায়। শুধু মাঝে মাঝে শান্তির জন্যে স্বল্পকালীন বিরতি হয়েছিল।

বেশিরভাগ রাজ্য সমর্থন জানিয়েছিল স্পার্টাকে, যার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, কিন্তু এথেন্সের হাতে তখনো বিখ্যাত নৌবহর ছিল। শুরুতে স্পার্টা ডাঙ্গায় আর এথেন্স জলযুদ্ধে জয় লাভ করে চলছিল। তবে খ্রী. পূ. ৪২১-এর দিকে দু'পক্ষেই ভীষণ লড়াইয়ের পরে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে শান্তিচুক্তি করে।

খ্রী. পূ. ৪১৫ তে আবার শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ, ৪০৫ খ্রী. পূর্ব নাগাদ এথেনিয়ানরা স্পার্টানদেরকে আর্গিনুসাতে পরাজিত করে। বছর না ঘুরতেই স্পার্টা তাদেরকে ইগোস পটামিতে গুঁড়িয়ে দেয় এবং এথেনীয়রা স্পার্টান সেনাপতি লিসাবারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এ পরাজয় গ্রীসে এথেনীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়।

নতুন সাম্রাজ্যে এথেনীয়দের চাইতে গ্রীকরা অনেক বেশি কঠোরভাবে শাসন চালাতে থাকে। যে সব রাষ্ট্র গ্রীকদের পক্ষ নিয়েছিল তারা এ জন্যে শীঘ্রি অনুতাপ করতে থাকে। এদিকে পার্সিয়ানরা, যারা গ্রীসে আবার ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছিল, তারা কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে পরস্পরের সাথে বিবাদ বাধিয়ে দেয়। এমনকি পারস্যের প্রাচীনতম শত্রু এথেন্সও তাদের সাথে মিলে স্পার্টানদের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে। এক এথেনীয় অ্যাডমিরাল পারস্য নৌ বহরকে নেতৃত্ব দেন।

তবে এথেন্স স্পার্টার জন্যে আর কোন হুমকি ছিল না; হুমকি হয়ে দেখা দেয় থিবস। তারা গ্রীসে কর্তৃত্ব করার জন্যে স্পার্টানদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখায়। থেবান সেনাপতি ইপামিনোনডাস স্পার্টানদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালনা করেন এবং লিউকট্রার যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। তবে থিবসের দুর্ভাগ্য, সেনাপতি মারা যান।

গ্রীসে যখন আন্তঃরাজ্য লড়াই আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল ওই সময় মেইনল্যান্ডের একটি রাজ্য আগ্রহ নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল, অপেক্ষায় ছিল

কখন এবং কোন্ দিকে যাত্রা করবে। এ রাজ্যের নাম মেসিডোনিয়া, রাজা অসমসাহসী ফিলিপ। তিনি সঠিক মুহূর্তে গ্রীসে হামলা চালান এবং চেরোনিয়ার যুদ্ধে (খ্রী. পূ. ৩৩৮) পরাজিত করেন সম্মিলিত বাহিনীকে। গোটা গ্রীস চলে আসে তার হাতের মুঠোয়।

গ্রীকদের তুলনায় মেসিডোনিয়া ছিল একটি প্রায়-বর্বর রাজ্য; এরা কিছু গ্রীক চিন্তাচেতনা ধার করে চলত তবে স্বৈরতন্ত্রী ছিল। খ্রী. পূ. ৩৫৯ থেকে ৩৩৬ পর্যন্ত গ্রীসের রাজা ছিলেন ফিলিপ, তাঁর যৌবন কেটেছে থিবসে এবং গ্রীক সংস্কৃতিকে তিনি পছন্দ করতেন। দেশ জয় করতে চাইলেও গ্রীকদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেয়ার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি এই ভালবাসা পিতার সূত্রে পুত্র আলেকজান্ডারও পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সকল শত্রু দমন করে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন।

চেরোনিয়ার পরে ফিলিপ এশিয়া মাইনরে ঢুকে পারস্যে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু অভিযান পরিচালনার আগেই এক সভাসদের হাতে তিনি খুন হয়ে যান। বলা হয় ওই সভাসদ পারস্য সম্রাটের টাকা খেয়ে হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছিল। ফিলিপের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র আলেকজান্ডার। মেসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ কালে তাঁর বয়স একুশও পূর্ণ হয়নি। শাসনভার গ্রহণ করার পরে, পরবর্তী তের বছরে তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ দখল করে ফেলেন। তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যান আলেকজান্ডার। ততদিনে সুবিশাল এক সাম্রাজ্য দখল করে গেছেন তিনি। জুলিয়াস সিজার, প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান নাকি চৌত্রিশ বছর বয়সে স্পেনের এক মন্দিরে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, এ বয়সে আলেকজান্ডার ছিলেন পৃথিবীর প্রভু। আর আমি কিছুই অর্জন করতে পারিনি।

চেরোনিয়ার যুদ্ধে আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়ান সৈন্যদলের একটি অংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, একজন যোগ্য, সাহসী নেতা হিসেবে নিজেদের দক্ষতা তিনি প্রমাণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, কঠিন ও বীর্যবান। সিজারের মত তিনিও সৈন্যদের সাথে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে চলতেন এবং সৈন্যদেরকে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিতেন। ফলে সকলের আনুগত্য ও ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। তবে মেজাজ চড়ে গেলে তার মত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন মানুষ দ্বিতীয়টি ছিল না।

বাবার কোষাগারে প্রচুর সোনা পেয়েছিলেন আলেকজান্ডার এবং শক্তিশালী একটি সেনাদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এরা দারুণ সব যুদ্ধকৌশল জানত। এ দুটি সম্পদ নিয়ে তিনি দুনিয়া শাসন করতে বেরিয়ে পড়েন এবং তের বছরের মধ্যে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হন।

আলেকজান্ডার যে সব দেশ দখল করেছিলেন তার মধ্যে ছিল : এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিনিশিয়া এবং মিশর, এখানে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগর নির্মাণ করেন। এরপরে তিনি রওনা হন টায়ারের পথে, ওখান থেকে মেসোপটেমিয়া। আরবেলায়, কিংস হাইওয়েতে তিনি পারস্যের তৃতীয় দারিউসকে গুঁড়িয়ে দেন। দখল করেন পারস্যের সিংহাসন এবং নিজের কর্মচারীদেরকে পারস্যের সবচেয়ে উঁচু পদে বসিয়ে দেন।

সুসা থেকে আলেকজান্ডার অগ্রসর হন পার্সেপোলিসের দিকে, তারপর ফিরে আসেন; আবার যাত্রা করেন উত্তর অভিমুখে, ইকটাবানায়, ওখানে পরাজিত করেন পার্থিয়ানদেরকে। তিনি পশ্চিম ভারতের পাহাড়ি সীমান্ত পার হয়ে চলে আসেন সিন্ধু উপত্যকায়। গঙ্গা নদীর তীরে যাবার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল এবং সম্ভবতঃ তারপরে চীনা সীমান্তে অগ্রসর হতেন, কিন্তু পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি বাধ্য হন বেবিলনে ফিরে আসতে।

পারস্যবাসীকে খুশি করতে আলেকজান্ডার তাদের রাজকুমারী রোখসানাকে বিয়ে করে গ্রীসে, মেসিডোনিয়া ও পারস্যের সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করেন। তবে গ্রীক বাহিনী ও পার্সিয়ান কর্মকর্তারা পরস্পরকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। গ্রীকরা পারস্যবাসীকে বর্বর আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা করত। আর গ্রীকদের সংস্কৃতি প্রীতি নিয়ে টিটকারি মারত পার্সিয়ানরা।

বেবিলনে থাকাকালীন আলেকজান্ডার ভয়ানক ক্ষত রোগে খ্রী. পূ. ৩২৩-এ মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স মাত্র তেত্রিশ এবং বিশাল এক সাম্রাজ্যের মালিক– যা তার মৃত্যুর পরপরই ভেঙে টুকরো হয়ে যায়।

আলেকজান্ডারের কোন যোগ্য উত্তরসূরি না থাকায় তাঁর সাম্রাজ্য তিন মেসিডোনিয়ান সেনাপতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। টলেমি মিশরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই বাকি সাম্রাজ্য থেকে নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেলুকাস এশীয় অঞ্চল দখল করেন শুধু সিন্ধু নদের পশ্চিম অংশটুকু বাদে। ওখানে ভারতের প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মেসিডোনিয়ান সেনাদলকে পরাভূত করে এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলেন। কাসান্ডার মেসিডোনিয়ার ইউরোপীয় জেলা, গ্রীস ও উপনিবেশগুলো নিজের দখলে নিয়ে নেন।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে গ্রীসের ইতিহাসে শুধুই বিভাজন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর অপর জাতি কর্তৃক পরাভূত হবার করুণ কাহিনী। এরকম দশা চলেছে গ্রীক রাজ্যগুলো রোমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যাবার আগ পর্যন্ত।

# রোমান রিপাবলিক

খ্রী. পূ. ৫০৯ তে রোমানরা টারকুইন দ্য প্রাইড (টারকুইননিয়াস সুপারবাস) ও তার পরিবারকে বহিষ্কার করে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটায়। তারা রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র গঠন করে যা এক বছরের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতেন দুই কনসাল। পরবর্তীতে, কনসালের নিচের অন্যান্য কর্মকর্তারাও এক বারে এক বছরের জন্যে দু'জন করে নির্বাচিত হতেন। প্রীটাররা (প্রাচীন রোমের ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান ও লিগাল অফিসার। কুয়েসটাররা (প্রাচীন রোমের বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, পরে একে সরকারি কোষাধ্যক্ষ করা হয়) সকল কর আদায় করতেন। ঈনিলদের দায়িত্ব ছিল প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তাকারী দিকটা দেখাশোনা। সকলেই আদালতে কম বেশি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন। যে লোক কনসাল হতে চাইত তাকে সবগুলো অফিসের কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হতো।



*রিপাবলিকের চার কর্মকর্তা (বাম থেকে ডানে) প্রিটর, লিকটর, ঈডিল ও কনসাল।*

প্রথম কনসালরা রোমের জন্যে কি করেছেন? টারকুইনদের প্রচুর ধনসম্পদ তারা ভাগ করে দিয়েছেন রোমান গরীবদের মাঝে। শহরের কাছে তাদের জমিজমার রূপান্তর ঘটানো হয়েছে প্রকাণ্ড পাবলিক পার্কে যেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এর নামকরণ করা হয় ক্যাম্পাস মার্টিয়াস।

রোমের মানুষজন মোটেই সুখী ছিল না। প্যাট্রিশিয়ান বা অ্যারিস্টোক্রেটরা গরীবদের জন্যে মোটেই ভাবতেন না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল সিনেটে জায়গা করে নেয়া। সিনেটে বসতে পারলে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া যেত। অনেকেরই নাগালের বাইরে ছিল সিনেট।

তাই প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষ দলে দলে শহর ত্যাগ করতে থাকে, নতুন জীবন শুরু করে ইটালির কেন্দ্রীয় সমভূমিতে। এই অপসারণ এমন একটা সময়ে ঘটে যখন রোম একটি ল্যাটিন উপজাতির হুমকির সম্মুখীন। শঙ্কিত হয়ে ওঠেন প্যাট্রিসিয়ানরা। খামারে কারা কাজ করবে যাদের ঘাড়ে পা রেখে তারা বড়লোক

হয়েছেন? কে দালান কোঠা নির্মাণ করবে যাদের কারণে তারা আয়েশী জীবন-যাপন করছেন? আর কেইবা সেনাবাহিনীতে থেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে রোমকে?

পাট্রিশিয়ানরা প্লেবিয়ানদেরকে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করতে থাকেন। বলেন সরকার ও আইন ঢেলে সাজানো হবে। অনিচ্ছাসত্বেও প্লেবিয়ানরা ফিরে আসে বাড়িতে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে পাট্রিশিয়ানদেরকে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে প্যাট্রিশিয়ানরা কি ধরনের সংস্কার করবে তা দেখার জন্যে।

প্লেবিয়ানদেরকে আদালতে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে 'ট্রাইবুনস অব দা পিপল' নামে বিশেষ অফিসারদেরকে গঠন করা হয়। এখানে যে কোন প্লেবিয়ান অন্যায়-অবিচারের বিচার চাইতে পারত। এরপরে প্লেবিয়ানদেরকে উপহার দেয়া হয় একটি যথার্থ লিখিত বৈধ আইন। খ্রী. পূ. ৪৫৪ তে বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয় গ্রীসের আইন পরীক্ষা করে দেখে আসার জন্যে। এ আইনের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন মহান পেরিক্লিস। তিন বছর পরে, সিনেটের কাছে রিপোর্ট পরিবেশন করা হলে রোমের আইন রচনা করা হয় এবং গ্রীক আগোরার মত রোমানদের মূল বাজার বা চত্বর ফোরামে বারটি ব্রোঞ্জের ফলকে ওই আইন প্রকাশিত হয়। আইনের এই বারটি ফলক ছিল রোমান আইনের ভিত্তি এবং পরবর্তীতে অনেক ইউরোপিয়ান জাতি ও বর্তমানের নতুন বিশ্বের দেশগুলোরও লিগাল সিষ্টেম।

তৃতীয় যে কাজটি প্লেবিয়ানদের জন্যে করা হয়েছিল তা হলো তার শহরের সকল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রীটার, কোয়েটর, ঈডিল এমনকি কাউন্সিলের কাছেও তারা যেতে পারত ন্যায় বিচারের জন্যে। এভাবে একসময় তারা সিনেটে বসার সুযোগ পেয়ে যায়। প্লেবিয়ান ও প্যাট্রিশিয়ানদের মধ্যে বিয়েও বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

টারকুইনকে বহিষ্কার করার একশ বছরেরও বেশি সময় পরে রোমকে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো রোমের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সভ্যতার অগ্রসরতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া রোম দখল করার লোভ তো ছিলই। এসব অসংখ্য যুদ্ধের মধ্যে এক বিখ্যাত সেনাপতি উঠে এসেছিলেন রোমের ইতিহাস থেকে। তিনি সিনসিনাটাস।

খ্রী. পূ. ৪৫৮ তে ইকুই একটি রোমান দলকে হতবাক করে দেয় তাদেরকে পরিষ্কার ফাঁদে ফেলে দিয়ে। তবে অল্প ক'জন সৈনিক রাতের অন্ধকারে ফাঁদ থেকে পালিয়ে এসে রোমের সিনেটকে সাবধান করে দেয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। সিনেট থেকে নির্বাচন করা হয় ডেলিগেটদেরকে। এক বয়সী কৃষক, যিনি একজন অভিজ্ঞ সেনাপতিও ছিলেন, তাকে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর নাম লুসিয়াস কুইনটিয়াস সিনসিনাটাস।

শুরুতে সিনসিনাটাস ডেলিগেটদেরকে দেখে বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন। কারণ লাঞ্চের আগে জমিতে লাঙ্গল দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ডেলিগেটদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ফেলতে না পেরে তিনি দেয়াল থেকে একটি পুরানো টোগা (প্রাচীন রোমের নাগরিকদের আলখেল্লা) নিয়ে, গায়ে চড়িয়ে রওনা হয়ে যান শহরের পথে। সিনেট তাকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়। তাকে একনায়ক করা হয় এবং সেনাদল গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়।

একনায়ক রাজার সমান ক্ষমতাধর তবে একটি পার্থক্য ছিল একনায়ক শুধু নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে অফিস ব্যবহার করতে পারতেন। দেশের জাতীয় সমস্যার সময় (বিদেশী শক্তির হুমকি) শুধু একনায়কদের নিয়োগ করা হতো। আর বিপদ কেটে গেল তাদের আর প্রয়োজন হতো না। শুধু জুলিয়াস সিজার ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি সারা জীবনের জন্যে একনায়ক নির্বাচিত হন। তবে দেশের অক্লান্ত সেবার জন্যে তাকে এ সম্মান দেয়া হয়েছিল।

সিনসিনাটাস একটি সেনাদল গঠন করে সমভূমির দিকে অগ্রসর হন যেখানে রোমান সৈন্যরা বন্দী হয়ে ছিল। সন্ধ্যাবেলায় তিনি তার লোকদেরকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইকুইকে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরার নির্দেশ দেন। ভোর বেলায় তিনি হামলা করার হুকুম দেন। ইকুই দেখতে পায় তাদেরকে ঘিরে আছে রোমান সৈন্যরা। তারা আত্মসমপর্ণ করে।

রোমানরা টিবেরের একটি শহর ভিই'র সাথেও বহু বছর যুদ্ধ করেছে। এ শহর দখল করে রেখেছিল একদল ইট্রুসকান প্রজাতি। দীর্ঘদিন দু'পক্ষে লড়াই চলেছে, মাঝে মাঝে শান্তিচুক্তিও হয়েছে, তবে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল দুটি শক্তিশালী নগরী টিবেরের তীরে থাকতে পারে না। একটিকে পিছু হঠতেই হবে।

খ্রী. পূ. ৩৯৬ তে প্রাচীন রোমের আরো একজন নায়ক ভিই শহরের বিরুদ্ধে লড়াই করে নাম কিনেছিলেন। তিনি মার্কাস ফিউরিয়াস কামিল্লাস। ভিই নগরী বহু বছর রোমানদের কব্জায় থাকলেও তারা আত্মসমর্পণ করেনি। অভিযানের জন্যে কামিল্লাসকে একনায়কের ক্ষমতা দেয়া হয়। রোমানরা তাঁর বুদ্ধিতে ভিই নগরীর দেয়ালের বাইরে থেকে কয়েকশ গজ লম্বা গর্ত খুঁড়তে থাকে, শেষ হয় শহরের ভেতরে এসে। ভিইবাসী যখন রোমানদের হামলা থেকে নগরীর প্রাচীর রক্ষা করতে ব্যস্ত ওই সময় গর্ত দিয়ে পিল পিল করে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে আরো রোমান সৈনিক। পেছন থেকে তারা আক্রমণ চালিয়ে বসে ভিইবাসীদেরকে। এরপরে প্রাচীর ধসে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা রোমানরা শহরটি ধ্বংস করে দেয়, নগরবাসীর ভাগ্যে নেমে আসে ক্রীতদাসত্ব। সিনেট জনগণের সামনে কামিল্লাসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

ভিই নগরীর পতনের পরে কামিল্লাস অন্যান্য ইট্রুসকান শহর ও ভূমি দখল করেন। তবে খ্রী. পূ. ৩৯০ তে কামিল্লাসের সঙ্গে সিনেটের বিবাদ শুরু হলে তিনি শহর ছেড়ে নিজের গ্রামে চলে যান।

এরপরে মধ্য ইউরোপ থেকে হাজার হাজার গল ও সেলটিক উপজাতিরা আসতে শুরু করে। বুনো হুনরা এদের ওপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করত। নেতা ব্রেনাসের নেতৃত্বে গলরা আপেনাইন পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে নতুন জমির খোঁজে আসতে থাকে।

এদের আগমনের খবরে আশঙ্কিত হয়ে রোমানরা দূত পাঠিয়ে দেয় কামিল্লাসের কাছে শহর রক্ষার আবেদন জানিয়ে। কিন্তু তিনি আবেদনে সাড়া দেন নি। গলরা রোম নগরীতে ঢুকে লুঠপাট শুরু করে দেয়। যারা জবাই হবার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল তারা সবাই রোমের আশ্রয়স্থল ক্যাপিটেলিন হিল-এ গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওখানে বহুদিন থাকতে হয়েছে তাদেরকে।

এদিকে কামিল্লাস কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান। আবার একনায়কের দায়িত্ব নিয়ে তিনি রোমান ও ল্যাটিনদের সহযোগে একটি বাহিনী গঠন করেন এবং বিধ্বস্ত শহরের দিকে অগ্রসর হন। শহরের বাইরে এসে দেখেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন ব্রেনাস। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে কামিল্লাস সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন তার শত্রুকে এবং গলদেরকে টিবের হয়ে উত্তরে তাড়িয়ে দেন। রোমানরা আর গলদের টিকিটিও দেখতে পায়নি।

কামিল্লাস ফিরে আসেন রোমে এবং ক্যাপিটোলিন হিল এর দুর্গ মুক্ত করেন। তারপর নগর পুনর্গঠনে নেমে পড়েন। মন্দির, স্নানাগার, মিটিং হাউজ, দালানকোঠা সব কিছুই ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিল হুনরা। শুধু দেয়ালগুলো খাড়া হয়ে ছিল। পুনর্গঠনের পুরো দায়িত্ব পালন করেন কামিল্লাস। তাঁর তৈরি অনেক নতুন ইমারত ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, রোমে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দালানগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কামিল্লাস নগরীর ইতিহাস সংক্রান্ত নথিপত্র, ডকুমেন্ট ইত্যাদিও সংরক্ষণ করেছেন; আগেরগুলো গলরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আবার নতুন করে সবকিছু লিখতে হয়েছে। বলা যায়, ওই সময় থেকে রোমের প্রকৃত ইতিহাসের শুরু। কারণ এর আগে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা সবই স্মৃতি এবং কিংবদন্তীর কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে।

কামিল্লাসকে পুনর্গঠন কর্মসূচিতে আরো অনেক কাজ করতে হয়েছে। যেসব ল্যাটিন রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল লীগ থেকে রোমের লুণ্ঠনের খবর শুনে, তাদের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসেছেন কামিল্লাস। খ্রী. পূ. ৩৬৭ এতে শোনা যায়, গলদের নতুন একটা দল টিবের নদীর দিকে আসছে। কামিল্লাস তখন অশীতিপর

বৃদ্ধ হলেও তাকে আবার একনায়ক বানানো হয় গলদেরকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্যে। রোমের উত্তর থেকে অল্প দূরে সমভূমিতে তিনি পরাজিত করেন গলদেরকে। তারপর চলে যান অবসরে প্রতিটি রোমানের প্রচুর সম্মান আর প্রশংসা সঙ্গী করে।

গলদেরকে নিয়ে ভয় চলে গিয়েছিল। তবে সামনিটদের সাথে বেশ কিছু বিপজ্জনক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় রোমকে। এরা খুবই কঠিন আর আগ্রাসী একটি জাতি ছিল। খ্রী. পূ. ৩৪৩-এ রোমানদের সাথে সামনিটদের যুদ্ধ হয়, মাঝখানে কয়েকটি স্বল্প যুদ্ধ বিরতি ছাড়া এ লড়াই চলেছে প্রায় ষাট বছর ধরে। রোমানদের তখন খুব কঠিন সময় গেছে। সামনিটরা যখন একদিক থেকে চাপ প্রয়োগ করছিল, ইট্রুসকান কিংবা বিদ্রোহী ল্যাটিনরা তখন আরেক দিক থেকে হামলা চালাচ্ছিল। বারবার আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে রোমানদেরকে। মাঝে মাঝে পরাজয় স্বীকারও করতে হয়েছে।

তবে তারা কখনো আশা ছেড়ে দেয়নি কারণ জানত রোম হলো ইটালির কেন্দ্রবিন্দু। সামনিটরা অবশেষে বিজয়ী হলে তারা প্রজাতন্ত্রের অংশীদার হতে চেয়েছে কারণ এতে তাদের লাভই ছিল। রোমানরা তাদেরকে শহর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চমৎকার একটি নতুন রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল, নাম আপ্পিয়ান ওয়ে (আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস এ রাস্তার পরিকল্পক)। স্বায়ত্বশাসিত সরকারের সুবিধেও তারা পেয়েছিল, তবে রোমানদের অনুমতি ছাড়া কোন যুদ্ধে তারা জড়াতে পারবে না, এই ছিল শর্ত।

রোমানদের জয় করা আরো অনেক রাষ্ট্রের প্রতিও একই শর্ত প্রযোজ্য ছিল। ইটালিতে সকল শ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে রোমের অংশ হিসেবে ভাবত। রোমান নাগরিক হবার সুবাদে কেউ কেউ বিশেষ সুবিধাও ভোগ করত। এর মানে তারা নিজেদের এলাকায় বসবাস করলেও রোমের অ্যাসেম্বলির মিটিং-এ ভোট দেয়ার সুযোগ পেত।

রোমানরা শীঘ্রি ইটালির দক্ষিণের গ্রীক শহরগুলোর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। রোম সকল শহর দখল করতে চেয়েছিল, তবে কেউ কেউ তাদের নগর-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হারাতে রাজি ছিল না। এদের একজন টারেনটাম শুধু প্রতিরোধই গড়ে তোলেন নি, উত্তর গ্রীসের রাজ্য ইপিরাসের রাজা ফিরাসকে সাহায্যও পাঠিয়েছিলেন। সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফিরাস নিজের ছোট রাজ্যকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মত বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতেন। কাজেই টারেনটামের সাহায্য পেয়ে তিনি ইটালি আক্রমণের সুযোগ মিলেছে ভেবে লাফিয়ে ওঠেন। তিনি ইটালিতে জলপথে পাঠিয়ে দেন পরিবহন জাহাজের প্রকাণ্ড এক নৌবহর এবং স্থলপথে প্রেরণ করেন পঁচিশ হাজার সৈন্যের একটি দলসহ বিরাট এক হাতির পাল।

হেরাক্লিয়ায়, ২৮০ খ্রীষ্টপূর্বে ফিরাস তার সেনাদল নিয়ে শহর থেকে কাছে একটি সুবিধেজনক অবস্থানে চলে আসেন। দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ভয়ঙ্কর

রোমান বাহিনী। সংকেত পাওয়া মাত্র দুটি দল ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পরের ওপরে। রোমানরা আগে কখনো হস্তিবাহিনী দেখে নি। হস্তি বাহিনীকে অগ্রাহ্য করে তারা ভয়ানক যুদ্ধ চালাতে থাকে। তখন ফিরাস বিশালদেহী প্রাণীগুলোকে হুকুম করেন রোমানদেরকে পিষে ফেলতে। ভয়াবহ গর্জন ছেড়ে হস্তিবাহিনী ঢুকে পড়ে রোমান ব্যূহের মধ্যে। পায়ের তলায় পিষে, শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিতে থাকে রোমানদেরকে। আতঙ্কিত রোমান বাহিনী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে।

তবে ফিরাস বিজয়ী হলেও এ জন্যে প্রচুর মাশুল দিতে হয়েছিল। রোমানদের চেয়ে বেশি সৈন্য হারিয়ে ছিলেন তিনি। রোমানদের অপূর্ব যুদ্ধকৌশলে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এরকম একটা সেনাদল থাকলে আমি গোটা বিশ্ব জয় করতে পারতাম।'

ফিরাস ইটালিতেই থেকে যান। তবে শেষপর্যন্ত বেনেভেনটামে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ছত্রভঙ্গ বাহিনী নিয়ে গ্রীসে ফিরতে হয়েছিল তাকে। টারেনটাম ইতিমধ্যে রোমের অংশ হতে বাধ্য হয়।

ফিরাসকে পরাজয় এবং পরবর্তীতে আরো কয়েকটি দ্রুত গতির অভিযানের সাফল্যে রোম ইটালির নেতা হয়ে ওঠে। ফিনিশীয় উপনিবেশ কার্থেজ ভীত হয়ে ওঠে রোমকে নিয়ে। এটি উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং ভূমধ্যসাগর শাসন করত।

কার্থেজের অসংখ্য উপনিবেশ বিস্তৃত ছিল উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের উপকূল জুড়ে। সিসিলি ও সার্ডিনিয়াও তার অধীনে ছিল। স্পেনের উৎকৃষ্ট রূপোর খনি ব্যবহার করত কার্থেজ। ভূমধ্যসাগরের প্রধান বাণিজ্যিক শক্তিও ছিল সে। এই ক্ষমতা হাতে রাখতে কার্থেজিয়ানরা গড়ে তুলেছিল বিশাল এক নৌবহর। ভাড়া করা সৈন্যের একটি প্রকাণ্ড বাহিনীও তার ছিল। এরা টাকার বিনিময়ে লড়াই করত। এই ভাড়া করা সৈন্যদের মধ্যে নিউ মিডিয়ার অশ্বারোহী বাহিনীর লোক, মাজোরকার পাথরের মূর্তি তৈরির কারিগর এবং গলের ধনুর্ধররাও ছিল।

বহু দিন রোমান ও কার্থেজিনিয়ানদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি। কারণ ইটালিতে নিজের রাজ্য পুনর্গঠনে ব্যস্ত ছিল রোম। এ কাজ শেষ হলে তারা কার্থেজিনিয়ানদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর প্রতি নজর দেয়। এতে কার্থেজবাসীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ হয়ে ওঠে অনিবার্য। খ্রী. পূ. ২৬৪তে প্রথম কার্থেজিনিয়ান বা পুনিক যুদ্ধ (২৬৪–২৪১ খ্রী. পূ.) শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ মূলতঃ সমুদ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। রোম শীঘ্র প্রমাণ করে তার ভাল ভাল জাহাজ যেমন আছে, তার জাহাজীরাও তেমন যোদ্ধা হিসেবে কম নয়। লড়াইয়ের শেষের দিকে শত্রুর চেয়ে মজবুত অবস্থানে চলে আসে রোম। কার্থেজকে সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হয় এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হয় প্রচুর টাকা।

খ্রী. পূ. ২১৯ নাগাদ রোম উত্তর ইটালি থেকে গলদের বের করে দেয় এবং এথেন্স পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিজের সাম্রাজ্য। ওই সময় কার্থেজিনিয়ানরা রোমকে আবার হুমকি দিতে শুরু করে। এবার তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হ্যানিবাল নামে এক দুঃসাহসী তরুণ যিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা সেনাপতি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

হ্যানিবালের বাবাও ছিলেন সেনাপতি। তিনি রোমকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখতেন। শপথ নিয়েছিলেন সারা জীবন উৎসর্গ করবেন ইটালিকে ধ্বংসের কাজে। খ্রী. পূ. ২১৯-এ স্পেনের সৈন্যদের সাথে নিয়ে তিনি উত্তরে ইটালির দিকে অগ্রসর হন। তার সঙ্গে ছিল এক লাখ পদাতিক সৈন্য, তেরশ অশ্বারোহী সৈনিক ও চল্লিশটি হাতি। এদের সকলকে জোগাড় করা হয় আফ্রিকা থেকে। হ্যানিবালের পরিকল্পনা ছিল দলটি নিয়ে পিরিনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে, ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক হয়ে আল্পস পর্বত পার হবেন এবং তারপর ঢুকে পড়বেন ইটালির সমভূমিতে।

অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ছিল এটি। বরফাবৃত আল্পস পর্বতমালা পেরুবার সময় তীব্র ঠাণ্ডার কামড়ই শুধু সহ্য করতে হয়নি হ্যানিবালকে, হাতিগুলোকেও হারিয়েছেন তিনি। তবে পরিকল্পনাটি কাজে লেগেছে। খ্রী. পূ. ২১৮র শেষ নাগাদ তিনি ঢুকে পড়েন ইটালিতে। ততদিনে নানা প্রতিকূলতায় সৈন্য সংখ্যা কমে গেলেও হ্যানিবালের সেনাবাহিনীর মনে আশার আগুন নিভে যায়নি। তারা সমৃদ্ধ ও ধনী ইটালি দখল করার স্বপ্ন দেখছিল।

এদিকে সিনেটে হ্যানিবালের অগ্রগতির সমস্ত খবরই পৌঁছে যাচ্ছিল। শুরুতে রোমানরা তরুণ হ্যানিবালকে পাত্তাই দিতে চায়নি। কিন্তু তাকে ইটালির দিকে ক্রমে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই সতর্ক হয়ে যায়। সাথে সাথে দুটি সেনা দল পাঠানো হয় হ্যানিবালকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যে। শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ (২১৮–২০২ খ্রী. পূ.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছিল হ্যানিবালকে, প্রতিটি দলকে পরাজিত করেন টিকিনাস ও ট্রেবিয়ার লড়াইতে। রোমানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক।

পরদিন আবার নতুন বাহিনী পাঠিয়ে দেয় রোম। এক দল সৈন্য অগ্রসর হয় জনপ্রিয় সেনাপতি গাইডস ফ্লমিনিয়াসের নেতৃত্বে। ইনি অ্যাপেনাইন পর্বতমালা থেকে উপকূল পর্যন্ত সোজা একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। যা তার নামে নামকরণ করা হয়– ফ্লামিনিয়ান ওয়ে। হ্যানিবাল লক্ষ করছিলেন সৈন্যবাহিনী রয়েছে লেক ট্রাসিমেনের গিরিখাতের দিকে। তিনি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন পাহাড়ের উতরাইতে।

রোমানরা লেকের মাঝামাঝি আসতেই হ্যানিবাল প্রবেশপথ ও বাইরে বেরুবার রাস্তা বন্ধ করে দেন যাতে শত্রু পিছু হটতে না পারে। একই সাথে তিনি দলের

বাকি সদস্যদেরকে নির্দেশ দেন উতরাই থেকে হামলা চালাতে। তারপর শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ নিধন যজ্ঞ। ফ্লামিনিয়াসকে জবাই করা হয় এবং বাকি রোমানদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

এ এক কালো দিন ছিল রোমানদের জন্যে। বাকি সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এক বয়সী সেনাপতি কুইন্টাস ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাস। খোলা যুদ্ধে প্রধান তিনটি সেনাদল কচুকাটা হয়ে যায়। হ্যানিবালকে তখন যেভাবে হোক পরাভূত করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ফ্যাবিয়াস সিদ্ধান্ত নেন তিনি তার দল নিয়ে হ্যানিবালের দিকে এগিয়ে যাবেন। ভান করবেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন তবে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবেন। তবে এ কৌশলে অবশ্য পরাজিত করা যায় নি হ্যানিবালকে। তিনি ফ্যাবিয়াসের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। ক্লান্ত হয়ে যান। তবে চোর পুলিশের এ খেলায় রোম নতুন বাহিনী গঠনের সময় পেয়ে যায়।

ফ্যাবিয়াসের 'ধীরে চলো' নীতি অনেক রোমানেরই পছন্দ হচ্ছিল না। তারা কার্থেজিনিয়ানদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাইছিল। একদল সিনেটর, পি. টেরেনটিয়াস ভারোর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ দাবি করেন। আশি হাজার পদাতিক ও ছয় হাজার অশ্বারোহীর একটি সেনাদল গঠন করা হয়। প্রথা অনুযায়ী দু'জন সেনাপতি সেনাদলকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে নিযুক্ত হন। একেকজন একেক দিন যুদ্ধ করবেন। এদের একজন সাহসী ও সতর্ক এস. এমিলিয়াস পাল্লাস, অপরজন মাথা গরম ভারো।

হ্যানিবালও যুদ্ধ করার জন্যে ছিলেন উদ্গ্রীব। তিনি কানের সমভূমিতে রোমানদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাল্লাসের ধারণা ছিল তাদের বাহিনী সহজেই ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে কার্থেজিনিয়ানদের। কিন্তু ভারো ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ লড়াইয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। আর ওইদিন ছিল তার নেতৃত্বের দিন। রোমানরা ঝড়ের বেগে এগিয়ে যায় কার্থেজিনিয়ানদের কেন্দ্রস্থলের দিকে। তাদেরকে তেমন বাধা দেয়নি শত্রুপক্ষ। কিন্তু রোমানরা কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়া মাত্র তারা চারিদিক থেকে রোমানদেরকে ঘিরে ফেলে এবং নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে দেয়। সূর্য পাটে বসার আগেই গোটা রোমান দল ধ্বংস হয়ে যায়। কমপক্ষে আশি হাজার যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারিয়েছিল। রোমান রিপাবলিকের প্রতিটি পরিবার অন্ততঃ একজন করে সদস্য হারিয়েছিল। ওই যুদ্ধে মৃতদের মাঝে পাল্লাসও ছিলেন। রোমান ইতিহাসে এতবড় শোচনীয় পরাজয়ের ঘটনা আর নেই।

আশ্চর্য শোনালেও সত্যি, পরাজয়ের ঘন্টাখানেকের মধ্যে রোমের মিত্রপক্ষের কয়েকজন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। এরা কার্থেজিনিয়ানদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা শুনেছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে যাবার সাহস করেনি। তবে হ্যানিবাল রসদের সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের সরকারই তাকে সাহায্য করতে চায়নি। সম্ভবত তার সাফল্যের কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে। তাই

হ্যানিবাল বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করার জন্যে রোমে ঢুকতে পারেন নি। এভাবে রোম রক্ষা পায় ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে।

হ্যানিবাল রোম দখল করতে না পারলেও নতুন রোমান বাহিনী তাঁকে পরাজিতও করতে পারেনি। হ্যানিবালের ভাই হাসড্রুবালকে খ্রী. পূ. ২০৭-এ সেতারাস নদীর তীরের এক রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করেন টি ক্লডিয়াস নীরু। হাসড্রুবাল স্পেন থেকে সৈন্য এনেও যুদ্ধে জিততে পারেন নি। রোমানরা কার্থেজ হামলার পরিকল্পনা করেছে, শহর রক্ষা করতে চলে যান তিনি ইটালি ছেড়ে।

উত্তর আফ্রিকায় ছোটখাট কয়েকটি লড়াইয়ের পরে হ্যানিবাল রোমানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তার ক্লান্ত বাহিনীকে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন রোমান হামলার জন্যে। পি. কর্নেলিয়াস সিপিও নামে সুদর্শন, সাহসী ও প্রতিভাবান এক প্যাট্রিসিয়ানের নেতৃত্বে (যার বাবা টিসিনাসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) রোমানরা আফ্রিকার জ্বলন্ত সূর্যের নিচে আরেকবার হামলা চালায়। সারা দিন লড়াই চালিয়ে গেলেও সাঁঝ বেলায় পালিয়ে যায় কার্থেজিনিয়ানরা। রোমানরা এবারে নুমিডিয়ান অশ্বারোহী সৈনিকদের সহায়তায় জিতে যায় যুদ্ধে।

হ্যানিবাল জানতেন কখন পরাজয় বরণ করে নিতে হয়, তিনি কার্থেজিনিয়ান সরকারকে অনুরোধ করেন রোমানরা শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দিলে তা যেন মেনে নেয়া হয়। প্রস্তাবগুলো অবশ্য কঠিন কিছু ছিল না।

কার্থেজিনিয়ান সরকার তার নিজের অবস্থানে থাকার সুযোগ পায়, তবে উপনিবেশগুলোর আশা ত্যাগ করতে হয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর টাকাও দিতে হয়েছে। রোমের অনুমতি ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না কার্থেজের।

দ্বিতীয় কার্থেজিনিয়ান যুদ্ধে রোমকে প্রচুর মাশুল গুনতে হলেও সে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্পেনের বেশিরভাগ, গোটা সিসিলি এবং ফ্রান্সের কিছু অংশসহ সে ভূমধ্যসাগর শাসন করছিল। খ্রী. পূ. ১৪৬-এ কার্থেজকে ধ্বংস করে দেয়া হয় কাটোর নির্দেশে।

২০২ খ্রী. পূর্বে, কার্থেজের পরাজয়ের পরে নায়ক হয়ে ওঠেন সিপিও। তাকে আখ্যায়িত করা হয় আফ্রিকানাস নামে, রোমে বিজয়ী হিসেবে ফিরে এলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন তিনি।

রোমের পরবর্তী শতকের ইতিহাস তেমন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ছিল না যে ঝড় ঝাপ্টা রোমানদেরকে সহ্য করতে হয়েছিল হ্যানিবালের কারণে।

# ভূমধ্যসাগরে রোমান বিস্তৃতি

কার্থেজের সাথে রোমানদের যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই গ্রীকদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। ও দেশে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে নগর রাষ্ট্রগুলোর মাঝে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের কারণে। এ দ্বন্দ্বে আলোকজান্ডারের সাম্রাজ্যের তিনটি অংশ ছিল প্রধান : মিশর, সেলুসিয়া ও মেসিডন। একেকটি নগর রাষ্ট্র একেকজনের পক্ষ নিচ্ছিল।

ভূমধ্যসাগরের নতুন কর্তৃত্ব নেয়ার পরে রোম তার রাজ্য সীমা বিস্তৃত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, আশপাশের সীমান্তে যুদ্ধ হলে তা নিয়ে মাথা ঘামাত সে। রোমান জনগণ গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে খবর রাখত এবং আরো জানার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। আর এটা সম্ভব ছিল হামলাকারীদের হাত থেকে গ্রীকদেরকে রক্ষা করা এবং অর্থহীন যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়া।



*দুই ভাই টিবেরিয়াস ও গাইয়াস গ্রাচ্চুস।*

মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ সকল গ্রীককে তার অনুগত ভক্ত বানানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি সেলুসিয়ার অ্যান্টিওকাসের সঙ্গে চুক্তি করে নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগি করে নেন। তাদের এই সখ্যতা হুমকির মুখে ঠেলে দেয় রোমান স্বার্থকে এবং সিনেট গ্রীসে টি. কুইনক্টিয়াস ফ্লামিনিয়াসকে সেনাবাহিনী সহ প্রেরণ করেন। ফ্লামিনিয়াস অ্যান্টিগোনিয়া ও সাইনোসেফালেতে দুটি যুদ্ধে মেসিডোনিয়ানদের বিরুদ্ধে জিতে গিয়েছিলেন।

এই বিজয় গ্রীকদেরকে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। কোরিন্থে অনুষ্ঠিত স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় ফ্লামিনিয়াসের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

খ্রী. পূ. ১৯২তে অ্যান্টিওকাস গ্রীস আক্রমণ করেন তবে এম আকিলিয়াস গ্লাব্রিওর কাছে পরাজিত হন। আবার পরাজয় স্বীকার করেন ম্যাগনেসিয়ায় ১৯০তে, আফ্রিকানাসের ভাই এল কর্নেলিয়াস সিপিওর কাছে। সিপিওকে এশিয়াটিকাস নামে

আখ্যায়িত করা হয় কারণ ম্যাগনেসিয়ায় তার বিজয়ের ফলে রোমানরা এশিয়া মাইনরের পাদদেশে একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়– এখানে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে চলছিল।

গ্রীসের সাথে এশিয়া মাইনরের শান্তি বজায় রেখে চলা সহজ কোন কাজ ছিল না আর খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের পুরোটি জুড়ে রোমান বাহিনীকে বারবারই অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে আসা বহিরাগত শত্রুদেরকে ঠেকাতে হয়েছে।

একের পর এক যুদ্ধে জিতে সাম্রাজ্য স্থাপন এক জিনিস। আর সেই সাম্রাজ্য ধরে রেখে ঠিকভাবে চালিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ আলাদা বাপার। এটি রোমানদেরকে শিখতে হয়েছে এবং শিখতে গিয়ে প্রচুর ভুলও তারা করেছে।

তারা যখন গ্রীসকে স্বাধীনতা দেয় একই সময় গ্রীক সংস্কৃতি ওদেশ থেকে তুলে নিয়ে ইটালিতে পাঠিয়ে দিতে চাইছিল। বিখ্যাত ভাস্করদেরকে তাদের কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে রোমের ধনী ব্যক্তিদের বাড়িঘর ও বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ করতে বাধ্য করা হয়। গ্রীক শিক্ষক ও পণ্ডিতরা ক্রীতদাস হয়ে উচ্চবিত্তের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হন। গ্রীক সভ্যতা রোমে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে গ্রীক সংস্কৃতিকে অবশ্য রক্ষা করেছিল রোমানরা, একথা সত্য। তবে ওই সময় তাদের এই কাজ অত্যাচারের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ইটালিতে গ্রীক চিন্তাচেতনার সূত্রপাত রোমানদের চরিত্রে বেশ পরিবর্তন এনে দেয়। হ্যানিবালের সময়ে তাদেরকে কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছে। তারা ছিল হত দরিদ্র। রোমানরা বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত ছিল না যা পূর্ব থেকে বিপুল পরিমাণে আসতে থাকে– নতুন ধরনের খাবার, দামী কাপড় চোপড়, বুনো পশুর প্রদর্শনী এবং গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াইর মত বিনোদনের নতুন মাত্রা, দালান কোঠা নির্মাণের নতুন উপকরণ, তৈজসপত্র, কাঁচ, আসবাব ও মদ। তারা এর আগে কখনোই আরামের জীবন কাটাতে পারেনি, ক্রীতদাসদের দিয়ে খাটাখাটনি করানো দূরের কথা। বিদেশী ক্রীতদাস, আসলে যারা যুদ্ধ বন্দী, তাদেরকে দলে দলে নিয়ে আসা হচ্ছিল রোমে ।

নতুন সম্পদ দেশ ও দশের কাজে লাগানো যেত। কিন্তু মানুষ হয়ে উঠছিল লোভী এবং টাকা পয়সা নিজেদের ভোগে লাগাতে শুরু করে। তারা জমি কিনছিল এবং ক্রীতদাস কিনে তাদেরকে দিয়ে সে জমি চাষও করাচ্ছিল। ধনীরা অনেক রোমানকে টাকা দিয়ে কিনে নেয় ভোটে জেতার জন্যে। রোমে ধনীরা ক্রমে ধনী আর গরীবরা আরো গরীব ও দেনার ভারে জর্জরিত হয়ে উঠছিল। অনেকেরই হাতে কোন কাজ ছিল না।

দুজন মানুষ সমাজের এই বৈষম্য দূর করতে এগিয়ে আসেন। অভিজাত পরিবারে জন্ম নেয়া এই দুই ব্যক্তি হলেন টিবেরিয়াস সেম্প্রোনিয়াস গ্রাচাস ও তার

ভাই গাইউস বা গ্রাচি। খ্রী. পূ. ১৩৩ অব্দে টিবেরিয়াস ট্রিবিউন অব দা পিপল এর নেতা নির্বাচিত হন এবং কৃষকদেরকে জমি দেয়ার কথা বলেন যাতে তারা মুক্তভাবে আবার কাজ করতে পারে। লোভী জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তিনি তা গরীবদের জন্যেও বরাদ্দ করেছেন।

দশ বছর বাদে গাইউস ট্রিবিউন হিসেবে নির্বাচিত হন এবং আরো সংস্কারের মাধ্যমে গরীবদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে দুঃখের বিষয় দুভাই কর্মরত অবস্থায় একদল বিদ্রোহী জনতার হাতে নিহত হয়েছেন। তারা বেশ কিছু ভাল কাজ করলেও সমাজের দুষ্টচক্রকে দূর করতে পারেননি। শত শত মানুষ শুঁড়িখানায় মদ খেয়ে মাতলামি করত, জুয়া খেলত। তারা দস্যুদল গঠন করে ধনী ব্যবসায়ী এবং সিনেটরদের বাড়িতে যেত ডাকাতি করতে, কখনো বা দিনের আলোতেই এ অপকর্ম করত তারা। এই অরাজকতা দূর করার ক্ষমতা সিনেটের ছিল না।

শুধু রোম নয়, নতুন গড়ে ওঠা প্রাদেশিক রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল দুষ্টচক্রের প্রভাব। ওসব প্রদেশ শাসন করতেন লোভী রোমান শাসকগণ। আইন বলে কিছু ছিল না দেশে। সমুদ্র বন্দরে জলদস্যুদের যথেচ্ছ হামলা হচ্ছিল। ইটালিতে রাজপথে ছিনতাই চলছিল।

পরিস্থিতি ক্রমে আরো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল। জার্মান বর্বরদের হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল গোটা ইটালি। দক্ষিণ আল্পসের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এরা। এদের শায়েস্তা করতে গিয়ে রোমানা সৈন্যরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। খ্রী. পূ. ১০৫ অব্দে কিউ সার্ভেলিয়াস সেপিওর নেতৃত্বে পাঠানো সৈন্যদলকে জার্মান বর্বররা সমূলে উৎখাত করে দেয় আরাউসিওতে। সত্তর হাজার মানুষ খুন হয়েছে। শূন্য হাতে সেপিও রোমে ফিরে এলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

খ্রীঃ পূঃ ১০৪ এ রোমের সেরা সন্তানদের একজন কনসাল হিসেবে নিযুক্ত হন। ইনি গাইয়াস মারিয়াস, এক খামার শ্রমিকের ছেলে যিনি সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন এবং জুগুরথা নামে উত্তর আফ্রিকার এক ভয়ঙ্কর রাজাকে পরাজিত করেন। জুগুরথা রোমের জন্যে মাথা ব্যথার কারণ ছিলেন।

মারিয়াস প্রতিশ্রুতি দেন জার্মান বর্বরদেরকে শায়েস্তা করবেন। অভিযান শুরুর আগে তিনি কঠিন একদল সৈন্য গঠন করেন নিয়মিত বেতনের ভিত্তিতে। রোমের ইতিহাসে এরাই ছিল প্রথম পেশাদার সৈনিক। এর আগে সৈন্যরা যুদ্ধ জিতলে শুধু পুরস্কার পেত। এই সেনাদল প্রস্তুত হতে তিন বছর সময় নেয় এবং তারা কতটা উন্নতি করছে তা দেখার জন্যে মারিয়াসকে প্রতিবছর কনসাল নির্বাচিত করা হয়েছে। তাকে পপুলার পার্টি ভোট দিয়ে কনসাল বানাত। কারণ ঘুষ দেয়ার মত

পয়সা ছিল না মারিয়াসের। বরং প্যাট্রিশিয়ানদের অলস জীবন যাত্রার সমালোচনা করে তিনি তাদের বিরাগভাজন হয়ে উঠছিলেন।

খ্রী. পূ. ১০২ তে মারিয়াস উত্তর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, আকুয়া সেক্সটিয়াতে মুখোমুখি হন বর্বর জার্মানদের। তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন মারিয়াস। এক বছর বাদে তিনি আরেক দল নিয়ে যান ভার্সেইলে। সেখানে আরেক দফা বর্বর জার্মানদেরকে পরাস্ত করলে তারা ঝাড়ে বংশে উৎখাত হয়। রোমে ফিরে আসার পরে ষষ্ঠ বারের মত কনসাল নির্বাচিত করা হয় মারিয়াসকে। সিপিও আফ্রিকানাসের পরে তিনি একমাত্র সেনাধ্যক্ষ যিনি বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি পপুলার পার্টির সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে সিনেটের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন। তবে রাজনীতিবিদ হিসেবে অতটা ঝানু ছিলেন না মারিয়াস। প্লেবিয়ান আর প্যাট্রিশিয়ানদের মধ্যে অবিরাম লড়াই তিনি থামাতে পারেননি অত্যন্ত দক্ষ একজন সেনাধ্যক্ষ হয়েও। বরং প্যাট্রিশিয়ান সেনাপতি এল কর্নেলিয়াস সুল্লার সঙ্গে মারিয়াসের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। এর সঙ্গে মরিয়াস আফ্রিকায় এক সাথে কাজ করেছেন।

সুল্লাকে সিনেট রোমান বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলে খুবই নাখোশ হন মারিয়াস। সুল্লাকে পাঠানো হয় পুবে, পোন্টাসের মিথ্রাডেটসকে মোকাবিলা করার জন্যে। ইনি এশিয়া মাইনরে হামলা চালিয়ে গ্রীসে লুণ্ঠন শুরু করেছিলেন। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সুল্লা তার বাহিনী নিয়ে রোমে ঢুকে পড়েন। জীবনে ওই প্রথম রোমান বাহিনী রোমের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সিনেট সুল্লাকে স্বাগতম জানায় এবং আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা দেয় তার হাতে। মারিয়াসকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে মারিয়াস পালিয়ে যান উত্তর আফ্রিকায়। সুল্লা গ্রীসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

খ্রী. পূ. ৮৭-৮৩, এ পাঁচ বছরে সুল্লা মিথ্রাডেটসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। লুণ্ঠন করে প্রচুর ধন-সম্পদও পেয়েছিলেন। রোমে ফেরার আগে তিনি প্রদেশগুলোর সরকার পুনর্গঠন করেন এবং বহুবছর ধরে অদেয় খাজনা আদায় করেন। পুবের ভার বিশ্বস্ত লোকদের হাতে দিয়ে তিনি খ্রী. পূ. ৮৩তে ইটালিতে যাত্রা করেন এবং জাহাজ নিয়ে চলে আসেন ব্রুনাডিসিয়ামে। এদিকে মারিয়াস ৮৬ খ্রীঃপূর্বে রোমে ফিরে এলে তাকে সপ্তমবারের মত কনসাল নির্বাচন করা হয়। তবে দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন বাদে তিনি মারা যান। তার ছেলে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও সুল্লার সুসংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারেনি। ফলে রোমে প্রবেশ করতে সুল্লার কোন সমস্যাই হয়নি। মারিয়াস এবং তার ছেলেকে যারা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সুল্লা তার সাফল্য উদ্‌যাপন করেন। রীতিমত তালিকা প্রচার করেছিলেন তিনি এজন্যে। শুধু

তাই নয়, পাঁচ হাজারেরও বেশি সিনেটর, নাইট (এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী), সওদাগর এবং সাধারণ লোকজনের জমিজমা, সহায় সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুল্লা এরপরে রোমে সরকার গড়ে তোলেন নতুনভাবে। নিজেকে একনায়ক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তিনি সিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং জনগণের অধিকার খর্ব করেন। এমনকি পবিত্র ট্রিবিউনের ক্ষমতাও হ্রাস করা হয়। সরকার পুনর্গঠনের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সুল্লা অফিস থেকে অবসর নিয়ে ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেন। তিনি মারা যান খ্রী. পূ. ৭৮-এ। অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ সুল্লার পুনর্গঠিত সরকার বেশিদিন কাজ চালাতে পারেনি। সিনেট নতুন ক্ষমতাকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। উঁচু মহলে দুর্নীতি চলতে থাকে অবিরাম। বেশ কিছুদিন এমন কোন নেতা দেখা যায়নি যে কমান্ডার এল লিসিনাস লুকাল্লাসকে সমর্থন দেবে। দক্ষ সেনাপতি হলেও তাঁর বাহিনী তাঁকে পছন্দ করত না। সিনেট তাকে পুবে পাঠিয়েছিল মিথ্রাডেটস আবার যুদ্ধ ঘোষণা করলে। তিনি পন্টাইন রাজাকে এশিয়ায় বিতাড়িত করেন তবে খ্রী. পূ. ৭২-এ টিগ্রানেসেরটায় বড় ধরনের বিজয় অর্জিত হবার পরে লুকাল্লাসের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। তাকে রোমে ডেকে পাঠানো হয় এবং তার জায়গায় আসেন সুল্লার প্রিয় এক সেনাপতি নিয়াস পম্পেয়াস (পম্পেই)। পম্পেই সহজেই পরাজিত করেন মিথ্রাডেটসকে এবং একই সাথে রাজ্যের সাথে যোগ করেন চারটি নতুন প্রদেশ। রোমে ফিরে এলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সেনাবাহিনীর সর্বদা প্রিয় সেনাপতি পম্পেই তার বিজয়ী বাহিনীকে উপনিবেশে থিতু করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সিনেট তার অনুরোধ রক্ষা করেনি। বরং তার ক্ষমতা শঙ্কিত করে তোলে সিনেটকে এবং ভীত হয়ে ওঠে মারিয়াসের মত পম্পেই একদিন হুমকি হয়ে উঠবেন ভেবে।

তবে পম্পেইকে নিয়ে ভীত হবার দরকার ছিল না সিনেটের। কারণ রাজনীতি মাথায় ঢুকত না তার, বিরাট কোন উদ্দেশ্যও তার ছিল না।

তবে সিনেটের একজনকে নিয়ে ভীত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল যিনি শুধু ক্ষমতায়ই আসেননি, রোমের সংবিধানও বদলে দিয়েছিলেন, তিনি গাইয়াস জুলিয়াস সিজার (১০০-৪৪ খ্রী. পূ.)। বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– সিজারের সময়ের আগে এবং পরে।

# পার্থিয়া

সতের অধ্যায়ে আমরা বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য কিভাবে দুর্বল হতে শুরু করল এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিজয়ের পরে কি পরিবর্তন এসেছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পার্থিয়ার আরসাকিড রাজারা তাদের প্রাক্তন প্রভুদের বিশাল সব জমি দখল করে নেন। পার্থিয়ার প্রথম মিথ্রাডেটস মেসোপেটেমিয়া আক্রমণ করেন এবং সেলুসিয়ায়, টাইগ্রীস নদীর ধারে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। টেসিফোন ও ইকটাবানা নামে আরো দুটি নগরী বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করে। মিথ্রাডেটসের মৃত্যুর সময় তার সাম্রাজ্য বাকট্রিয়া থেকে সিরিয়া এবং কাসপিয়ান সাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।



*পার্থিয়ান তীরন্দাজরা চলন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেও তীর ছুঁড়তে পারত বলে এদেরকে পরাজিত করা কারো সাধ্য ছিল না।*

পার্থিয়ানরা শক্তিশালী হলেও তাদের মাঝে সভ্য মানুষের সাথে যোগাযোগ করার উদ্যোগের অভাব ছিল। তারা নিজেদের নথিপত্র সংরক্ষণ করে রাখেনি, এদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় সবই বাইরের সূত্র থেকে। অন্যান্য সভ্যতার মত

পার্থিয়ানদেরকেও ধনী জমিদারদের লোভের শিকার হতে হয়েছে। জমিদাররা বিপুল পরিমাণে গরীব কৃষকদেরকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করত।

মেসোপটেমিয়া দখলের পরে আর অন্য দেশে হামলার চিন্তা না করে বুদ্ধিমানের মত নিজের দেশের উন্নয়নের প্রতি নজর দিয়েছিলেন মিথ্রাডেটস। তার এই নীতি দ্বিতীয় মিথ্রাডেটসও অনুসরণ করেন। পরবর্তী তিনটি শতকে পার্থিয়া সীমান্তবর্তী সকল চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবিলা করেছে। এর মধ্যে রোমের কাছ থেকে সবচে' বড় হুমকি এসেছিল।

খ্রী. পূ. ৯১ তে দ্বিতীয় মিথ্রাডেটসের প্রথম রোমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, ওই সময় এশিয়া মাইনরের রাজ্য সিলিসিয়ার গভর্নর ছিলেন এল কর্নেলিয়াস সুল্লা। পার্থিয়ান ডেলিগেটরা সুল্লার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রোমানরা প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রটিকে নিয়ে শঙ্কিত ছিল। তাই পরবর্তী সত্তর বছরে পার্থিয়ার সঙ্গে রোমের বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খ্রী. পূ. ৫৪তে এম লিসিনাস ক্র্যাসাস নামে প্রথম ট্রায়ামভিরেটের সদস্য রোম থেকে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় ঢুকে পড়েন। পার্থিয়ানদের সাথে উত্তর মেসোপটেমিয়ার কারহায়েতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবে এ যুদ্ধে পার্থিয়ানরা জয়ী হয় এবং ক্র্যাসাসের সৈন্যরা সকলে খুন হয়ে যায়। পার্থিয়ানরা ছিল দুনিয়ার সেরা ধনুর্বিদ। তারা সাধারণত ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত এবং ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ ছিল। এ যুদ্ধে ক্র্যাসাসের শিরচ্ছেদ করে কাটা মুণ্ড সোনায় মুড়ে প্রধান ফটকের ওপরে ঝুলিয়ে রাখেন পার্থিয়ান রাজা। রোমান সেনাপতিটির সোনার প্রতি লোভ ছিল বলে এ কাজ করা হয়।

বিশ বছর বাদে দ্বিতীয় ট্রায়ামভিরেটের সদস্য মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস ক্রাসাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হন। বরং নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান পার্থিয়ানদের সাথে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। অবশেষে ২০ খ্রীষ্টপূর্বে রোমান সম্রাট অগাষ্টাস পার্থিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি করেন যা বজায় ছিল পরবর্তী প্রায় আশি বছর। একজন মাত্র রোমান সেনাপতি পার্থিয়ানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পেরেছিলেন, তিনি সম্রাট ট্রাজান। ইনি ট্রাইগ্রিস নদীর তীরে পার্থিয়ানদের বিখ্যাত শহর টেসিফোন দখল করেন। তার উত্তরসুরি হাড্রিয়ান অবশ্য এ এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যান শান্তিচুক্তির কারণে।

পূর্বের বিশাল বাণিজ্যিক রাস্তা চলে গিয়েছিল পার্থিয়ার ওপর দিয়ে। চীনের বিখ্যাত সিল্করুট এশিয়া মাইনরে চলে গিয়েছিল পার্থিয়ার ওপর দিয়ে। প্রায় এক হাজার মাইল বিস্তৃত ছিল এ রুট। এ রাস্তা দিয়ে ক্যারাভানে করে পার্থিয়ান ব্যাবাসায়ীরা সিল্ক বা মখমল নিয়ে যেত বড়লোকদের জন্য। বড় লোকরা সিল্কের পোশাক পরতেন এবং সিল্কের আসবাব ব্যবহার করতেন। ব্যবসায়ীরা মুক্তো,

মসলা ও দামী রত্ন আনত ভারত থেকে। চীনের সাথে পার্থিয়ানদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল।

পার্থিয়ানদের কারিগরী উন্নয়নের তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা প্রাচীন পারস্যের আদলে ঘরবাড়ি তৈরি করত, নকল করত আসিয়ান কিংবা বেবিলোনিয়ান মডেল। তাদের স্থাপত্য ভাস্কর্যের বেশিরভাগই যুদ্ধের ছবি আঁকা।

পার্থিয়ান সাম্রাজ্য করদ রাজ্যগুলোরও তেমন উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। বেশিরভাগ অঞ্চলে পার্থিয়ান রাজারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিতে হয়েছেন ব্যর্থ। রাজার বদলে স্থানীয় জমিদারদের হাতে ক্ষমতা ছিল স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার কারণে।

অল্প ক'জন জমিদারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা থাকার কারণে দেশের কোন উন্নতিই হয়নি। এসব জমিদার পরিবর্তনের নীতিতে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না, বিশেষ করে সেইসব পরিবর্তন যাতে তাদের শক্তি ও ভূমির ওপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এরকম অবস্থাই দীর্ঘ দিন ধরে চলছিল। অবশেষে আরসাকিড রাজাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন নতুন এক রাজবংশ সাসানিড। এরা ছিলেন জন্মগতভাবে পার্সিয়ান।

সাসানিডরা ক্ষমতায় আসার পরে নিকট প্রাচ্য উন্নয়নশীল সভ্যতা হিসেবে সামনে এগোতে শুরু করে। বিরাট ক্ষমতার অধিকারী রোমে এবং উত্তর সীমান্তে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলা বর্বরদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার মত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তারা। পারস্যে সাসানিড সাম্রাজ্য শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব সাসানিডরা কিভাবে সংগঠিত হয়ে আরেক বিশাল সাম্রাজ্য ইসলামের জন্যে পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

# কেলটিক জনগণ

কেলটিক সভ্যতার সঙ্গে মিশে আছে ব্রিটেনের ইতিহাস। কেলটিক সভ্যতা টিকে ছিল ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যান্ড, দ্য আইল অভ ম্যান এবং ব্রিটানিতে আর ইংল্যান্ডে মিশে গিয়েছিল অ্যাংলো স্যাক্সন ও নরম্যান সংস্কৃতির সঙ্গে। কেলটিক ভাষা এখনো চর্চা করা হয় ওয়েলস (Welsh), আয়ারল্যান্ড (Erse), স্কটল্যান্ড (Gaelic) এবং ব্রিটানিতে (Breton)। যদিও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বারবার কেলটিকদেরকে বিতাড়িত করেছে।

কেল্টরা কারা ছিল? এরা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান জনগণ যারা প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ যুগের সময় ইউরোপের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে বসবাস করত। এ এলাকা ছিল পুব ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মাঝামাঝিতে। ইউরোপের পুব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাগৈতিহাসিক কিছু মানুষের চাপে তাদেরকে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারা চলে আসে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে, পূর্ব ফ্রান্স উত্তর স্পেন ও আল্পসের পরে উত্তর ইটালি এবং সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে। ইটালিতে রোমানদের সাথে তারা জড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে এবং খ্রী. পূ. ৩৯০ তে তাদের নেতা ব্রেনাসের সহায়তায় লুঠ করে রোম। এই সময় নানা দিক থেকে তারা রোমানদের সমকক্ষ ছিল, বিশেষ করে লৌহ শিল্পে। তবে তারা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা সামরিক প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তাভাবনা করেনি। রোমানরা আবার এদিক থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল।

কেল্টরা রোম লুঠ করার পরেও রোমানরা ওই শহরেই ছিল এবং জুলিয়াস সিজারের সময়ে তারা গল ও ব্রিটেনে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। সিজার গল জয় করার পরে ব্রিটেনে হামলা চালান। আর রোমানরা যখন ব্রিটেন দখল করে ওই সময় কেল্টদের অধীনে শুধু ছিল স্কটল্যান্ড, দ্যা আইল অভ ম্যান ও আয়ারল্যান্ড।

যেখানেই কেল্টরা গেছে সঙ্গী করেছে নিজেদের সংস্কৃতিকে। রোম ও গ্রীসের সংস্পর্শে আসার ফলে তারা তাদের ডিজাইন করার কৌশল, তৈজসপত্র তৈরি ও ব্রোঞ্জের পাত্র তৈরির কৌশল শিখে নেয়ার সুযোগ পায়। গ্রীক ডিজাইনে বেশিরভাগ থাকত যুদ্ধের দৃশ্য, প্রকৃতির দৃশ্য, বাড়িঘর কিংবা অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রার দৃশ্য। তবে কেল্টরা এদের ডিজাইন নকল করেনি। বরং তারা নানা চমৎকার বিমূর্ত ও গাণিতিক আকৃতির চিত্র অংকন করেছে। ব্রোঞ্জের ব্রুচ কিংবা ঢালে রঙিন এনামেলের প্রলেপ ছিল কেল্টদের বৈশিষ্ট্য। আর জীবনের ছবি আঁকা হলে তা হতো ভৌতিক ও অপার্থিব।

কেল্টরা খুবই যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল। তারা সবচে' সুন্দর বানাত ঢাল, শিরস্ত্রাণসহ যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ। তবে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তারা শত্রুর সাথে লড়াইর বদলে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে বেশি ব্যস্ত থাকত। ফলে ইংরেজদের জন্যে ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড দখল করা সহজ হয়ে ওঠে। কারণ কেল্টরা তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কখনোই একত্রিত হয়ে লড়াই করত না।



*ইন্দো-ইউরোপীয়রা যে পথে ইউরোপে অভিবাসী হয়েছিল।*

অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাবার অভ্যাসের কারণে কেল্টিকরা কখনোই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। উপজাতিদের শাসন করতেন নির্বাচিত সর্দার কিংবা রাজা। তারা পোশাক বদলানোর মতই নেতা পরিবর্তন করত। প্রয়োজনের সময় কোন সর্দার কোন রকম মিত্রকে কাছে পেতেন না।

কেল্টিক সভ্যতা অন্য কোন সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বললেই চলে। কেল্টিক ব্যবসায়ীরা রোম ও ইটালির সাথে ব্যবসা করলেও ভূমধ্যসাগর নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা ছিল না। জুলিয়াস সিজার গল আক্রমণ করার সময় এই লোকগুলোর অদ্ভুত প্রথা দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

কেল্টরা দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। তবে রোমানরা এসে এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা বন্ধ করে। বৈধ প্রথার আইন নিয়ে কেল্টদের কোন চিন্তাভাবনা ছিল না। ধর্মযাজকরা (ড্রুইড) ছিলেন সর্বেসর্বা। তবে কেল্টদের মাঝে অনেক প্রতিভাবান কবি ও গায়ক ছিলেন। ব্রোঞ্জের কাজে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না ইউরোপে।

কেল্টদেরকে রোমানরা বর্বর বলে আখ্যায়িত করলেও আসলে তারা তা ছিল না। জুলিয়াস সিজার অবশ্য সবসময়ই কেল্টদের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। সিজার যখন গল আক্রমণ করেন ওই সময় সব মিলে সত্তর লাখ কেল্ট বাস করত দেশটিতে।

তাদের মধ্যে চাষাভুষোও ছিল যারা পশুপালনেই বেশি ব্যস্ত থাকত চাষাবাদের চেয়ে। ছোট ছোট গ্রামে সম্প্রদায় নিয়ে থাকত। কয়েকটি গ্রাম মিলে তৈরি হতো শহর। জানত কিভাবে রাস্তা ও সেচ নির্মাণ করতে হয়।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সাগর উপকূলের কেল্টরা ছিল জাহাজ বানাতে দক্ষ। নাবিক হিসেবেও তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিল। চামড়া আর কাঠ দিয়ে হাল্‌কা নৌকা বানাত তারা, তাতে কাঠের বৈঠা ব্যবহার করে সহজেই স্বল্প দূরত্ব পার করা যেত। ওক কাঠ দিয়ে সমতল পাটাতনের বড় বড় নৌকাও বানাত তারা উঁচু গলুইসহ। এসব নৌকা আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করেও ভেসে থাকতে পারত। এসব জাহাজে ছিল লোহার চেনে আটকানো লোহার নোঙর। পাল খাটিয়ে কেল্টরা ব্রিটেনে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যেত, ব্যবসা করত। ব্রিট্রিশ কেল্টরাও দক্ষ জাহাজ নির্মাতা ছিল।

জুলিয়াস সিজার গলের যুদ্ধে কেল্টদের যুদ্ধ পোশাক দেখে অবাক বনে যান। তাদের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ, তাতে পশুর শিং লাগানো। বুকে ব্রোঞ্জের ব্রেস্টপ্লেট, তাতে বিচিত্র বিমূর্ত ছবি আঁকা। তারা ট্রাউজারও পরত শীত ঠেকানোর জন্যে। তাদের অস্ত্র ছিল লম্বা তরবারি, তীর ধনুক ও বর্শা। যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করলেও কেল্টদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। যে যার মত যুদ্ধ করে ক্লান্ত বোধ করলে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসত। ফলে এদেরকে পরাজিত করা সহজ ছিল সিজারের জন্যে। শুধু ভার্সিনজেটোরিক্স নামে এক তরুণ সর্দারকে পরাজিত করতে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল তাকে। সিজারের সামনে গলরা টিকতে না পেরে রণেভঙ্গ দেয়। তবে সিজার গলদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। তাদের মত করে তাদেরকে চলতে দিয়েছেন। এতে গলরা সিজারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তারা রোমান জীবন যাত্রাকেও এক পর্যায়ে প্রশংসার চোখে দেখছিল।

# জুলিয়াস সিজার

মারিয়াস জার্মান বর্বরদেরকে পরাজিত করার পরের কয়েক বছর বাদে ভেঙে পড়তে শুরু করে রোমান সাম্রাজ্য। দেশের রক্ষাকর্তাকে (মারিয়াস) পাঠানো হয় নির্বাসনে, কনসাল (সুল্লা) শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন রোমে। সফল সেনাপতি লুকুল্লাসের নিজের দলই বিদেশের মাটিতে অভিযান কালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে তার বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। রোমের উঁচু পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দুর্নীতি এবং বিদেশি প্রদেশগুলোর গভর্ণররা কিভাবে নিজেদের পকেট ভরাবেন সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। রোমের এ অবস্থায় অ্যারিস্টোক্রেটিক রিপাবলিক কোন কাজে আসেনি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও নয়। শুধু স্বৈরতন্ত্রই ছিল একমাত্র জবাব। আর জুলিয়াস সিজারের মাঝে রোম একজন যথার্থ শাসকের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছিল।



*জুলিয়াস সিজার।*

গাইয়াস জুলিয়াস সিজারের জন্ম খ্রী. পূ. ১০০ অব্দে। তিনি ছিলেন লম্বা, ফর্সা, কালো চোখ বিশিষ্ট। তবে খুব কম বয়সে তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করে। টাক ঢাকার জন্যে তিনি মাথার পেছনের চুল উল্টো করে সামনের দিকে আঁচড়াতেন। দুর্দান্ত এক ঘোড়সওয়ার ছিলেন সিজার, হাত শরীরের পেছনে বাঁধা অবস্থাতেও নাকি দুরন্ত বেগে ছুটে চলা ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে থাকতে পারতেন। প্রচণ্ড সহ্যশক্তি ছিল তাঁর, খোলা মাঠে নিদ্রা যেতে পারতেন এবং নিজের সৈন্যদলের সাথে সব রকমের প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে মানিয়ে নিতেন।

সৈন্যদলে তার মত সাহসী মানুষ আর একটিও ছিল না। তাই সৈন্যরা সিজারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করত।

এই অসাধারণ মানুষটি, যাঁকে শেক্সপীয়র বর্ণনা করেছেন, 'সময়ের স্রোতে সবচে মহান মানুষ' বলে, সবসময়ই ছাপিয়ে গেছেন নিজেকে। যে কোন মানুষের চেয়ে প্রতিভাধর ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ, একজন কূটনীতিক, একজন আইনপ্রণেতা, একজন জয়ী, একজন বাগ্মী, একজন কবি, একজন ইতিহাসবিদ, একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং একজন স্থপতি। তিনি পরাজিত শত্রুপক্ষের সাথে অন্য যে কারো চেয়ে সদয় ব্যবহার করতেন।

খ্রী. পূ. ৭০-এ সিজারের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে রোমে। তার জন্ম একটি প্যাট্রিশিয়ান পরিবারে, তিনি বিখ্যাত প্লেবিয়ান সেনাপতি মাটিয়াসের ভাস্তেও ছিলেন সিজার সারা জীবন নিজের শ্রেণীর চেয়ে প্লেজিয়ানদের প্রতি বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সিজার পম্পেইর দলে যোগ দেন। ইনি পন্টাসের মিথ্রাডেটসকে পরাজিত করেছিলেন। ক্রাসাসের সাথেও ছিলেন সিজার। ক্রাসাস ছিলেন রোমের সেরা ধনীদের একজন। সিজার বুঝতে পেরেছিলেন তিনজনে মিলে কাজ করলে তারা যে যার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন; পম্পেই তার সৈন্যদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে তুলে দিতে পারবেন; ক্রাসাস কনসাল নির্বাচিত হয়ে পার্থিয়ায় হামলা চালানোর মত সেনাবাহিনীর সহায়তা পাবেন; সিজার পাবেন কনসালশিপ এবং একটি প্রদেশ যেখানে সেনাপতি হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ থাকবে।

সিজার, পম্পেই ও ক্র্যাসাস ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান, তাদের সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থাকে বলা হতো প্রথম ট্রায়ামভিরেট। এতে ওরা তিনজন শাসন করতেন। খ্রী. পূ. ৬০- এ সিজার কনসাল নির্বাচিত হন এবং গলকে নিজের প্রদেশ হিসেবে বেছে নেন সামরিক বিজয়ের জন্যে।

সিজার নয় বছর কাটিয়েছেন গল ও ব্রিটেনে। এখানে বিশ্বখ্যাত যে কোন সেনাপতির সমান নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। কখনো কখনো সম্মুখ সমরের সৈন্য ব্যূহ ছাড়িয়ে লড়াই করেছেন সিজার এবং ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। দিনে যুদ্ধ করতেন সিজার, রাতে যুদ্ধের বর্ণনা লিখে রাখতেন। এখানে তার হাতে রচিত হয় 'গ্যালিক যুদ্ধে'র আটটি খণ্ড।

খ্রী. পূ. ৪৯-এ সিজার যখন রোমে ফেরার জন্যে প্রস্তুত সেনাপতি হিসেবে সম্মানিত ও প্রশংসিত হবার জন্যে এবং সিনেট পুরস্কৃত করবে এমন স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই সময় সিনেট তাকে জনগণের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে আদালতে ঠেলে দেয়। এর কারণ কি?

সিজারের রোমে অনুপস্থিতি কালে তার বন্ধু পম্পেই, যিনি সিজারের মেয়ে জুলিয়াকে বিয়ে করেছিলেন (জুলিয়া খ্রী. পূ. ৫৪তে মারা যান), ক্রমে সিনেট

রক্ষণশীল সদস্যদের কারণে সিজারের বিরুদ্ধে চলে যান। সিনেট ভয় পাচ্ছিল সিজার প্রজাতন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। পম্পেই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সিনেটের সাথে যোগ দেন। এর ফল তাকে ভোগ করতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে।

সিনেট জুলিয়াস সিজারকে আদেশ করে সেনাবাহিনী ফেলে রেখে একা রোমে ফিরে আসতে, নয়তো তাকে প্রকাশ্যে জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করা হবে।

কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা নিয়ে দারুণ ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন সিজার। ক্যারিয়ারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তিনি কি সিনেটের নির্দেশ মেনে নিয়ে উদ্ভাসিত ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টানবেন? নাকি সুল্লার মত সেনাবাহিনী নিয়ে সোজা ঢুকে পড়বেন রোমে। রুবিকন নদীর উত্তর তীরে দাঁড়িয়ে (এ নদী ইটালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল গলকে) এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে সিদ্ধান্ত নেন সিজার, সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়বেন রোমে।

সেনাবাহিনী নিয়ে সিজার আসছেন শুনে পম্পেই ও রক্ষণশীল সিনেট সদস্যরা দ্রুত শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। আশ্রয় নেন ব্রুনডিসিয়াম নগরে, সেখান থেকে জাহাজে গ্রীসে। ওখানে অন্যান্য রোমান সৈন্যরা ছিল। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন পম্পেই। সিজার রোমে পৌঁছেন। কোন বাধা ছাড়াই ঢুকে পড়েন শহরে। তবে কাউকে তিনি শাস্তি দেননি বা কারো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেননি বরং যে সব রক্ষণশীল সিনেট সদস্য পালাবার সুযোগ পাননি তাদেরকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেন সিজার। এরকম মহানুভব ছিলেন তিনি।

সিজার পম্পেইর পিছু নিয়ে গ্রীসে চলে আসেন এবং নানার ঘটার পরে শ্বশুর ও জামাই মুখোমুখি হন ফারসালাসের যুদ্ধক্ষেত্রে। পরাজিত হন পম্পেই, পালিয়ে যান মিশরে। ওখানে রাজার এক কর্মচারী তাকে হত্যা করে। এর ফল মিশরকে ভোগ করতে হয়েছিল। কারণ সিজার ভালবাসতেন পম্পেইকে।

পম্পেইর সমর্থকরা সিজারের বিরোধিতা করে চলছিল। সিজার অবশ্য মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের যুদ্ধে এদেরকে পরাজিত করেন। খ্রী. পূ. ৪৫-এ যখন পৌঁছেন সিজার, তখন তিনি গোটা রোমান পৃথিবীর প্রভু, যা বিস্তৃত ছিল ব্রিটিশ আইল থেকে পার্থিয়ার সীমান্ত এবং জিব্রাল্টার থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত।

পম্পেইর সাথে যারা পালিয়ে যাননি সেসব সিনেট সদস্যরা সিজারকে সারা জীবনের জন্যে একনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করেন। সমাপ্তি ঘটে প্রজাতন্ত্রের। সিজার এরপরে পুনর্গঠনের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধের মাত্রা হ্রাস করা এবং রোমান সভ্যতার উপযোগিতা যত বেশি সংখ্যক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ইটালিতে উপনিবেশ করেন এবং বেকার, অভাবী মানুষকে কাজের সুযোগ করে দেন। যারা সত্যিকারের অভাবী তাদেরকে মুক্ত শস্য বিলিয়ে দেয়া

হতো। প্রদেশ ও রোমের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে সিনেট অ-রোমান সদস্যপদও সৃষ্টি করেন। ইটালির সকল অধিবাসী রোমের নাগরিকত্ব পেয়ে যায়। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেন। আর এটিই ছিল প্রথম মিউনিসিপাল সরকার ব্যবস্থা।

সিজার ক্যালেন্ডারেরও পারিবর্তন করেন। এ ক্যালেন্ডার ইউরোপের মানুষ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মেনে চলেছে। রোমের অনেক বিখ্যাত দালান কোঠাও নির্মাণ করেছেন সিজার। এর মধ্যে ছিল জুলিয়ান ফোরাম। এ বিল্ডিং এখনো আছে রোমে। তিনি প্রদেশগুলোতে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তিনি গ্রীসে রোমের মত বড় একটি শহর তৈরির পরিকল্পনাও করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে সরকার কিভাবে চলবে তা নিয়ে ভাবতেন সিজার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্য চালাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসকের দরকার। আর নিজের পরিবারের এক তরুণ সদস্যকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী করে যেতে আপত্তি ছিল না সিজারের। তার নাম অক্টাভিয়াস, সিজারের ভাতিজা। অক্টাভিয়াস (অক্টাভিয়ান) পরবর্তীতে রোমের প্রথম সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন অগস্টোস নাম নিয়ে। চাচা সিজারের মত নানা গুণ থাকলেও অতটা সাহসী ছিলেন না অক্টাভিয়াস বা অক্টাভিয়ান।

সিজার তার উচ্চকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি আততায়ীর হাতে নিহত হবার কারণে। এ মৃত্যুকে জার্মান কবি গ্যোটে বর্ণনা করেছেন ইতিহাসের 'সবচে শুভবুদ্ধিহীন অপরাধ' হিসেবে।

সিজারকে হত্যা করা হয় পম্পিয়াস থিয়েটারে। এটি মাঝে মাঝে সিনেট হাউজ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একদল ঈর্ষাপরায়ণ সিনেটর সিজারকে হত্যা করেন। অথচ শত্রুর সাথে হাত মেলানো সত্ত্বেও এদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সিজার। এরা ভাবতেন সিজার রাজা হতে চাইছেন এবং সমাজে যে দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে আসছিলেন সিজার, এটা তাদের পছন্দ হচ্ছিল না। তাই তারা সিজারকে হত্যা করেন এই ভেবে যে তাহলে সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

সিজারকে হত্যা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। সিজারের মৃত্যুর পরে রোম ভয়ংকর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর প্রতিটি কোণে। তবে একজন মাত্র মানুষ শেষের দিকে এর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার শত্রুদেরকে নিকেশ করে, তিনি অক্টাভিয়ান।

সিজার যেমনটি আশা করেছিলেন, তার ভাতিজা সেভাবেই ক্ষমতায় আসেন। জুলিয়াস সিজারের খুনীর উত্তরসুরিরা কিন্তু অক্টাভিয়ানকে মেনে নিয়েছিল। তবে সিজারের মৃত্যু বৃথা যায় নি, তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ চালিয়ে গেছেন অক্টাভিয়ান। যদিও রোমের ইতিহাসে সবচে' মূল্যবান প্রাণটি বলিদান দিতে হয়েছিল– সিজারকে।

# ভারতের মৌর্য রাজ্য

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতে, সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত চলে এসেছিলেন। যাত্রা পথে তিনি কান্দাহার থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত রাস্তাটাও পাড়ি দেন। ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক নিযুক্ত করে তিনি চলে যান। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তার রাজ্য বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। সাত বছর বাদে উত্তর ভারতের এক রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল সিন্ধু থেকে গঙ্গা পর্যন্ত, এমনকি বর্তমানের আফগানিস্তানেও।

চন্দ্রগুপ্ত নতুন ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু করেন যা মিশর, গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তা ও চেতনার সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল। তিনি সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন আনেন কারণ আর্যদের অধীনে যে শ্রেণীবিন্যাস গড়ে উঠেছিল তা চন্দ্রগুপ্তের মোটেই পছন্দ ছিল না।

পাটনায় রাজধানী স্থাপন করে চন্দ্রগুপ্ত একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একটি নতুন, পেশাদার সেনাবাহিনী অত্যন্ত কঠোরভাবে এ ব্যবস্থার দেখ ভাল করত। বাহিনীটি চারভাগে বিভক্ত ছিল : হস্তিবাহিনী; রথ বাহিনী যারা দু'চাকার দ্রুতগামী রথ চালাতে ছিল পটু; অশ্বারোহী বাহিনী, অত্যন্ত দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল এ বাহিনীতে এবং পদাতিক বাহিনী। তীর ছুঁড়তে কিংবা কুঠার ব্যবহারে অথবা তরবারি চালনায় এদের সমকক্ষ কেউ ছিল না।



*অশোক, সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজা।*

জনগণের দেয়া খাজনা থেকে এই বিশেষ বাহিনীর বেতন মেটানো হতো। সেনাবাহিনী বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পেলেও তাদের কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণ নতুন রাজ্যকে পশ্চিমা লোভী চোখ থেকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হতো তাদেরকে। ভয় ছিল আলেকজান্ডারের পরে অন্য কোন সামরিক প্রতিভা হয়তো আক্রমণ করে বসবে ভারতবর্ষকে।

চন্দ্রগুপ্ত চাষবাসের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিলেন। শুকনো এলাকায় পরিমাণমত পানি সরবরাহও নিশ্চিত করেন। তার আইন সকলে ঠিকঠাক মেনে চলছে কিনা দেখার জন্যে সারা দেশে পরিদর্শক পাঠাতেন চন্দ্রগুপ্ত। তাছাড়া সকল ভারতীয় পর্যাপ্ত খাদ্য পাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও ছিল এসব পরিদর্শকের। দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বিদেশে রপ্তানী করা হতো। বিহারের সমস্ত তামা ও লোহার খনির দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি। কেউ ধাতুর কাজ করতে খনির ধাতু ব্যবহার করতে চাইলে তাকে উচ্চহারে মূল্য পরিশোধ করতে হতো। তবে এ টাকা রাজা দালানকোঠা নির্মাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ব্যবহার করতেন।



*অশোক একজন নির্মাতাও ছিলেন। এ মন্দিরটি তারই প্রমাণ।*

এই মহান রাজপুত্রটি মৃত্যুবরণ করেন খ্রী. পূ. ২৯৭তে। তার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন তার সুযোগ্য পুত্র বিন্দুসার। তিনি কুড়ি বছর রাজত্ব করে গেছেন এবং পিতার ভাল কাজগুলো চালিয়ে গেছেন। উন্নয়ন করেছেন রাস্তাঘাটের, সেনাবাহিনীর জন্যে ব্যারাক নির্মাণ করেছেন এবং রাজ্যের সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

বিন্দুসার মারা যান খ্রী. পূ. ২৭৫- এ। তার ছেলে অশোক বসেন সিংহাসনে। ভারতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয় অশোককে। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন।

অশোক ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। বিজয়ী যোদ্ধা হিসেবে তার জীবন শুরু। রক্তপাত ও লড়াইয়ের প্রতি অকস্মাৎ বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন ধর্মকর্মে।

রাজ্য শাসনের শুরুর দিকে অশোক বিখ্যাত মৌর্য সেনাবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যা অভিযানে নেমে পড়েছিলেন এবং খুব দ্রুত সংহার করেন শত্রপক্ষকে, উড়িষ্যা তার পদানত হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে তার এবং শত্রুপক্ষের ভয়াবহ লোকক্ষয় দেখে, বিশেষ করে নিরীহ জনগণের মৃত্যু এবং যুদ্ধের কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করার দৃশ্য দেখে অশোকের মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি তার ঠাকুরদার গড়ে তোলা অপূর্ব সুন্দর রাজধানী পাটনায় ফিরে এসে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বলা হয় অশোকের সময়ে শুরুতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মের একটি উপদলের চেয়েও ছোট ছিল, কিন্তু শেষের দিকে এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রীতির বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ভারতের নানা জায়গায়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থামের গায়ে অশোক নিজের বিশ্বাস ও আশার কথা খোদাই করে গেছেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন বৃদ্ধ, গরীব, ক্রীতদাস ও বিকলাঙ্গদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। তিনি শান্তি ও সুভদ্র আচরণের জন্যে প্রার্থনা করেছেন যা পরবর্তীতে যীশুও করেছিলেন। তিনি তার বিশ্বাসের কথা ছড়িয়ে দিতে ধর্ম প্রচারকদেরকে শ্রীলংকা, সিরিয়া এমনকি মিশরেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার মেসেজ বা ধর্মোপদেশ যাতে দূরদূরান্তে পৌছে যায় এজন্যে বিভিন্ন ভাষাও ব্যবহার করতেন। কান্দাহারে কয়েকবছর আগে একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে গ্রীক ও আরামিক ভাষায় এরকম হিতোপদেশ লেখা ছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হলেও বাস্তববাদী অশোক রাজা হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হননি। তিনি রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে তোলেন এবং রপ্তানীকারকদের কর মওকুফ করে দেন। বিশাল এক সেনাবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রাখতেন দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে। রাজকীয় কোষাগার থেকে ভারতীয় প্রতিভাদের অর্থ সাহায্য দিতেন।

অশোকের শাসনামলে দালানকোঠা নির্মাণে পাথরের ব্যবহার হয়েছে বেশি। আর অশোকের তত্ত্বাবধানে তার উৎসাহে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নয়ন ঘটে এবং অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। এসব সভ্যতার প্রভাব মিলবে অশোকের সময়ে তৈরি কিছু দালান কোঠা দেখলে। পাটনাতে যে বিশাল দরবার হল গড়ে তোলা হয়েছিল তার সম্পূর্ণটাই পারস্যের আদলে তৈরি।

অশোকের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় এখনো পঞ্চমুখ অনেকে। অনেকেই তাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনিই প্রথম রাজা যিনি অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী থেকে একটি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। অথচ ভারতে কম বেশি সহিংসতার ইতিহাস সব সময়েই ছিল।

যে সব ভারতীয় অশোককে গর্বের সাথে স্মরণ করেন তারা এ ভেবে দুঃখিত হন যে খ্রীঃ পূঃ ২৩২-এ ওই মহান শাসকের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পরেই বিখ্যাত মৌর্য সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায়। ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে যথারীতি বিবাদ শুরু হয়। ভারত উপমহাদেশের পরবর্তী কয়েকশ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে ৩০০ অব্দে যখন নতুন আরেকটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমল থেকে আবার পরিষ্কার ভাবে লিখিত হতে থাকে ভারতের ইতিহাস।

# চীনের বিখ্যাত হ্যান রাজবংশ

চৌদ্দ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আমরা উল্লেখ করেছিলাম শেষ চীন সম্রাট শি হুয়াংতির কথা যিনি চীনের বিখ্যাত মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন। নিষ্ঠুর এবং স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের হলেও হুয়াংতি চীনা সমাজে একটি পরিবর্তন নিয়ে আসেন যা হ্যান রাজবংশের আমলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

হুয়াংতি চীনের কলহপ্রিয় অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করেন এবং সৃষ্টি করেন বেশ কিছু প্রশাসনিক জেলা। সেসব জেলায় তিনি বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করেছিলেন। এটি ছিল পরবর্তীতে গড়ে ওঠা চীনা সিভিল সার্ভিসের ভিত্ একটি আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র।



*সিল্ক ট্রেড রুট*

হুয়াং-তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চীনের জন্যে কার্যকর কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলতে হলে ভূস্বামীদের ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে।

তিনি ধনী ব্যক্তিদের বড় বড় জমি কিনে নিয়ে তা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিলিয়ে দেন। এরপরে তিনি তার কর্মচারীদের, যারা জেলার দায়িত্বে ছিল, তাদের নির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেন।

তিনি এবং তার প্রধানমন্ত্রী লি জু চীনা ভাষার Standardization করার নির্দেশ দেন। ফলে চীনের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি মানুষ সম্রাটের নির্দেশ বুঝতে পারে। এসব নির্দেশ, পরামর্শ আসত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে।

হুয়াং-তি আইনেরও standardize করেন। এক শ্রেণীর আইন গোটা দেশের জন্যে বলবৎ করা হয়।

হুয়াং-তি তার দেশকে দ্রুত সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। চীনের জন্যে তাই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার ছিল হুয়াং-তির মৃত্যু (খ্রী. পূ. ২১০) কারণ তার মৃত্যুর পরপরই তার সংস্কার ও পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বিশাল আকারের বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। নতুন আইন ও জমির ভাগ বাটোয়ারার বিষয়টি ভূ-স্বামীরা মোটেই মেনে নিতে পারেন নি এবং মূলতঃ তারাই ছিলেন বিদ্রোহের হোতা।

হুয়াং-তি কোন উত্তরসূরি রেখে যাননি। বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝ থেকে সাহস ও যোগ্যতা নিয়ে উঠে আসেন এক কৃষক, লিউ প্যাং (২০৬-১৯৫ খ্রী. পূ.)। তিনি ক্ষমতা দখল করেন। চি'ন সম্রাটদের ভাল কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি তিনি বজায় রেখেছিলেন। তিনি হ্যান ডাইনাষ্টির প্রথম শাসক, যে রাজবংশ প্রায় চারশো বছর শাসন করেছে চীনদেশকে।

পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের মত পুবের পৃথিবীতে হ্যান রাজবংশ বিরাট প্রভাব রেখে চলছিল। হ্যানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার চীনের একতা বজায় রাখতে সাহায্য করে যে একতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হুয়াং-তি। চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং টাকার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পণ্য বিনিময়ের বদলে টাকা দিয়েও মানুষ জিনিসপত্র কিনত। সমৃদ্ধির কারণে দেশে পণ্ডিতের সংখ্যা বেড়ে যায়, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে বেশির ভাগ মানুষের মাঝে। ইতিহাসবিদরা চীনের গল্প লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। তাদের লেখায় উঠে আসে শ্যাং, চু, চি'ন এবং অবশ্যই হ্যানদের কথা।

এ সময়টি শান্তি ও শৃঙ্খলারও যুগ ছিল। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে, কৃষি কৌশলের অগ্রগতি হয়। আঙুর ও কমলার মত নতুন ফলের চাষ হতে থাকে এবং হ্যান ডাইনাষ্টিতেই লোকে চা পানের অভ্যাস করেছিল। তারা দেখেছিল গরম পানিতে চায়ের পাতা কেটে দিলে তা সুস্বাদু পানীয়তে পরিণত হয়। তখন আলাদাভাবে চায়ের চাষও হতে থাকে।

হ্যান সম্রাটদের অধীনে চীনারা তাদের রাজ্য বিস্তারও করেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাশাপাশি মধ্য এশিয়াতেও তারা হানা দিয়েছে। চীনারা রোমানদের মত কম বেশি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল।

চীনাদের ঘরেও শিল্পের জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল। তারা মৃৎশিল্প ও চীনা মাটির তৈজসপত্র তৈরিতে ওস্তাদ লোক ছিল। এ শিল্প হ্যান ডাইনাষ্টির সময় থেকে শুরু।

ডাইনাষ্টির শেষের দিকে চা পান পরিণত হয় জাতীয় অভ্যাসে। এখন সবাই হাতল অলা কাপে চা খেলেও চীনারা ছোট বাটিতে চা খেত।

চীনকে শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছিল হান বংশ। তারা খনিতে পাওয়া বেশিরভাগ খনিজ সম্পদ একাই উত্তোলন করতেন। এসব খনিজের মধ্যে ছিল লোহার আকরিক, কাদা, রূপা ও টিন। তারা নতুন খাজনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তারা সিভিল সার্ভিসেরও উন্নয়ন সাধন করেছেন। উচ্চতর পদগুলো শুধু উচ্চ বংশীয়রা অধিকার করতে পারতেন। তিনজন প্রধান কর্মকর্তা সিভিল সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। চ্যান্সেলর ও মিনিষ্টার যুদ্ধের দিকটা দেখতেন, সেক্রেটারী অব ষ্টেট-এর কাজ ছিল জমিজমা দেখাশোনা।

চীন অনেকের কাছে বিস্ময় ও ঈর্ষার দেশ ছিল কারণ তারাই প্রথম কাগজ আবিষ্কার করে (১০০ খ্রীষ্টাব্দে)। তারা ব্রাশের কলম ও কালি দিয়ে লিখত। এ সময় পণ্ডিতরা অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। চীনারা বারুদ আবিষ্কার করলেও এটা শুধু আতসবাজি পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হতো।

হ্যান ডাইনাষ্টিকে ইতিহাসবিদরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন; প্রাচীন হ্যান (২০০ খ্রী. পূ.-১০ খ্রীষ্টাব্দ) ও অবসান পূর্ব হ্যান। প্রাচীন হ্যান ভূ-স্বামীদেরকে পরাস্ত করে মানুষজনকে তেরটি প্রদেশে একত্রিত করেন যা আজতক বিদ্যমান রয়েছে। তারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চললেও অনেক সম্রাটই রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে আসা বর্বর হুনদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছেন। এক বিখ্যাত সম্রাট, হান উ-তি (১৪০-৮৭ খ্রী. পূ.) তার দীর্ঘ রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছেন বাইরের যুদ্ধের ব্যস্ততায়। তিনি জয় করেন কোরিয়া, দক্ষিণ চীন ও ইন্দোচীন (বর্তমানে ভিয়েতনাম, উত্তর ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস), এবং এদেশগুলো যোগ করেন তাঁর সাম্রাজ্যের সাথে। ওই সময় থেকে চীন পুবের এ অঞ্চলগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। এজন্যেই বুঝতে অসুবিধে হয় না আজকের ভিয়েতনামীদের সঙ্গে চীনাদের এই মিল কিভাবে হলো।

হান উতি হুয়াং-তি যেসব বইপত্র ধ্বংস করে গেছেন ওগুলো আবার লেখানোর ব্যবস্থা করেন এবং কনফুসিয়াস মতবাদ ছড়িয়ে দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। তার পরে চাও তি (৮৬-৭৪ খ্রী. পূ.) ও সিভান তি (৭৩-৪৯ খ্রী. পূ.) হ্যান উতি'র ভাল কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি চালিয়ে গেছেন। সিভান হ্যান সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করেন মঙ্গোলিয়ার বিশাল অঞ্চল এর সাথে জুড়ে দিয়ে। হুনদেরকে তিনি এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বহু বছর তারা চীনের ধারে কাছেও ঘেঁষার সাহস পায় নি।

হ্যান ডাইনাষ্টির পতন ঘটার আগে যে সব সম্রাট ক্ষমতায় এসেছেন তাদের কেউই আগেকার বা প্রাচীন সম্রাটদের মত দক্ষ বা সফল ছিলেন না। ৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াং-মাং সিংহাসন দখল করেন। তার পূর্বসূরি ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। ফলে সহজেই তাকে হঠিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন ওয়াং মাং। ওয়াং ক্ষমতায় বসেই দেশের সমস্ত ভূমি জাতীয়করণ করে ফেলেন এবং এগুলো

কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেন। তিনি কৃষকদের খামার ঠিকঠাক চালানোর জন্যে ঋণও দিতেন। আগে সোনা দিয়ে মুদ্রা বানানো হতো। ওয়াং মাং সোনার বদলে ব্রোঞ্জের মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি বেশির ভাগ জিনিসের ক্রয়সাধ্য মূল্য বেঁধে দেন এবং লবণ, লোহা ইত্যাদির মত কাঁচামালের উৎপাদন ও পরিবেশনার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে।

উনিশশো বছর পরে, মাও সে তুং-এর সময়ে যে সমাজতন্ত্র চালু হয়েছিল তার সুফল চীনারা উনিশশো বছর আগেই ওয়াং মাং-এর বদৌলতে ভোগ করছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত চীন তখন সমাজতান্ত্রিক গবেষণার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওয়াং-এর চিন্তাধারা জনপ্রিয়তা পায় নি, শুধু ওপরতলার মানুষই নয়, কৃষকরাও তার ধ্যান ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওয়াং মাং সংস্কার বাতিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ততদিনে দেরী হয়ে গেছে অনেক। ২৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্রোহে তিনি নিহত হন। তার জায়গায় আসেন তারই এক কর্মচারী কোয়াং উ তি।

কোয়াং ও তার উত্তরসুরিরা পুব ও মধ্য এশিয়ায় প্রচুর বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিজিত এলাকায় কঠিন শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। সম্রাটের এক সেনাপতি, চাও, যিনি ৭২ থেকে ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সিল্ক ট্রেড রুট-এ পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তবে হ্যান শাসনামলের সময় ফুরিয়ে আসছিল। সম্রাটরা ক্রমে তাদের সেনাপতি ও মন্ত্রীদের ওপরে রাজ্য চালানোর ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে উঠছিলেন। আর সেই সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সাথে বেড়ে যাচ্ছিল দূরত্ব। কারণ তারা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন আয়েশী জীবন যাপন নিয়ে। ভূ-স্বামীরা বহু বছর ধরে অবদমিত থাকলেও চুদের মত আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবার আশা কখনোই ছাড়ে নি। ভোগ বিলাসে মত্ত সম্রাটদের দুর্বলতা তাদেরকে সেই সুযোগ এনে দেয়। হ্যান সম্রাটদের সময় কৃষককূল যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছিল। কিন্তু শেষের দিকে তারা বাধ্য হয় ভূ-স্বামীদের ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে। এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি দরবার ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার জন্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল বলে।

দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে, সাও, এক সাহসী ও নির্দয় সেনাপতি সরকারের ক্ষমতা দখল করেন এবং অবসান ঘটান হ্যান রাজবংশের।

দূর প্রাচ্যের ইতিহাসে হ্যান ডাইনাষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল যে ভূমিকা রোম রেখেছিল ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যে। হ্যান সম্রাটদের আমলে চীনা সভ্যতার একটি কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে আজতক। যদিও বহু চেষ্টা করা হয়েছে এ সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে। হ্যান ডাইনাষ্টি চীনা ক্ষমতা ও সংস্কৃতিকে রোমানদের সম পর্যায়ের একটি অবস্থানে নিয়ে এসেছিল, কখনো বা কিছু ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি।

# অগাষ্টাসের রোম ও তার পরিবার

জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করে তার ষড়যন্ত্রকারীরা যা আশা করেছিল, ঘটেছিল তার বিপরীত। দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খ্রী. পূ. ৩১-এ সিজারের ভাইপো গাইয়াস জুলিয়াস সিজার অক্টাভিয়ানাস রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসেন। তিনি সকল বিরোধীদেরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। হিংসা ও ঈর্ষার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, অবসান ঘটে যুদ্ধের। যুদ্ধের দেবতা জানুসের মন্দিরের দরজা প্রথম যুদ্ধের পরে আবার বন্ধ হয়ে যায়।

অক্টাভিয়ান জানতেন রোমানরা রাজা বা সম্রাটদের ধারণাকে ঘৃণার চোখে দেখে, যদিও তারা একনায়কদেরকে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। তাই তিনি সিনেট কর্তৃক দেয়া সম্মান ও পদবী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। সিনেট তাকে 'প্রিন্সেপস' পদবী দিতে চেয়েছিলেন। তবে অক্টাভিয়ান এ পদবীর বদলে অগাষ্টাস নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার উত্তরসূরিরা অবশ্য সিজার নামটি ব্যবহার করতেন।



*কালিগুলার সুদর্শন চেহারার পেছনে লুকিয়ে ছিল এক নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিবাজ শাসক।*

ক্ষমতায় আসার পরে ঘরে-বাইরের নানা সমস্যা জেঁকে ধরে অগাষ্টাসকে। চাচা জুলিয়াস সিজার সংস্কারমূলক যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন তা গৃহযুদ্ধের কারণে থেমে যায়। অগাষ্টাস আবার এগুলো শুরু করেন। সিজারের মত তিনিও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিকে নজর দেন সরকারি কাজে তাদেরকে নিয়োগ দিতে। দু'জন মানুষ ইতিমধ্যে স্বস্ব যোগ্যতায় অগাষ্টাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এদের একজন এম. ভিপসানিয়াস আগরিপ্পা, একজন সফল সেনাপতি ও নৌ সেনাপতি, যিনি খ্রী. পূ. ৩১-এ আক্টিয়ামের যুদ্ধে

এম আন্টোনিয়াসকে পরাজিত করেন। অপরজন মেসিনাস, অত্যন্ত দক্ষ কূটনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক। এরা দু'জনেই অগাষ্টাসের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

এই তিন যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে রোম সুপথে পরিচালিত হতে থাকে। শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ করতে থাকে জনগণ। নতুন ধরনের গভর্নরদের অধীনে প্রদেশগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। এই গভর্নরদের প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ, পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে যার এলাকার জন্যে নিযুক্ত সেই সমস্ত এলাকার কল্যাণ সাধন।

অগাষ্টাস এদিকে বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণের কাজে হাত দেন। রোমে, জুলিয়াস সিজারের শুরু করা কাজগুলো তিনি শুধু শেষই করেনি, নিজেও অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করেছেন। তিনি তার দুই উপদেষ্টা আগরিপ্পা ও সেমিনাসকে টাকা দিতেন শহরকে সুন্দর করে তোলার কাজে উৎসাহিত করার জন্যে। মৃত্যুর আগে অগাষ্টাস বলেছিলেন, আমি রোমকে দেখেছি ইটের শহর, আর একে ছেড়ে চলে যাচ্ছি মার্বেল পাথরের শহরের রূপ দিয়ে।

সামরিক ক্ষেত্রে অবশ্য অগাষ্টাস তার চাচার দক্ষতার ধারে কাছেও ছিলেন না। সিজারের মৃত্যুর পরে যে সব শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে তিনি সফল হয়েছেন তার সমস্ত কৃতিত্ব আগিরাপ্পার। তার আমলে বেশির ভাগ লড়াই হয়েছে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে, জার্মানদের সঙ্গে।

১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন অগাষ্টাস। তার মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের সকলে শোকে কাতর হয়ে পড়েছিল। কারণ অগাষ্টাস ছিলেন একজন জ্ঞানী শাসক যিনি সব সময় জনগণের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি বিশাল এক শান্তির সাম্রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দিত সেনাবাহিনী। সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোও সুখে শান্তিতে ছিল। তার অবদান দুশো বছরেরও বেশি সময় টিকে থেকেছে। যদিও তার পরবর্তী উত্তরসুরিরা ছিল রক্ত পিপাসু।

অগাষ্টাসের কোন ছেলে ছিল না। তাই সিনেট তার সৎ ছেলে টিবেরিয়াস ক্লডিয়াস নীরুকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। তিনি একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে লড়াই করেছেন, তাদেরকে বেশ কয়েকবার পরাজিতও করেছেন। বাড়িতে তিনি প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতেন অগাষ্টাসকে। তবে নীরু খুব সন্দেহপ্রবণ এবং অস্থির চিত্তের মানুষ ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পরে হয়ে ওঠেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অনেকের প্রতিই অন্যায় অবিচার করেছেন।

পঞ্চাশ বছর বয়েসে সিংহাসনে বসেন টেবেরিয়াস নীরু। শাসন চালিয়েছেন তেইশ বছর। এ সময়ে তিনি তার ভাইপোর ওপরে খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তার ভাইপো, জার্মানিকাস (নীরুর ভাই ড্রাসাস নেরো জার্মানিকাসের ছেলে) রোমান

বাহিনীকে দারুস-এর যুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। রাইন নদীর তীরে সেনা বাহিনী আরো বেতনের দাবিতে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে জার্মানিকাসই সেই বিদ্রোহ দমন করেন। তবে ভাইপোর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত টিবেরিয়াস তাকে নিকট প্রাচ্যে পাঠিয়ে দেন এবং কিছু দিন পরে কেউ তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ভাইপোর মৃত্যুর জন্যে টিবেরিয়াসকে দায়ী করা হয়।

টিবেরিয়াসের সঠিক পরিচালনায় প্রদেশগুলোতে শান্তি বিরাজ করলেও রোমান জনগণ তাকে পছন্দ করত না। সন্দেহ প্রবণ টিবেরিয়াস সব সময় ভাবতেন প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তবে হঠাৎ করেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন আর দেশ শাসন করবেন না। তিনি অবসর নিয়ে চলে যান নেপলাসের কাপ্রি দ্বীপে। রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে যান তার প্রিয় পাত্র সেজানাসের কাছে। ইনিও অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসেন তার উত্তরসূরি মাক্রো।

৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান টিবেরিয়াস জনগণের ঘৃণার পাত্র হয়েই। সিংহাসনে বসেন তার ভাইপোর ছেলে গাইয়াস ক্যালিগুলা, জার্মানিকাস তার বাবা। রোমানরা ক্যালিগুলাকে তাদের শাসক হিসেবে পেয়ে রীতিমত মনস্তাপ করছিল। কারণ তার মধ্যে টিবেরিয়াসের গুণ একটিও ছিল না, দোষ ছাড়া। দানব স্বভাবের ক্যালিগুলা শৈশব থেকেই প্রাণীদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করে আমোদ পেতেন। যেমন জ্যান্ত মাকড়সার ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলতেন কিংবা বেড়ালের লেজ কেটে দিতেন। বড় হবার পরে তার নিষ্ঠুরতা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি মানুষের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। দরবারে কিংবা প্রজাদের সামনে তিনি উচ্চপদস্থ সিনেটর কিংবা কর্মকর্তাদের অপমান করতেন, তারপর তাদেরকে হত্যা করতেন।

টিবেরিয়াসের রেখে যাওয়া বিপুল ধনসম্পত্তি অল্প দিনের মধ্যে বেশুমার খরচ করে রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন ক্যালিগুলা। তিনি প্রদেশগুলোতে প্রচুর কর ধার্য করলে সেখানকার পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে এবং অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নেয়ার আগেই প্রিটোরিয়ান রক্ষীরা ক্যালিগুলাকে হত্যা করে (৪১ খ্রীষ্টাব্দ)।

ক্যালিগুলার পরে সিংহাসনে বসেন তার চাচা টিবেরিয়াস ক্লডিয়াস ড্রাসাস নেরো জার্মানিকাস ওরফে ক্লডিয়াস, জার্মানিকাসের ভাই। ক্লডিয়াস শারীরিকভাবে কিছুটা অক্ষম ছিলেন এবং কথা বলার সময় ভয়ানক তোতলাতেন। তিনি একজন পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তের বছরের রাজত্বকালে ক্লডিয়াস নানা গঠনমূলক কাজ করেছেন, জয় করেছেন ব্রিটেন। সরকারের দায়িত্ব তুলে দেয়া হয় গ্রীক ক্রীতদাসের দুই উচ্চশিক্ষিত সন্তানের হাতে। তাদের নাম নার্সিসাস ও পাল্লাস। রোমানরা তাদেরকে পছন্দ না করলেও এরা সরকারের কাঠামো গঠনে প্রচুর শ্রম দিয়েছেন।

ক্লডিয়াসের ছিল চার বিয়ে। উর গালানিল্লা, এলিয়া ও মেসালিনাকে বিয়ের পরে তিনি ক্যালিগুলার বোন, তার ভাস্তি আগরিপ্পিনাকেও বিয়ে করেন। আগরিপ্পিনা বিয়ের পরপরই কর্তৃত্ব শুরু করেন ক্লডিয়াসের ওপরে এবং স্বামীর ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে নানা অন্যায়ও করেছেন। ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষাক্ত মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মারা যান ক্লডিয়াস। সন্দেহ করা হয় তার মৃত্যুর পেছনে আগরিপ্পিনার হাত ছিল। আগরিপ্পিনা সবচেয়ে ভালভাবতেন তার প্রথম স্বামী এল ডোমিটিয়াস আহেনোবারবাসের ঔরসজাত নিজের ছেলেটিকে। ছেলের নাম ছিল নীরু, রোমান ইতিহাসে তার মত অত্যাচারী শাসক আর কেউ ছিলেন না।

সতের বছর বয়সে সম্রাট বনে যান নীরু। শিক্ষক সেনেকা ও কমান্ডার বারাসের উপদেশ ও শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও এদের কাছ থেকে খুব কমই শিখেছেন নীরু। তার সময় কাটত শুধু গান গেয়ে, অভিনয় করে আর বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে। সরকারের দায়িত্ব তিনি ন্যস্ত করেছিলেন মা আগরিপ্পিনার হাতে। কিন্তু মা'র খবরদারীতে বিরক্ত হয়ে শেষে তাকে হত্যা করেন। তারপর সেনেকা ও বারাসকে সরকারী দায়িত্ব পালন করতে বলেন নীরু। এ কাজ সুচারুভাবেই পালন করেছেন তাঁরা।

নীরুর মধ্যে সম্রাটের আভিজাত্য বলে কিছু ছিল না। তিনি রাতের বেলা রোমের রাস্তায় তরুণ রক্ষী নিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন আর সুযোগ পেলেই খ্যাতনামা সিনেটরদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে অপহরণ করতেন। নীরুর তরুণ রক্ষীদলের সদস্য সালভিয়াস ওথোর এক সুন্দরী তবে দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন স্ত্রী ছিল, পপাইয়া নাম। এই পপাইয়ার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন নীরু। ওথো তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হন যাতে নীরু তাকে বিয়ে করতে পারেন।

বারাসের মৃত্যুর পরে নীরু ওফোনিয়াস টিগেল্লিনাস নামে এক নিষ্ঠুর স্বভাবের রক্ষীকে বারাসের জায়গায় নির্বাচিত করেন। এ লোক তরুণ সম্রাটের নির্দয় স্বভাব ও দুষ্টবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। রোমান জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়ে যায় উন্মাদ ক্যালিগুলার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক লোকের কবলে তারা পড়েছে।

ধনী ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তারা বিনা বিচারে, কোন অজুহাত ছাড়াই খুন হয়ে যাচ্ছিল, তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পপাইয়ার অনুরোধে নীরু তার প্রথম স্ত্রী অক্টাভিয়াকে খুন করেন। বিপুল পরিমাণ অর্থ অযথা কুৎসিত বিনোদন ও দরবারি ভোজে খরচ হয়ে যাচ্ছিল। ক্লডিয়াসের বহু যত্নে রক্ষিত কোষাগার শূন্য করে দিচ্ছিলেন নীরু। জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেয়া হয় অত্যাধিক করের বোঝা। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, সম্রাট নিজেই জনগণের সামনে নাচ-গান করতেন। আর রোমানরা এটা মোটেই পছন্দ করত না। তাদের মতে, অভিনয় বা নাচ-গান জনগণের সামনে পরিবেশন করবে ক্রীতদাসরা, অবশ্যই সম্রাট নন।

৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রোম নগরীতে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পুরো এক হপ্তা, দিন রাত সমানে জ্বলছিল নগরী, শহরের অর্ধেকের বেশি অঞ্চল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, পুড়ে যায় ঘরবাড়ি। বহু বিখ্যাত প্রাচীন দালান কোঠা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, প্রাচীন সময়ের অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে নীরুর টনক নড়ে। তিনি আগুন নেভাতে দমকল বাহিনী পাঠান, রাজকীয় বাগানে আশ্রয় দেন গৃহহীনদের এবং দুস্থদের জন্যে রিলিফের ব্যবস্থা করেন। এরপরে রোমকে নতুন করে সাজাতে থাকেন।



*ক্রুশ বিদ্ধ যীশু, জেরুজালেমের এক পাহাড়ে তার দুই শিষ্য সহ ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এভাবেই হত্যা করা হয়।*

জনগণকে শান্ত রাখতে নীরু শতাধিক খ্রীষ্টানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অভিযোগ– এরাই নাকি রোমে আগুন লাগিয়েছিল। এই খ্রীষ্টানরা কারা?

টিবেরিয়াসের সময় রোমান পৃথিবী প্রথম নাজারেথের যীশুর কথা শুনতে পায়। যীশু ছিলেন এক ছুতোরের ছেলে, নতুন ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক। তার ভক্তরা পরবর্তীতে তার নাম দেয় যীশু বা মিশা। যীশুর জন্ম ৪ খ্রীষ্টাব্দে, জেরুজালেমের কাছে, যৌবনে ছুতোরের কাজ করতেন তিনি। ত্রিশ বছর বয়সে ছুতোরের পেশা ছেড়ে দিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন। এ পৃথিবীতে তার জন্ম মহৎ কর্ম সাধন করতে, এ বিশ্বাসে তিনি প্যালেষ্টাইনে মরুভূমিতে গিয়ে তীব্র তাপ দাহের মধ্যে উপবাস শুরু করেন। দীর্ঘ চল্লিশ দিন অমানবিক কষ্ট সহ্য করার পরে তিনি কি করবেন সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান।

প্যালেষ্টাইনের ইহুদিদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে থাকেন তিনি, বলেন প্রেমের সাহায্যে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব। অনেককেই তিনি ভক্ত বা শিষ্য হিসেবে পেয়ে যান। তারা তার শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে থাকে। তিনি নানা অলৌকিক কাজ করতে পারতেন। বিশেষ করে

অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার ক্ষমতার কারণে সর্বত্র এ কথা ছড়িয়ে যায় মিশাকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের জন্যে পথ সৃষ্টি করতে। তবে কট্টরপন্থী ইহুদিরা সন্দেহের চোখে দেখত যীশুকে। বিশেষ করে ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসী ধর্মযাজক ও বয়োজ্যেষ্ঠরা। যীশুর মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল তার ধর্ম বিশ্বাস হয়তো টিকে থাকবে নিজের প্রাণের বিনিময়ে। তিনি এ উদ্দেশ্যে জেরুজালেমে চলে আসেন।

ইহুদি কর্তৃপক্ষ যীশুকে বন্দী করে নিয়ে আসে রোমান গভর্নর পান্টিয়াস পিলেটের কাছে। যীশুর অপরাধ ছিল ব্লাসফেমি বা ঈশ্বর নিন্দা। পিলেট যীশুর কোন দোষ খুঁজে পাননি কিন্তু ইহুদিরা যীশুর ধ্বংস চাইছিল বলে তিনি বাধ্য হন মহা পুরুষটিকে ক্রুশে ঝোলাবার আদেশ দিতে।

ক্রুশ বিদ্ধ হবার দুইদিন পরে, খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে, যীশু উঠে এসেছিলেন তার কবর থেকে এবং গমন করেন স্বর্গে। তার শিষ্যরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করত এবং নিজেদের বিশ্বাসের জন্যে তারা মৃত্যুবরণ করতেও ছিল প্রস্তুত।

এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। সাউল নামে এক ইহুদি কর্মকর্তা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম রাখেন পল এবং তিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রথম খ্রীষ্টান মিশনারী ও সংগঠক। পল ভূমধ্যসাগর এলাকায় ঘুরে বেরিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তবে শেষ দিকে রোমের কর্তৃপক্ষের সাথে তার বিবাদ শুরু হয়ে যায়। রোমের কর্তৃপক্ষ নতুন ধর্ম-বিশ্বাসটিকে বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। ভাবতেন এ ধর্ম সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা নষ্ট করে ফেলবে। খ্রিষ্টানরা ক্রীতদাস প্রথা পছন্দ করত না। অথচ রোমান সাম্রাজ্য নির্ভর ছিল ক্রীতদাসদের কর্মশক্তির ওপরে। রোমানরা নানা দেবদেবীর পূজো করত, খ্রিষ্টানরা ছিল একেশ্বরবাদী। তাছাড়া খ্রিষ্টানরা প্রায়ই মিটিং করে মানুষকে তাদের ধর্মে টেনে আনার চেষ্টা করত বলে তাদের নিয়ে ভয় ছিল রোমের।

পলকে অবশেষে গ্রেফতার করা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় পিটারের সঙ্গে। পিটার ছিলেন যীশুর বারজন শিষ্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তাই বলে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি মানুষের ভালবাসা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বরং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কাজেই নীরু যে রোমের অগ্নিকাণ্ডের জন্যে খ্রিষ্টানদেরকে দায়ী করবেন তা বলা বাহুল্য। তার আদেশে শত শত খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। আর সম্ভবতঃ ওই প্রথম এবং শেষ বারের মত রোমের মানুষ নীরুর প্রশংসা করেছিল। খুন হয়ে যাওয়া হতভাগ্য খ্রিষ্টানদের কাতারে পল ও পিটারও ছিলেন। এরা দু'জনেই খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান দুই সেইন্ট।

রোমের যখন পুনঃনির্মাণ চলছে, নীরু ততদিনে ধারণ করেছেন স্বমূর্তি। তার গুপ্তচররা সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এরকম সন্দেহে বহুজনকে গ্রেফতার করে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।

রোমে সরকারের আচরণ প্রাদেশিক গভর্নর ও সেনাধিপতিদেরকে ক্রমে ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহের সূচনা হয়। নীরু বাধ্য হন আত্মহননের পথ বেছে নিতে। নীরুর উত্তরাধিকারীদের সকলকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতার অধিকার নিয়ে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এক বছরের মধ্যে চারজনকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয় ঃ গালবা, স্পেনের গর্নভর যাকে হত্যা করেন ওথো এবং যিনি গলের রোমান সেনাবাহিনীর কমাডার ভিটেলাসের চাপে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

এদিকে পুবে, রোমান সেনাধ্যক্ষ টি, ফ্লাভিয়াস ভেসপাসিয়ানাস (ভেসপাসিয়ান) কে তার সেনাদল সম্রাট বলে ঘোষণা করে এবং কিছুদিনের মধ্যে বাকি সাম্রাজ্যও তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। ভিটেল্লিয়াস নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্যে লড়াই করেছিলেন। তবে ক্রেমোনার যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। রোমে ফেরার পথে তাকে ভেসপাসিয়ানের একটি দল হত্যা করে। রোম আবার জয় করেন একজন সেনাপতি।

# রোমান সাম্রাজ্যের চার শতক

ভেসপাসিয়ান ক্ষমতায় আসার সময় রোমান সাম্রাজ্যের দারুণ দুর্দশা চলছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। প্রদেশগুলো হয়ে উঠছিল অস্থির, অশান্ত। বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছিল ইহুদিরা। অগাষ্টাস যেভাবে কার্যকর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলে গিয়েছিলেন ক্রমেই তা ভেঙে পড়ছিল।

ভেসপাসিয়ান অবশ্য সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমস্যার সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সামরিক ক্যারিয়ারই তাকে এ সাহস ও বুদ্ধি যুগিয়েছিল। তিনি প্রচুর কর তোলেন এবং নতুন পুনর্গঠন কর্মসূচিতে প্রচুর গরীব মানুষদেরকে নিয়োগ দেন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও বিখ্যাত দালান কলোসিয়াম রোমে তৈরি হয়েছে ভেসপাসিয়ানের আমলেই। তবে এ কলোসিয়াম তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয় ৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ভেসপাসিয়ানের মৃত্যুর এক বছর পরে। এই প্রকাণ্ড অ্যাম্ফিথিয়েটারে একযোগে ৯০,০০০ দর্শক বসতে পারত।



*ট্রাজান, রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম সেরা শাসক (৯৮–১১৭ খ্রীষ্টাব্দ)*

৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিনে ভেসপাসিয়ানের ডাক্তাররা ঘোষণা করেন আর কয়েক ঘন্টার বেশি আয়ু নেই তাঁর। এ কথা শুনে ভেসপাসিয়ান তার ভৃত্যদেরকে আদেশ করেন তাকে বিছানা থেকে তুলে পোশাক পরিয়ে দিতে। একজন সম্রাটের দাঁড়িয়েই মৃত্যুবরণ করা উচিত, এ কথা বলার পরপরই তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

ভেসপাসিয়ানের ছিল দুই ছেলে। টাইটাস ও ডোমিটিয়ানাস (ডোমিটিয়ান)। টাইটাস অত্যন্ত দক্ষ একজন সৈনিক ছিলেন। সৈন্যরা তাঁকে খুবই পছন্দ করত জার্মানিকাসের মত, ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে টাইটাসকে সম্রাট বানানো হয়, কিন্তু তরুণ বয়সেই কঠিন এক রোগে মারা যান তিনি। ৮১ খ্রীষ্টাব্দে, তার মৃত্যুর পরে ভাই ডোমিটিয়ান সিংহাসনে বসেন।

ডোমিটিয়ান তার বাবার মত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর গোয়ার্তুমী মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তবে একই সাথে তিনি ছিলেন উদ্ধত, হিংসুটে ও সন্দেহপ্রবণ। সিনেটের পরামর্শের তিনি ধার ধারতেন না এবং নিজের মত করে চলতেন। তার সেনাপতি আগ্রিকোলা ব্রিটেনের উত্তরে সামরিক অভিযানে বিজয় লাভ করেন, ক্লাইড সফল হন ফার্থ অব ফোর্থে, ৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এদের দু'জনকেই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ডোমিটিয়ান ডেকে পাঠান স্রেফ হিংসার বশে।

সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট ও জনগণকে আমোদ আহ্লাদের মধ্যে রাখতে ডোমিটিয়ান প্রচুর খরচ করতেন। কলোসিয়ামে প্রায়ই নানা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো। অত্যধিক খরচের কারণে কোষাগার শূন্য হয়ে গেলে ডোমিটিয়ান ধনীদের কাছ থেকে ধার কর্জ শুরু করেন। তার মধ্যে ক্যালিগুলা ও নীরুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় জনগণ। এর ফলে একদল সিনেটর হত্যা করেন তাকে। তার জায়গায় সিনেট এম. কক্সিয়াস নের্ভা নামে এক বৃদ্ধ কূটনীতিককে বসায়। ইনি নিজের পরিবারের বদলে সেনাবাহিনী থেকে একজন উত্তরাধিকার নির্বাচন করেন। তার নাম এম. উলপিয়াস ট্রাইয়ানাস (ট্রাজান)। সেনা বাহিনীতে খুব ভাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিলেন ট্রাজান। তার জন্ম স্পেনে, তবে ইটালিয় বংশোদ্ভূত। তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি একদিন রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন।

ট্রাজান উনিশ বছর রাজ্য শাসন করেছেন (৯৮–১১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এ সময়কালে নিজেকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম সেরা শাসক হিসেবে প্রমাণ করেন। তার দুটি লক্ষ্য ছিল ঃ সাম্রাজ্যের সীমান্তে স্থায়িত্ব এবং প্রয়োজনে এর সীমানা বৃদ্ধি, আর ঘরে ও প্রদেশে শৃঙ্খলা রক্ষা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি।

ট্রাজান তার প্রায় প্রতিটি সামরিক অভিযানে সফল হয়েছেন। সাত বছরের অভিযানে (৯৯–১০৬ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি শক্তিশালী তবে প্রায় বর্বর রাজ্য ডাকিয়া (দানিউবের উত্তর তীরে) অধিকার করেন। নিকট প্রাচ্যে পার্থিয়ান রাজা কোসরিওস যখন রোমের ওপর নির্ভরশীল দেশ আর্মেনিয়ায় হামলা চালান, ট্রাজান তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে যান এবং তাকে কয়েকটি যুদ্ধে (১১৪–১১৬ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত করেন। এরপরে সম্রাট নিজেই পার্থিয়া জয় করেন ও রাজধানী টেসিফোন নিজের দখলে রাখেন। রোমের পূর্ব সীমানা প্রথম বারের মত ইউফ্রেটিস ছেড়ে টাইগ্রিসের দিকে এগিয়ে যায় ও রোমান সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে।

ট্রাজান নিজের ঘর সামলাচ্ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে। খ্রিষ্টানদের প্রতি ছিলেন দয়ালু। যদিও এরা এর আগের সম্রাটদের আমলে বহুবার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম সাম্রাজ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেকেই এ ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল। যদিও সরকারী আইনে এটি ছিল নিষিদ্ধ।

ট্রাজান সিনেটকে উজ্জীবিত করে তোলেন, এর একটি উপদেষ্টা মন্ডলী ছিল যারা সম্রাটকে নানা পরামর্শ দিতেন। সম্রাট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিষয়টি নিজে দেখতেন এবং খুব ভালভাবে দেশ চালাচ্ছিলেন। ১১৭ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর সময় ট্রাজানের সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

ট্রাজানের মৃত্যুর পরে তার চাচাত ভাই এলিয়াস হাড্রিয়ানাস (হাড্রিয়ান) ক্ষমতায় বসেন। সামরিক অভিযানের অভিজ্ঞতা থাকলেও তিনি সামরিক অভিযানের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েছেন অভিযান চালাতে। ইহুদি আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে কেল্টদের হামলা ঠেকাতে। নিউক্যাসল থেকে সলওয়ে ফার্থ পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন বিরাট প্রাচীর। এ প্রাচীরের অনেকটা অংশ এখনও আছে।

হাড্রিয়ান ছিলেন বাস্তববাদী, জানতেন পার্থিয়ান শক্তির যে রিজার্ভ বা অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী রয়েছে তার পরিমাণ বিশাল। তিনি আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়াকে তাদের প্রাক্তন মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন তিনি।

হাড্রিয়ান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সরকারের সিভিল সার্ভিসকে এমনভাবে পুনর্গঠিন করেন যাতে সাম্রাজ্যের প্রশাসন তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও যেন কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

হাড্রিয়ান সৃষ্টিশীল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ভালবাসতেন শিল্পকলা ও স্থাপত্য, প্রজাদের কল্যাণের প্রতি সর্বদা নজর ছিল তার। জীবনের শেষ দিকে তিনি তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী টাইটাস অ্যান্টোনিয়াসকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেন।

অ্যান্টোনিয়াস নামটি দিয়েছিলেন পায়াস, যার অর্থ 'ভদ্র। তিনি ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তেইশ বছরের রাজত্বকালে তিনি অল্প কিছু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন আর একটি প্রাচীর বানিয়েছেন স্কটল্যাণ্ডে ফোর্থ থেকে ক্লাইড পর্যন্ত। বর্তমানে এই প্রাচীর লোল্যাণ্ড বা নিম্নভূমি এবং হাইল্যাণ্ড বা উচ্চভূমিকে নির্দেশ করছে।

১৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান অ্যান্টোনিয়াস। গোটা সাম্রাজ্য তার মৃত্যুতে শোকে মাতম করেছে। রোমানরা বহু শতক এরকম শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ পায়নি। অ্যান্টোনিয়াসের জায়গা দখল করেন তার ভাইপো মার্কাস অরিলিয়াস। তিনি দার্শনিক ধরনের কথা বলতেন। দয়ালু এই মানুষটি দেখিয়ে গেছেন সম্রাট হলেও কিভাবে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করা যায়। তিনি নিজের চিন্তাচেতনা নিয়ে মেডিটেশন বা ধ্যান নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বই তার সময়ে অনেকের মাঝে প্রভাব ফেলে ছিল।

মার্কাস আরিলিয়াসের সময়টা কেটেছে যুদ্ধে যুদ্ধে। কখনো নিকট প্রাচ্যে পার্থিয়ানদের সাথে লড়াই করতে হয়েছে কখনোবা দানিউবে এবং ব্রিটেন ও জার্মানীতেও। আর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে প্রচুর অর্থের দরকার হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, টাইগ্রিস নদীর ধারে পার্থিয়ার একটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তার সৈন্যরা ভয়ানক একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ওই অসুখ নিয়ে ইউরোপে ফিরে এসে অন্যদেরকে তারা আক্রান্ত করে ফেললে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।

মধ্য ইউরোপে, মারকোমানি উপজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় মারা যান মার্কাস অরিলিয়াস (১৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। সিংহাসনে আরোহণ করেন তার নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও অপদার্থ পুত্র কমোডাস।

ভেসপাসিয়ানের শুরু করা রোমান সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান হতে থাকে কমোডাসের সময়ে এবং তিনি ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুদ্ধ প্রহরীদের হাতে প্রাণ হারান। এরপরে রোমের দুর্দশাময় সময়ের ব্যাপ্তি বেড়েই চলে।

সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সিনেটকে বাধ্য করে ভবিষ্যতে শুধু সৈন্যরাই সম্রাট হতে পারবে সে আইন মেনে চলতে। কমোডাসের মৃত্যুর পরে কিছু দিন একটা বিভ্রান্তিকর সময়ের মাঝে অতিবাহিত হলেও ১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যরা তাদের প্রিয় ও সবার সেরা সেনাপতি পেরটিনাক্সকে সম্রাট নির্বাচিত করে। আয়ু বেশিদিন থাকলে তিনি ট্রাজান কিংবা ভেসপাসিয়ানের মত মহান সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কিন্তু সিংহাসনে বসার চার মাসের মাথায় তিনি গুপ্তঘাতকের শিকার হন।

এরপরে নব্বই বছর রোমান সিংহাসনে একের পর এক সম্রাট আরোহণ করেছেন। কেউ বা ছিলেন সেনাধ্যক্ষ, কেউ বা প্রাদেশিক, জন্মগত সূত্রে সম্রাট হয়েছেন। অনেকেই ছিলেন নির্দয় ও লোভী, অবিবেচক এবং অত্যাচারী। শুধু সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস ছিলেন ব্যতিক্রম।

এল. সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস (১৯৩–২১১ খ্রীষ্টাব্দ) জাতিতে আফ্রিকান, জন্ম মরক্কোতে। তিনি খানিকটা নিষ্ঠুর স্বভাবের হলেও শাসক হিসেবে ভালই ছিলেন। সৃষ্টিশীল এই মানুষটি শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যাকে উৎসাহ যোগাতেন। তবে তার বেশির ভাগ সময় কেটেছে যুদ্ধ বিগ্রহে। পুবে তিনি পার্থিয়ানদেরকে পরাজিত করেন এবং মেসোপটেমিয়াকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। ব্রিটেনে পিক্টদেরকে এক মহা লড়াইতে পরাজিত করে লম্বা সময়ের জন্যে তাদেরকে বিতাড়িত করেছেন। ২১১ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্কে মারা যান সেভেরাস দুই পুত্র কারাকাল্লা ও গেটাকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে। গেটাকে হত্যা করে কারাকাল্লা একাই রাজ্য শাসন শুরু করেন।

কারাকাল্লা নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী সম্রাট ছিলেন। তার একমাত্র অবদান রোমে বিশাল ও চমৎকার কিছু গণ স্নানাগার নির্মাণ এবং কনষ্টিটিউটিউ অ্যান্টোনিনিয়ানা আইন প্রণয়ন যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রজা রোমান নাগরিকত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়।

কারাকাল্লার পরে আক্ষরিক অর্থেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট দেশ চালাতেন। একজন নির্বাচিত হতেন প্রিটোরিয়ান রক্ষীদের দ্বারা, অপরজন সেনাবাহিনীর সাহায্যে। এর ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো তাতে অনিবার্যভাবে একজনকে মরতে হতো। দেশকে এ জন্যে খুবই দুর্দশায় পড়তে হয় কারণ সরকার ও কর্মকর্তাদের সততা বলে কিছু ছিল না। করের হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। মড়ার ওপরে খাড়ার ঘা'র মত প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এদিকে বর্বর জার্মান স্লাভ, হুন, তুর্কী ও মঙ্গোলিয়ানরা উত্তর ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে এসে সাম্রাজ্যের সীমানায় চাপ সৃষ্টি করছিল।

২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন নতুন সম্রাট নির্বাচিত হন। ইনি জি. অরিলিয়াস ভ্যালেরিয়াস ডাইওক্লেটিয়ানাস বা ডাইওক্লেটিয়ান। ইলিরিয়া (বর্তমান যুগোশ্লোভিয়া) থেকে আসা এক ক্রীতদাসের সন্তান ডাইওক্লেটিয়ান সাম্রাজ্যে অনেকটাই আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। প্রথমেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুবিশাল এ সাম্রাজ্য কেবলমাত্র একজনের পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে দুইভাগে ভাগ করেন তিনি। পুবের অংশ তিনি নিজেই শাসন করতে থাকেন। এ অংশে ছিল নিকট প্রাচ্য, মিশর, অ্যানাটোলিয়া, গ্রীস ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ। পশ্চিম অংশ শাসন করার ভার দেন বন্ধু ম্যাক্সিমিয়ানকে। এ অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইটালি, গল, স্পেন, উত্তর আফ্রিকার বাকি অংশ ও ব্রিটেন। ডিওক্লেটিয়ান সাম্রাজ্যের অধিকতর শক্তিশালী অংশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দুই সম্রাটই একজন করে সিজার বা উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন, পুবের জন্যে গ্যালেরিয়াসকে ও পশ্চিমের জন্যে কন্সটানটিয়াসকে। 'সম্রাটের বোর্ড' কয়েক বছর রাজ্য শাসন করেছেন। ডিওক্লেটিয়ান মূলতঃ প্রশাসনিক কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সামরিক অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন বন্ধুদের কাঁধে। গ্যালেরিয়াস ২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্সিয়ানদেরকে পরাজিত করেন আর ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা পিক্ট ও স্কটদের বিপজ্জনক বিদ্রোহ সাফল্যের সাথে দমন করেন কন্সটানটিয়াস।

ডিওক্লেটিয়ান রোমে বাস করতেন না। খুব কমই যেতেন ও শহরে। দরবার ও প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন এশিয়া মাইনরের নিকোমেডিয়ায়। ম্যাক্সিমিয়ানের দরবার ছিল মিলানে, কন্সটানটিয়াসেরটি রাইনের তীরে ট্রিয়েরে।

ডিওক্লেটিয়ান সরকার ও সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন করেন এমনভাবে যাতে প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন মন্ত্রিসভা। সিভিল সার্ভিসকে বিকেন্দ্রীকরণ করে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়–সামরিক ও বেসামরিক। সাম্রাজ্যকে বারটি ডাইওসেস বা আঞ্চলিক সরকারে বিভক্ত করা হয়। আবার প্রতিটিকে নতুন করে ভাগ করা হয়েছিল। অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়, নতুন কর প্রথা চালু হয়। ডিওক্লেটিয়ান জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণও নির্ধারণ করে দিতে চেয়েছিলেন।

৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন ডিওক্লেটিয়ান, ম্যাক্সিমিয়ানকেও অবসর নিতে বাধ্য করেন। গ্যালেরিয়াস ও কন্সটানটিয়াস সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন অগাষ্টি নামে, নতুন দু'জন সিজার নিয়োগ করা হয়। একজন ছিলেন কন্সটানটিয়াসের ছেলে তরুণ ফ্লাভিয়াস ভ্যালেরিয়াস কন্সটানটিয়াস (কন্সটানটিন)। পিতার মৃত্যুর পরে কন্সটানটিন ইয়র্কে ঘাঁটি গেড়ে বসা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে নেন এবং ৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে অগাষ্টাস গ্যালেরিয়াসকে বাধ্য করেন তাকে সিজার হিসেবে ঘোষণা করার জন্যে। গ্যালেরিয়াসের মৃত্যুর পরে কন্সটানটিন তার প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে লড়াইতে পরাস্ত করেন।

৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কন্সটানটিন ছিলেন রোমের একমাত্র সম্রাট এবং এ ক্ষমতাবলে ডিওক্লেটিয়ানের অসমাপ্ত পুনর্গঠনের কাজ আবার শুরু করে দেন। প্রথমে তিনি একটি নতুন শহর গঠন করেন, নাম কন্সটান্টিনোপল। এ শহর থেকে সহজেই ইউরোপ থেকে এশিয়ায় প্রবেশ করা যেত। তিনি রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নতুন শহরে বসে প্রশাসনিক কাজ চালাতে থাকেন।

কন্সটানটিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং খ্রিষ্টধর্মকে তিনি রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করেন। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্চের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় কাউন্সিল অব নিসাইয়ায়।

কন্সটানটিন 'দ্য গ্রেট' মারা যান ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তার সাম্রাজ্য আবার উত্তরাধিকারীদের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যায়। এরপরে পুব ও পশ্চিমের মধ্যেকার সহযোগিতা মূলক সম্পর্কের দিন দিন অবনতি ঘটতে থাকে। বর্বররা পশ্চিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘেরাও অভিযান বৃদ্ধি শুরু করে। গথ ও ভ্যাণ্ডালরা গল, স্পেন, উত্তর আফ্রিকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অ্যাঙ্গল, জুট ও স্যাক্সনরা ঘেরাও করে ব্রিটেন, আর এর পেছনে, পূর্ব ইউরোপে, এশিয়ার হুন ও মঙ্গোলরা চাপ দিতে থাকে।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমের সাম্রাজ্যে বর্বরদের হামলা বেড়ে যায় এবং এক সময় তারা প্রভু হয়ে বসে। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালারিক দ্য গথ রোম দখল করে লুণ্ঠন করেন। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডের ওটাই ছিল রোমবাসীর জন্যে সবচেয়ে বড়

দুঃস্বপ্নের দিন। চল্লিশ বছর পরে অ্যাটিলার নেতৃত্বে হুনরা গল ও উত্তর ইটালিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্যালনে সাহসী প্যাট্রিশিয়ান সেনাপতি এটিয়াসের কাছে তারা পরাজিত হয়। তবে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভান্ডাল সর্দার জেনসেরিক দখল করেন রোম। এরকম ঘটত না যদি না এর আগের বছর সম্রাট তৃতীয় ভ্যালেনটিনিয়ান এটিয়াসকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। কুড়ি বছর বাদে জার্মান সর্দার ওডোসার শহরে ঢুকে সম্রাট রোমুলাস অগাষ্টালাসকে (৪৭৬) সিংহাসনচ্যুত করেন। রাজধানী হিসেবে রোমের পতন ঘটে, পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যেরও অবসান হয়।

তবে রোমান সভ্যতার মৃত্যু হয় নি। এখানে সেখানে বর্বররা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল এবং বিশপ ও খ্রীষ্টদের সাহায্যে রোমান মেজিষ্ট্রেসী স্থাপন করছিল। তবে পশ্চিম ইউরোপে একটি জিনিসের বড় অভাব অনুভূত হচ্ছিল– সংহতি বা একতা। বহিরাগতরা ওখানে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করছিল। নতুন ইউরোপকে একক রাষ্ট্র ও জাতির মাঝ থেকে বড় হতে হচ্ছিল।

# বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য

৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কন্সটানটিন মারা যাবার সময় সাম্রাজ্য রেখে যান তার উত্তরাধিকারী তিন পুত্র ও দুই ভাইপোর কাছে। কাজেই কে ক্ষমতায় বসবে তা নিয়ে বিবাদ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ষোল বছর বাদে দ্বিতীয় কন্সটানটিয়াস তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসেন। কন্সটানটিয়াস তার চাচাত ভাই জুলিয়ানাসকে (জুলিয়ান) পশ্চিমের সিজার হিসেবে নিযুক্ত করেন। একজন শান্ত, বিচক্ষণ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত জুলিয়ান হঠাৎ করেই নেতৃত্বের গুণ নিয়ে ঝলসে ওঠেন। ৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাসবার্গের যুদ্ধে তিনি জার্মানদেরকে পরাজিত করেন। তার সৈন্যরা তাকে খুব পছন্দ করত তাই তাকে অগাস্টাস হিসেবে নির্বাচিত করে, যদিও কন্সটানটিয়াস তখনো জীবিত। দুই সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবার অবস্থা। তবে কন্সটানটিয়াস মারা গেলে যুদ্ধটা আর বাধেনি।



*কন্সটানটাইন দ্য গ্রেট প্রতিষ্ঠা করেন কন্সটান্টিনোপল। এ শহর এগারশ বছরেরও বেশি কাল রোমের রাজধানী ছিল।*

৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হন জুলিয়ান। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন না– বরং এ ধর্মকে বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। কারণ খ্রিস্টধর্ম গ্রাসিও রোমান সাম্রাজ্যের জন্যে

বিপজ্জনক ছিল। জুলিয়ান সাম্রাজ্য খ্রিস্টধর্ম নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন, লোকজনকে বলতেন প্রাচীন দেব-দেবীর পুজো করতে। তবে পার্সিয়ায় যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি এদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে পারেননি। তবে পার্সিয়ার যুদ্ধে তেমন সফল হতে পারেননি জুলিয়ান, দেশে ফেরার পথে খুন হয়ে যান।

জুলিয়ানের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন দুই সেনাপতি, প্রথমে জোভিয়ান, তারপরে প্রথম ভ্যালেন্টিনিয়ান। এরা ক্ষমতায় বসেই সাম্রাজ্যকে দু'খন্ড করে ফেলেন। জোভিয়ান পশ্চিমাংশের ভার নিয়ে পূর্বাংশের দায়িত্ব অর্পণ করেন ভাই ভ্যালেন্সের ওপর। ৩৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভ্যালেন্স ভিসিগোথের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ হারান। তার জায়গায় আসেন তার ভাইয়ের এক সেনাপতি থিওডোসিয়াস। ইনি তার রাজত্বের শেষ দিকে পূর্ব ও পশ্চিমকে কয়েক মাসের জন্যে একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্ব সাম্রাজ্য যা পরে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে এর রাজধানী কন্সটানটিনোপল পুরানো বাইজেনটিয়ামের তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এ রাজ্য বর্বরদের হামলার হাত থেকে ছিল মুক্ত। বলকান সীমান্তেই শুধু নয়, কন্সটান্টিনোপলে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলার কারণেও এটি বিপদ মুক্ত ছিল। কমপক্ষে এক হাজার বছর কনস্টান্টিনোপল নিরাপদে থেকেছে। পূর্বের সম্রাটরা নানাভাবে তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করেছেন।

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস ন্যায় বিচারের প্রতি ছিলেন অনুগত এবং রোমান আইনে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন তিনি। তিনি কন্সটান্টিনোপলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যেখানে রোমান ও গ্রীকদের শিক্ষা ব্যবস্থা সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

থিওডোসিয়াসের উত্তরসুরিরা সম্রাটের অসমাপ্ত কাজে সমাপ্ত করেছেন। অ্যানাস্তাসিয়াস (৪৯১–৫১৮) কন্সটান্টিনোপলের শক্তিশালী দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন এর চারিদিকে লম্বা প্রাচীর তুলে।

৫২৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন একজন মানুষ, যাকে বলা হতো 'রোমানদের শেষ জন।' তার নাম জাস্টিনিয়ান। ইনি শিক্ষানুরাগী, বদমেজাজী ও নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাকে আসলে আঙ্গুলের ইশারায় চালাতেন তার স্ত্রী থিওডোরা। রাজন্য বর্গের মধ্যে থিওডোরার প্রিয়ভাজন ছিলেন কেউ কেউ। এদের সন্তুষ্টির জন্যে তিনি মাঝে মাঝে অনেক অন্যায় আচরণ করেছেন।

জাস্টিনিয়ান পুরানো সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্রিত করতে। দক্ষ সেনাপতি বেলিসারিয়াসের সহায়তায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছেন। তাদের প্রথম বিজয় ছিল সাসানিড পার্সিয়ান রাজা কসরেসের বিরুদ্ধে। তারপর বেলিসারিয়াসকে উত্তর

আফ্রিকায় পাঠানো হয়। ওখানে সংক্ষিপ্ত অভিযানে তিনি ভান্ডালদেরকে পরাজিত করে কার্থেজ দখল করেন। ৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ীর বেশে রোমে ঢোকেন বেলিসারিয়া।

তবে এ বিজয়ের স্বাদ বেশিদিন উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। বেলিসারিয়াসকে আর্মেনিয়ায় পাঠানো হয় পার্সিয়ান হামলা ঠেকাতে। তার অবর্তমানে অসট্রোগথস ইটালি দখল করে বসেন।

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পরে বাইজেনটাইনের সামরিক ও রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ছেয়ে যায়। দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে হয় সাসানিড নয়তো বর্বররা সাম্রাজ্যের ওপরে একের পর এক হামলা চালিয়ে গেছে এবং সাম্রাজ্যকে পরাজয়ের গ্লানি সইতে হয়েছে। ৬১০ খ্রীস্টাব্দে দৃশ্যপটে হাজির হন হেরাক্লিয়াস, এক নতুন সেনাপতি। এর জন্ম এশিয়ায় হলেও বাইজেনটাইনের প্রতি ছিলেন অনুগত। হেরাক্লিয়াস ছিলেন দুর্দান্ত সাহসী ও অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক। তিনি সাম্রাজ্যের অনেক হারানো রাজ্য যুদ্ধ করে উদ্ধার করেন, পার্সিয়ানদের ঠেলে পাঠিয়ে দেন তাদের নিজেদের রাজ্যে এবং দখল করেন টেসিফিওন, যেখানে ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে যীশু খ্রিষ্টের ক্রুশটি উদ্ধার করেন। ওখানে যীশুকে ক্রস বিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ক্রুশ চৌদ্দ বছর আগে জেরুজালেম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় কসরোস।

আরবরা হামলা চালিয়েছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যে। তারা আর্মেনিয়া, সাইপ্রাস, রোডস সহ বাইজেনটাইনের অন্যান্য অঞ্চলে লুণ্ঠন চালায়। তবে ৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে আরব নৌবহর রাজধানীতে হামলা চালিয়ে সুবিধে করতে পারেনি, বরং হঠে আসতে হয়েছিল। পরবর্তী পঁচিশ বছরে বহুবার হামলার শিকার হয়েছে রাজধানী, তবে দখল করতে পারেনি আরবরা। বাইজেনটাইনরা ন্যাপথার তৈরি আগুনের গোলা ছুঁড়ে জ্বালিয়ে দিত আরবদের জাহাজ। আরবরা জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতো।

তবে সুখে দিন কাটেনি বাইজেনটাইনের। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী এর সকল অঞ্চল বারবার হামলা ও লুটের শিকার হয়েছে। শুধু মুসলিমরা নয়, বুলগেরিয়ার অসভ্যরাও হামলা চালিয়েছে। তবে বাইজেনটাইনের সম্রাট বুলগেরিয়ানদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার পরে এ হামলা বন্ধ হয়েছে।

বাইজেনটাইনরা তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ইটালি ছেড়ে দেয়। ৮০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাদের সীমানা বলতে শুধু ছিল গ্রীস ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় বাগদাদের খলিফা ও বুলগেরিয়ানদের সঙ্গে। স্বস্তিকর এ পরিবেশে বৃদ্ধি পায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি ঘটে শিল্পকলার। এ সময়ে বাইজেনটাইনরা তৈরি করেছে চমৎকার সব ক্যাথেড্রাল

পার্সিয়ানদের আদলে। যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাথেড্রাল তৈরি হয়েছে ২৫০ বছর আগে, জাস্টিনিয়ান দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয় ও মঠগুলোতে সন্ন্যাসীরা চমৎকার সব পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের মুকুট নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু চলছিলই।

নবম শতকে ভাইকিং হামলাকারীদের দ্বারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাইজেনটিয়াম। ফিনল্যান্ড সুইডেনের এই নরডিক যোদ্ধারা তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ নিয়ে, কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে, রাশিয়া হয়ে এগিয়েছিল রাজধানীর দিকে। তবে রাজধানী দখল করতে না পারলেও সম্রাটের সৈন্যরা এই লুটেরাদের উপর্যুপুরি হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল। নরডিক যোদ্ধাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও হত্যা। তারা গোটা পশ্চিম ইউরোপ ও ব্রিটেন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিল। একই সময়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত আরব জলদস্যুদের হামলার শিকার হয় বাইজেনটিয়াম।

তবে সেনাপতি বারডাস, সম্রাট প্রথম নিসেফোরাস (৯৬৭-৯) জন জিমিসচেস (৯৬৯-৯৭৬) এর নেতৃত্বে আরব জলদস্যু বা মুসলিমদেরকে এশিয়া মাইনর ক্রীট ও সাইপ্রাস থেকে বিতাড়িত করা হয়। বাইজেনটাইন বাহিনী আরবের ৩০০ বছর ধরে দখল করে রাখা সিরিয়াও পুনরুদ্ধার করে। বাইজেনটাইন নেতারা তাদের অভিযানকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত করতেন। তাদের সৈন্যদের মধ্যেও ধর্মযুদ্ধের চেতনা জাগিয়ে তোলা হতো যেভাবে হযরত মোহাম্মদকে অনুসরণ করতেন তার ভক্তরা। দশম শতকের শেষভাগে বাইজেনটিয়াম প্রায় জাস্টিনিয়ানের সময়ের মতই সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়।

তবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করার সময় আবার পূর্ব থেকে হুমকি চলে আসে। প্রায় সভ্য তুর্কী বা সেলজুকরা আর্মেনিয়ায় হামলা শুরু করে এবং ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী এলাকাগুলোও তাদের হামলার শিকার হতে থাকে।

এ সময়ে আরবরা তাদের অধিকৃত দেশগুলোতে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের ঢুকতে দিলেও (এমনকি প্যালেস্টাইনেও) সেলজুকরা অতটা ধৈর্যশীল ছিল না। তারা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বভাবের। তারা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নির্মম আচরণ শুরু করে, তাদেরকে শারীরিক অত্যাচার করে মেরেও ফেলত। ফলে তুর্কীদের সঙ্গে বাইজেনটিয়ামের বিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং এগার শতকের শেষ নাগাদ প্রায় গোটা পশ্চিম ইউরোপ এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ ছিল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কাল। এ সম্পর্কে আটত্রিশতম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

# ইসলামের উত্থান

৬০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে বাইজেনটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য প্রায়ই হামলার শিকার হতো আরব অশ্বারোহী ও উটের পিঠে চেপে আসা যোদ্ধাদের দ্বারা। এই আরবরা ছিল প্রায়-সভ্য সেমিটিক জনসাধারণ, আগমন ঘটেছিল আরবদের মরুভূমি থেকে। বহু বছর তারা পার্সিয়ান এবং বাইজেনটাইন সীমান্ত রক্ষীদের তাড়া খেয়েছে এবং আশ্রয়ের অভাব, পানি ও খাদ্যের অভাব এবং কোথাও থিতু হয়ে বসতে না পারায় সাধারণের মনে হতাশা ইত্যাকার নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তাদেরকে চলতে হচ্ছিল।

এই ভবঘুরে আরবরা ছিল চিন্তাশীল ও ধর্মপরায়ণ। তবে খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ফারসী ধর্ম সম্পর্কে তারা অবগত থাকলেও এসব ধর্ম তাদের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা হিব্রুদের ধর্মমতের সাথে বরং ঘনিষ্ঠ ছিল। কারণ হিব্রুরাও জাতিতে ছিল সেমেটিক, আর তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত।

তারপর সপ্তম শতকে এক মধ্যবয়স্ক আরব তাদেরকে নতুন এক ধর্মমতে বিশ্বাসী করে তোলেন। তার নাম মোহাম্মদ।



*পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা পাথরে চুমু খেতে সারা বিশ্ব থেকে ছুটে আসেন লাখো মুসলমান।*

মহম্মদের জন্ম মক্কায়, ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে। তার বাবা ছিলেন সওদাগর। বড় হবার পরে পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে যান মহম্মদ। মক্কায় দূর দূরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণরা আসত পবিত্র কাবা পাথর দর্শনে। এ পাথর আব্রাহাম নিয়ে আসেন বলে কথিত আছে।

চল্লিশ বছর বয়সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেন মহম্মদ এবং ধর্মকর্মে মন দেন। তিনি ইবাদত আর ধ্যান করতেন, সাহায্য করতেন গরীবদেরকে। যীশুর মত তারও কিছু ভক্ত জুটে যায়। তিনি সততা ও সদাচরণের কথা বলতে থাকেন, বলেন আল্লাহ্ই তার একমাত্র অনুপ্রেরণা।

আরবরা নানা দেবদেবীর পূজা করত বলে মহম্মদ তাদেরকে ভৎর্সনা করতেন। বলতেন একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদত করা উচিত। কারণ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঠিক এই কথা মোজেস ইয়াওয়েহ সম্পর্কে টেন কমান্ডমেন্টসে বলে গিয়েছিলেন কয়েক শতক আগে।

শুরুতে মহম্মদের শিক্ষা আরবদের মনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মক্কা থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়। ভাগ্য জোরে বেঁচে যান তিনি। পালিয়ে যান মদিনায়। ওখানে নিজের ধ্যান ধারণা প্রকাশের মোটামুটি উপযোগী একটি পরিবেশ পেয়েছিলেন। দশ বছরের মধ্যে প্রচুর সমর্থক জুটে যায় তাঁর। ক্ষুদ্রাকারে হলেও একদল বাহিনী মহম্মদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও ছিল প্রস্তুত।

মহম্মদের ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমে ইসলামের বিশ্বাস নামে পরিচিতি পেতে থাকে, তার অনুসারীরা পরিচিত হন মুসলমান নামে। একটা সময় গোটা পৃথিবীতে, উত্তর আফ্রিকা থেকে ইস্ট-ইন্ডিজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা। বর্তমানে চারশো কোটিরও বেশি মুসলমান রয়েছে এবং ধর্মীয় নীতিগুলোর প্রতি তাদের বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে সামান্যই।

মহম্মদের শিক্ষা কোরান নামে গ্রন্থাকারে বিস্তৃতি লাভ করে। খ্রিস্টানদের বাইবেলের মত কোরানও মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। মুসলিম পঞ্জিকাও প্রকাশিত হয়। সে পঞ্জিকায় মদিনা থেকে মহম্মদের হজ্বব্রত (হিজরা) পালন করে আসার আগের ও পরের সকল ঘটনা বিধৃত রয়েছে। এ ধর্মের একটি মূলনীতি হলো ধর্মটি গ্রহণের ব্যাপারে সকলকেই সুযোগ দেয়া। এ ধর্মে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই করার কথা বলা হয়েছে, তবে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় মুসলিমরা সবসময়ই অন্যদের ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ধৈর্যশীল ছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সময় খ্রিস্টানদেরকে যে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, মুসলমানরা কখনো অবিশ্বাসীদেরকে সেভাবে হয়রানি করেনি।

৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর সময় গোটা আরব জাহান ইসলাম কবুল করে। তার মৃত্যুর পরে ইসলামের আলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ ক'জন অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য মানুষ। ওই সময় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। খলিফা আবু বকর ক্রুসেডের জন্যে আরবদেরকে একত্রিত করে একটি সুসংহত বাহিনী গড়ে তোলেন। আবু, তার সহ কর্মীরা এবং উত্তরাধিকাররা বিশেষ করে ওমর (৬৩৪-৪৪) ও ওসমান (৬৪৪-৫৬) পৃথিবী জয়ের জন্যে বেরিয়ে পড়া বিরাট বাহিনীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাদেরকে বলা হতো যুদ্ধে মারা গেলে বা শহীদ হলে তাদের জায়গা হবে বেহেশতে, আল্লাহ'র পাশে।

আরবদের হামলা ঢেউয়ের মত একের পর এক ছড়িয়ে পড়ছিল ৬৩৫ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় আরবরা আকার ও দক্ষতার দিক থেকে নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করে। নিকট প্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরে অভিযান চালানোর সময় তারা দুটি বিকল্প রেখেছিল। হয় আল্লাহর পথ নয়তো তরবারির আঘাত। তারা হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয় একের পর এক বিজয় অর্জন করে।



*ইরানের দশম শতকের সোনার কলসি।*

তবে আরবদের সামনে প্রথম যে বিশাল শক্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে তা ছিল সাসানিড পার্সিয়া। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে আরব নেতারা বাইজেনটাইনদেরকে সিরিয়া, আর্মেনিয়া ও মিশর থেকে উৎখাত করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। মহম্মদের মৃত্যুর পরে আরবরা ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে কুফার যুদ্ধে ধ্বংস করে দেয় পারস্য সেনাবাহিনীকে। তারপরে তারা শেষ সাসানিড রাজা ইয়াজতিগার্ডকে সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে।

এই কঠিন ও প্রায় অজেয় যোদ্ধারা বিশাল অঞ্চল দখল করার পরে শহর নির্মাণের দিকে নজর দেয়। তারা দামাস্কাস, বাগদাদ ও কায়রোতে চমৎকার সব নগরী গড়ে তোলে। তারা বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ওগুলোর উন্নয়ন সাধন করে। তারা ভূমির উন্নয়ন করেছে, শিল্প ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে। একই সাথে প্রজাদেরকে যে যার ধর্ম পালনেও বাধা দেয়নি।

৬৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ খলিফা হয়ে ওঠেন সাম্রাজ্যের বংশগত রাজতন্ত্র। প্রাচীন নানা সভ্যতার মত ইসলামেরও ডাইনাস্টি ছিল। প্রথম ডাইনাস্টি ছিল খলিফা ওমায়েদের (৬৫৮-৭৫০)। তারা দামাস্কাস থেকে মুসলিম বিশ্ব শাসন করতেন। এরপরে আসেন আব্বাসীরা, এরা ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদ থেকে রাজ্য শাসন করেছেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদকে খলিফাদের সরকারি রাজধানী বানানো হয়। তবে অন্যান্য সভ্যতার মত ইসলামেও অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে পরিবেশ এমনই প্রতিকূল হয়ে উঠত যে সম্ভাবনাপূর্ণ সভ্যতা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের কোন উন্নতিই ঘটত না।

সপ্তম শতকের শেষ ভাগে আরবরা আবার বিজয় অভিযানে নেমে পড়ে। তাদের গতি এত দ্রুত এবং ব্যাপক ছিল যে ভারতের কিছু অংশ দখল করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে যায়। তবে ওখানেই তারা ক্ষান্ত হয়।

আরবরা এরপরে ঘুরে দাঁড়ায় উত্তর আফ্রিকান উপকূলের দিকে এবং মরক্কো পর্যন্ত দখল করে ফেলে (৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ)। কেউ কেউ দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে, ভয়ংকর সাহারা মরুভূমি পার হয়ে সেনেগাল, নাইজেরিয়া ও ঘানা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। একদল পৌছে যায় সুদানে (তখন এ দেশের নাম ছিল নুবিয়া)।

আরবরা বাইজেনটিয়ামের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর ওখানে প্রথম বড় ধরনের পরাজয় ঘটে তাদের। মাঝে মাঝেই তারা কনস্টান্টিনোপল দখলের চেষ্টা করেছে তবে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তারা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল, বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের পাহাড় ও মূল্যবান শহরগুলো। অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে তারা এশিয়া মাইনর থেকে ভূমধ্যসাগর, মিশর ও মরক্কো ছাড়িয়ে অনেকটা অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তারা ইতিহাসের অন্যতম বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের দাবীদার।

ইসলামী সভ্যতা শুধু মারামারি কাটাকাটি আর রাজ্য জয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা সমাজ গঠন করেছে, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাও করেছে। বিজ্ঞান ভেষজ, আইন, দর্শন সব ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ সাধন করে চলছিল ইসলাম। গ্রীস, পার্সিয়া, ভারত, রোমসহ নানা জায়গা থেকে পণ্ডিতরা আরবে এসেছেন।

তবে মুসলিমরা সবজায়গায় অজেয় ছিল না। আরবরা স্পেন জয় করলেও চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়।

তবে এরকম ছোটখাট পরাজয়ের গ্লানি সয়েও ইসলামের প্রচণ্ড শক্তি ও প্রভাব ছড়িয়ে চলছিল। মুসলমানরা বাণিজ্যের নতুন নতুন রাস্তা আবিষ্কার করে ধনী হয়ে ওঠে। চীনারা দু'হাজার বছর ধরে সিল্ক তৈরির রহস্য বাইরের পৃথিবীর কাছে চাপিয়ে রাখলেও মুসলমানরা হঠাৎ করেই ওই রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলে এক

বাইজেনটাইন সওদাগরের সাহায্যে। তারপর তারা নিজেরাই সিল্ক তৈরি শুরু করে।

৭৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আব্বাসীয়রা ওমায়েদদেরকে দামাস্কাস থেকে বিতাড়িত করে। তারপর রাজধানী স্থাপন করে বাগদাদে। এক ওমায়েদ যুবরাজ পালিয়ে যান মরক্কোয়। সেখান থেকে ঢুকে পড়েন স্পেনে এবং ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী সহ একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন কর্বোডায়। এ শতকের শেষ দিকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য, স্পেন ও মরক্কোতে ইসলামের বিস্তার ঘটে। এর ফলে আরব সংস্কৃতির প্রসার ঘটার সুযোগ হয়। গ্রীক জ্যামিতি, ফারসী জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবী রসায়ন সর্বত্র পড়ানো হচ্ছিল। আধুনিক গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের ভিত্ গড়ে তুলেছিল মূলতঃ ইসলামই।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, নিকট প্রাচ্য- এমনকি দূর প্রাচ্যেও শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল, সবাই শিল্পকলার প্রতি হয়ে উঠছিল আগ্রহী। নবম শতকের মাঝামাঝিতে ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্য নানা জাতির হামলার সহজ শিকার হতে থাকে। হামলাকারীদের মধ্যে ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আসা ভাইকিং, উত্তর জার্মানীর ল্যাঙ্গোবার্ড, রাশিয়ার মাগিয়ার, ও উত্তর আফ্রিকার আরব জলদস্যু। ইসলাম এ হামলা সয়ে টিকে থাকলেও ক্রমে দুর্বল ও পরিবর্তিত হয়ে চলছিল। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ হয়ে ঈশান কোণে উঁকি দেয়- মধ্য রাশিয়া থেকে আসা তুর্কীরা।

# ইউরোপে অশান্তি

পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে পশ্চিম ইউরোপে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমে হামলাকারী গথ, ভিজিগথ ও ভ্যাণ্ডালদেরকে 'বর্বর' বলে অভিহিত করলেও এরা আসলে অসভ্য বা বুনো ছিল না। এক শতকেরও বেশী সময় তারা রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছে বসবাস করেছে এবং রোমান সংস্কৃতির সাথে তারা সুপরিচিত ছিল। তারা নিজেদের সভ্যতার পথও শুরু করে দেয়।

বর্বররা পশ্চিম ইউরোপের ঐক্য ভেঙে দেয়। এর মানে নতুন ধরনের সরকার, নতুন আইন-কানুন ও নতুন আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপে মাত্র একটি বিষয়ের ঐক্য ভাঙেনি তা হলো ক্রিশ্চিয়ানিটি, এ ধর্মের গির্জা তখনো শাসন করত রোম পোপের সাহায্যে। ওই সময় পোপের উপাধি ছিল 'পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস।'



*১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ক্রিসমাসে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে উইলিয়াম দ্য কনকারারকে মুকুট পরানো হচ্ছে।*

পশ্চিম ইউরোপের পরবর্তী দুশো বছরের ইতিহাস বিশৃঙ্খলার ইতিহাস, হানাহানি, হামলা, প্লেগ, বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থবিরতা লেগেই ছিল। এ অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকবর্তিকা হয়ে টিকে থেকেছে ক্রিশ্চিয়ানিটি। গোটা পশ্চিমে একদল শিক্ষিত ও ধার্মিক মানুষ, যাদের বলা হতো মঙ্ক, বিশ্বাসের আলোয় উজ্জীবিত হয়ে ধর্মীয় শৃঙ্খলা গঠন করেন, ক্ষুদ্র সরকার নিয়ে তৈরি করেন সভ্যতার ছোট ছোট একক। সদস্যদের জন্যে তারা মঠ বানিয়ে দেন যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মচর্চা করা যায়। মঙ্করা বর্বরদের কাছেও গিয়েছিলেন তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে। তারা আইনি পরামর্শ দিতেন, অসুস্থদের জন্য ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা যোগাতেন, ক্ষুধার্ত কিংবা ঘরহীন মানুষের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন।

মঙ্করা সব ধরণের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে তারা কপি করতেন। এভাবে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় কারণ মূল কপিগুলো অস্থির সময়ে হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মঙ্করা নিজেরাই শস্য উৎপাদন করতেন, পালন করতেন গবাদি পশু ও তৈরি করতেন মদ ও এল্। তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে শত শত বছর ধরে। আইরিশ মঙ্ক, পণ্ডিত ও চিত্রশিল্পীরা ছিলেন সবচে' সক্রিয়। তারা এ সময়ে শিল্প ও সাহিত্যে সোনালি যুগের সূচনা করেন আয়ারল্যাণ্ডে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের বিশৃংখলার সময়ে কয়েকটি জাতির উত্থান হতে শুরু করে। এ জাতিগুলো ক্রমে নিজেদের ভাষার, যার ভিত্ ছিল মূলতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন (ব্রিটিশ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ বাদে) বিবর্তন করতে থাকে। প্রত্যেকেই পশ্চিমা বিশ্বে একটি ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছিল। সবচে' কর্মঠ ও উৎসাহী জাতি ফ্রাঙ্করা নতুন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে, নাম দেয় ফ্রান্স। ফ্রাঙ্কদের প্রথম নেতা ক্লোভিস (৪৮১-৫১১) ৫০৩ খ্রীস্টাব্দে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রজাদেরকেও এ ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তিনি গল, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড জয় করেছিলেন। তার মৃত্যুর পরে ফ্রাংকিশ রাজ্য ভেঙে যায় যা ৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ক্লোথেয়ার সিংহাসনে বসার আগ পর্যন্ত জোড়া লাগেনি। ক্লোথেয়ারের মৃত্যুর পরে আবার ভাঙনের শব্দ শোনা যায় এবং এ দশা চলছিল ৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

আগে, বাইজেনটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান অস্ট্রোগথদেরকে ইটালি থেকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং পেনিনসুলাকে ফিরিয়ে আনেন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। তবে এ অবস্থা বেশিদিন চলেনি। ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে, আরেক ভয়ঙ্কর উপজাতি জার্মানী যোদ্ধা লোমবার্ডরা এ সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে প্রায় গোটা দেশ লুট করে। এ দেশে তারা প্রায় পৌনে দুশো বছর ছিল। তবে তারা রোমের চার্চের কোন ক্ষতি করেনি এবং এর প্রধানকে খ্রিস্টানদেরকে আশীর্বাদ করা থেকেও বিরত রাখেনি।

এদিকে ভিসিগথরা পেনিনসূলায় পিরেনিজ পর্বতমালা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে রোমান ও স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে থাকতে শুরু করে। এক সময় তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তাদের রাজা প্রথম রিকার্ডের অধীনে, ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে। এসময় শিল্প-সাহিত্যকে উৎসাহ দেয়া হয়। এ সময় সেভিলের বিশপ ইসিডোর Etymologiae নামে একটি বই লেখেন। এটা অনেকটা এনসাইক্লোপিডিয়া অব নলেজের মত। এ বই মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিন্তাবিদদেরকে দারুণভাবে প্রবাহিত করে।

এ সময় ব্রিটিশ আইল বারবার বর্বর হামলার শিকার হচ্ছিল। ইটালিকে গথিক আক্রমণের (৪০৮-১০) হাত থেকে বাঁচাতে রোমান বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং ব্রিটিশ কেল্টরা আত্মরক্ষার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। ওই শতকের মাঝামাঝি হামলাকারীরা ব্রিটেনে আস্তানা গাড়তে শুরু করে। ডেনমার্ক থেকে জুটরা আসে দুই নেতা হেংগিস্ট ও হোরসার নেতৃত্বে। তারা ৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে কেন্টে ঢুকে পড়ে এবং দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে লুঠতরাজ চালায়। ৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে হামলাকারীদের আরেকটা ঢেউ, এবারে উত্তর জার্মানী থেকে আসা স্যাক্সনরা তাদের সর্দার এইলার নেতৃত্বে ঢুকে পড়ে সাসেক্স ও হ্যাম্পশায়ারে এবং প্রতিষ্ঠা করে সাসেক্স রাজ্য। ৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে আরেক দল হামলাকারী, এরাও স্যাক্সন, নেতা সারডিকের অধীনে সাউদাম্পটন ওয়াটার থেকে এসে টেস্টের পশ্চিমাঞ্চল দ্রুত দখল করে ফেলে এবং গঠন করে ওয়েসেক্স রাজ্য।

পরের শতকে জার্মানীর এঙ্গেলরা উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে নরফোক, লিংকনশায়ার ও ইয়র্কশায়ারে এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে মিডল্যাণ্ডের গভীরে প্রবেশ করে। শীঘ্রি জুট এঙ্গেল-স্যাক্সন জাতি, একত্রে যাদেরকে বলা হতো ইংরেজ, সমস্ত অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় যা বর্তমানে ইংল্যাণ্ড নামে পরিচিত। কেলটিক জাতি, ওয়েলশ, স্কটিশ ও করনিশদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় গ্রোডোনিয়া, ব্রেকন হিলস, হাইল্যান্ড ও কর্ণওয়ালের পাহাড়ি অঞ্চলে।

ইংরেজরা চাষাবাদ খুব ভাল জানত। আর ইংল্যাণ্ডে চাষ করার উপযোগী জমির অভাব ছিল না। ওখানে তারা সুশৃঙ্খল একটি জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে শুরু করে প্রথমে সাতটি রাজ্য (নরথামব্রিয়া, মার্সিয়া ও ওয়েসেক্স, সাসেক্স, কেন্ট, এসেক্স ও অ্যাংলিয়া) ও পরে আরো তিনটি রাজ্য (নরথামব্রিয়া, মার্সিয়া ও ওয়েসেক্স) নিয়ে। অবশেষে সমস্ত ইংল্যান্ডকে একত্রিত করেন ওয়েসেক্সের রাজা একবার্ট। ইংরেজ রাজ্যগুলো সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরবর্তী শতকে, পশ্চিম ইউরোপের মত ইংল্যান্ডও বারবার হামলার শিকার হয়েছে ভাইকিং নামে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান যোদ্ধা দ্বারা।

ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও বহুদিন ধরে অশান্তি চলছিল। তারপর, অষ্টম শতকের শুরুতে, আরব মুসলমানরা জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে সাফল্যের সাথে হামলা চালায় স্পেনে। তারা ভিসিগোথিক রাজ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে (৭১১-১৩) গোটা পেনিনসূলায় শাসন চালাতে থাকে। তারা পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর দিকে এগিয়ে যায় এবং হামলা চালায় গল-এ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল গোটা ইউরোপ যেন নিকট প্রাচ্য ও ভারতের মত ইসলামের তরবারির নিচে লুটিয়ে পড়বে। গলে মেরোভিনজিয়ান রাজা মুসলমানদের হামলা ঠেকাতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হন। মুসলমান ছাড়া গল্ এর প্রতিবেশীরাও আক্রমণ চালিয়েছিল। জার্মানী থেকে আসা সর্দার পেপিন গল দখল করেন। তবে রাজাকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেননি। তার ছেলে চার্লস মার্টেলের (৭১৭-৪১) সঙ্গে ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে পোয়েটিয়ারে মুসলিমদের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা ইউরোপে প্রথম বড় ধরনের পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছিল। তাদের পরাজয়ের কারণে গল ও বাকি পশ্চিম ইউরোপ রক্ষা পেয়ে যায়। মুসলমানরা পিরেনিজ পর্বতমালার পেছনে হঠে যায়।

চার্লস মার্টেলের ছেলে, দ্বিতীয় পেপিন সর্বশেষ মেরোভিনজিয়ান রাজাকে 'গদিচ্যুত' করেন। তিনি ৭৫১ খ্রীস্টাব্দে গলসহ অন্যান্য স্থানে ফ্রাঙ্কদেরকে একত্রিত করে ক্যারোলিনজিয়ান ডাইন্যাস্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা নির্বাচিত হন। পেপিনের পরে ক্ষমতায় আসেন তার ছেলে চার্লস, তাকে বলা হয় ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসবিদরা তাকে আখ্যায়িত করেছেন শার্লেমেন (চার্লস দ্য গ্রেট) নামে। ইনি ফ্রাঙ্কিস সিংহাসনে বসেন ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে। নানা দিক থেকেই তিনি ছিলেন একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

নিজে তেমন পড়ালেখা না শিখলেও চার্লস প্রচুর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, নিজের দরবারে আমন্ত্রণ করেছেন বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদেরকে। এদের কেউ কেউ এসেছিলেন ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড থেকে। তেমন ধর্মকর্ম পালন না করলেও চার্লস গির্জার প্রতি বিরাগ ভাজন ছিলেন না, নিজের দেশে মঠ নির্মাণে সহায়তা করেছেন।

৮০০ খ্রীস্টাব্দে শার্লেমেন রোমে তীর্থযাত্রা করেন, ওখানে পোপ তৃতীয় লিও'র আশীর্বাদ নিয়ে সম্রাট হিসেবে তাঁকে ঘোষণা করা হয়। এতে প্রায় চারশ বছর আগে রোমের পতনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে ঐক্যের যে অভাব দেখা যাচ্ছিল তা পূরণ হয়। ৮১৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান শার্লেমেন। ওই সময় তার সাম্রাজ্যকে বলা হতো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, উত্তর স্পেন, জার্মানী, ইটালি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড। তাছাড়া, খ্রিস্টধর্ম হয়ে ওঠে পশ্চিম ইউরোপের প্রধান ধর্ম এবং লোকে

নিজের আগ্রহেই এ ধর্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করতে চাইছিল। শার্লেমেন ইউরোপ থেকে স্থবির দশা দূর করেন দীর্ঘ একটা সময়ের জন্যে।

শার্লেমেনের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্য নানা বিভাজন ও দলাদলির মাঝ দিয়ে চলছিল। তার ছেলে প্রথম লুইসকে (দ্য পায়াস) সিংহাসনচ্যুত করা হয় ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তবে এক বছর পরে তিনি আবার সিংহাসনে বসেন। ৮৪০ খ্রীস্টাব্দে লুইসের মৃত্যুর পরে তাঁর এক ছেলে প্রথম লোথিয়ার সম্রাট হন। তিনি ভাইদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং ফন্টেনয়'র যুদ্ধে তাদের কাছে পরাজিত হন। ৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভারদুন চুক্তি অনুসারে সাম্রাজ্য এভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল; লুইস দ্য জার্মান শাসন করতেন জার্মানী, চার্লস দ্য বল্ড পেয়েছিলেন ফ্রান্সের শাসনভার এবং লোথেয়ার ছিলেন লোথারিনিয়ো ও ইটালির শাসক। ৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে চার্লস দ্যা বল্ড সম্রাট হন। তবে শার্লেমেনের সেই সুসংহত সাম্রাজ্য তখন ছিল না। সাম্রাজ্যের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠছিল এবং তাদের শাসকরা শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে সামন্ততন্ত্র জন্ম নিতে ছিল বাধ্য।

বিভক্ত সাম্রাজ্য ভাইকিং জলদস্যুদের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিল। এরা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলসে ব্যাপক লুঠপাট চালিয়েছে। এছাড়া রাশিয়া থেকে আসা মাগিয়ার লোকরাও ব্যাপক হারে হামলা চালাচ্ছিল। মাগিয়াররা বলকানে ঢুকে একটি রাজ্য স্থাপন করে, পরে যার নামকরণ করা হয় হাঙ্গেরী। এরা পাঁচশ বছর আগের হুনদের মতই ভয়ংকর ছিল। হুনদের মত মাগিয়াররাও সকল শস্যক্ষেত ধ্বংস করে, গরু-ছাগল মেরে, দালানকোঠায় আগুন জ্বালিয়ে, বিশেষ করে চার্চে, এবং সকল বয়সের পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়। মেয়েদেরকে বন্দী করে তারা ক্রীতদাসী বানিয়েছে। তারা ইটালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীতে ঘেরাও করেছে। এদেরকে ঠেকানোর মত কেউ ছিল না। অবশেষে, ৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর বিখ্যাত রাজা প্রথম অটো (৯৩৬-৭৩) মাগিয়ারদেরকে অগসবার্গে পরাজিত করেন।

অটো জার্মানীর রাজা হন ৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি সিংহাসনে বসেই শার্লেমেনের পতিত রোমান সাম্রাজ্যের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি শক্তিশালী ও ঝগড়াটে ভূস্বামীদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন। তারপরে পা বাড়ান ইটালির দিকে এবং ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে নিজেকে পবিত রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। তবে ভাইকিংদের উপর্যুপুরি হামলার কারণে তার উত্তরসুরিরা সাম্রাজ্য ধরে রাখতে হিমশিম খেয়েছেন।

ইংল্যান্ডে, ওদিকে ওয়েসেক্সের রাজা এলবার্ট প্রতিদ্বন্দ্বী মার্সিয়ান রাজা বিয়র্নউলফ পরাজিত করেছেন (৮২৫) এবং তিন বছর বাদে গোটা ইংল্যান্ডের রাজা হয়ে বসেন তিনি। ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে একবার্ট হিংস্টোনে ভাইকিং বাহিনীর একটি

দলকে পরাজিত করেন। তার পৌত্র আলফ্রেড (৮৭১-৯০০) ছিলেন ব্রিটিশ আইলের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

আলফ্রেড ছিলেন একজন জ্ঞানী, আবিষ্কারক, আইনপ্রণেতা ও একই সাথে অকুতোভয় সামরিক কমান্ডার। তিনিই প্রথম চালু করেন আংলো স্যাক্সন ক্রনিকল যা ওইসময় ইংল্যান্ড সম্পর্কে তথ্য পাবার ব্যাপারে প্রধান সূত্র ছিল। তিনি দেশের আইন মানভুক্ত করেন। ৯০০ খ্রীস্টাব্দে মারা যান আলফ্রেড, তবে ইংল্যান্ডের সৌভাগ্য পরবর্তী আশি বছর তার দেশের মানুষ আলফ্রেডের মতই যোগ্য উত্তরসূরি পেয়েছিল। ওই সময়ে ইংল্যান্ড কৃষি, শিক্ষা, কলা, দালানকোঠা নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে।

আলফ্রেড ও তার বংশধররা ইংল্যান্ডকে যে চমৎকার একটি শতক উপহার দিয়েছিলেন তার সর্বনাশ করে ছাড়েন দুর্বল ও কাপুরুষ ইথেলরেড দ্যা আনরেডি (৯৭৯-১০১৬)। ভাইকিংরা যখন দেখতে পায় ইংল্যান্ড ইথেলরেডের পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হয়ে গেছে ওই সময় পূর্ণ-উদ্যমে তারা আবার হামলা চালাতে শুরু করে। ইথেলরেড সোনা ঘুষ দিয়ে ভাইকিংদেরকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা ঘুষ নিয়ে উল্টো ঘুসি মেরেছে ইথেলরেডকে ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে। ডেনিশ নেতা সোয়েন ফর্কবিয়ার্ড তারপর ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল করেন। কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে কানুট। ইংরেজরা অবশ্য প্রথমে কানুটকে মেনে নিতে চায়নি। তারা ইথেলরেডকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ১০১৬তে ইথেলরেড মারা গেলে রাজা নির্বাচিত হন তাঁর সুযোগ্য পুত্র এডমণ্ড। প্রচণ্ড সাহসী বলে তাকে 'আয়রন সাইড' বলে ডাকা হতো। সিংহাসন নিয়ে এডমণ্ড ও কানুটের মধ্যে ১০১৬ খ্রীস্টাব্দে লড়াই শুরু হলে দু'জনে রাজ্য ভাগাভাগি করে শাসন করতে সম্মত হন। নভেম্বরে এডমণ্ড মারা গেলে ইংরেজরা বাধ্য হয় কানুটকে রাজা বলে মেনে নিতে।

উনিশ বছরের রাজত্বকালে কানুট নিজেকে জ্ঞানী, দক্ষ ও দয়ালু শাসক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তিনি আইন পুনর্গঠন করেছেন, সরকারের সর্বোচ্চ কার্যালয়ে ডেনিশ নয় বরং ইংরেজ অভিজাত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগাতেন, বেশ কিছু দালানকোঠা নির্মাণও করেছেন এ উদ্দেশ্যে। কানুট ১০৩৫ খ্রীস্টাব্দে মারা যান অপদার্থ ও নিষ্ঠুর স্বভাবের দুই ছেলেকে রেখে। দ্বিতীয় সন্তান হারথাকানুট মৃত্যুবরণ করেছেন ১০৪২ এ। ইংরেজ কাউন্সিল বা উইটানাগেমট রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে এডমণ্ড আয়রনসাইডের ধার্মিক ছোটভাই এডোয়ার্ডকে। 'কনফেসর' বলে পরিচিত ভাইটি সারাক্ষণ ঈশ্বরের প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় নরম্যান্ডিতে প্রায় নির্বাসনে কাটিয়েছেন। তিনি ইংরেজদের কার্য প্রণালী তেমন ভাল

বুঝতে পারতেন না। সরকারে তিনি বেশীরভাগ নরম্যান বন্ধুদেরকে নিয়োগ দেন। তবে তার মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন আর্ল অব এসেক্স, স্যাক্সন গডউইন। গডউইন একজন জনপ্রিয় কূটনীতিক ছিলেন, ইংল্যান্ডে নরম্যানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চাইতেন। এডোয়ার্ড সরকারের সমস্ত দায় দায়িত্ব তার মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন ঈশ্বরের পথে। তিনিই বিখ্যাত ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি তৈরি করেছেন।

গডউইন মারা যান ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে। ক্ষমতায় আসেন তার মতই যোগ্য ও জনপ্রিয় পুত্র হ্যারল্ড। হ্যারল্ড ডিউক অব নরম্যান্ডি উইলিয়ামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এডোয়ার্ড মারা গেলে তাকেই ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসাবেন। কিন্তু ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা মারা গেলে ইংলিশ কাউন্সিল হ্যারল্ডকে রাজা নির্বাচিত করে। উইলিয়াম প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্য হ্যারল্ডের ওপরে প্রতিশোধ নেয়ার মওকা খুঁজছিলেন। মওকা অবশেষে মিলে যায়।

হ্যারল্ড উত্তরে, ইয়র্কশায়ারে যাচ্ছিলেন সাত ফুট লম্বা নরওয়েজিয়ান সর্দার হ্যারাল্ড হারড্রাডাকে শায়েস্তা করতে। হ্যারাল্ড তার ভাইকিং বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে হ্যারল্ড ভাইকিংদেরকে নির্মূল করেন। দক্ষিণে ফেরার পথে জানতে পারেন উইলিয়াম সাসেক্সে, হেস্টিংস এর কাছে বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন। হ্যারল্ড উইলিয়ামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে নিহত হন যুদ্ধে।

উইলিয়াম অব নরম্যান্ডি জয়ী হবার পরে ইংল্যান্ডের সিংহাসন দাবি করে বসেন। তাকে ২৫ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের রাজার মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়। ইংরেজ সমাজে এই অভিষেক ছিল একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

একাদশ শতকের ইউরোপে ভাইকিংরা দারুণভাবে নিজেদের শক্তি সংহত করে। ইউরোপ একই সময় লক্ষ করেছে সামন্ত রাজ্যগুলোর বেড়ে ওঠা। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্যের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছিল। সৎ শাসকরা ভাষা ও প্রথার জাতীয় সীমানা সৃষ্টি করতে গিয়েও বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিলেন। ইউরোপ আরো দেখেছে নিকট পশ্চিমে খ্রিস্টানদের সাথে তুর্কীদের ভয়ঙ্কর লড়াই। এছাড়া আরো পরিবর্তন ঘটা বাকি ছিল, বিশেষ করে জনগণের জীবন যাত্রায়।

# ব্রিটিশ আইলের কেল্টরা

যখন রোমান লীজন (৬ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনী), পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেন ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে ওই সময় দক্ষিণ ব্রিটেনের ব্রিটিশ কেল্টরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রতিরক্ষায়। বহু বছর তাদেরকে ইংল্যান্ডে স্যাক্সন, অ্যাংলো ও হুনদের হামলা ঠেকাতে হয়েছে। দেড়শ বছরের মধ্যে কেল্টরা ইংল্যান্ড থেকে উৎখাত হয়ে ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগ দেয়। আয়ারল্যান্ডের গেইলিক কেল্টরা অবশ্য রোমান কিংবা অ্যাংলো-স্যাক্সন হামলা থেকে মুক্ত ছিল, তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগে তখন প্রবেশ করতে যাচ্ছিল।

ব্রিটিশ কেল্টরা ছিল আগেকার ইউরোপীয় কেল্ট, যারা ৭০০ থেকে ১০০ খ্রীস্ট পূর্বে ব্রিটেনে অভিবাসন করেছিল, তাদের বংশধর। এরা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চল, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডে কম্যুনিটি গড়ে তুলেছিল। রোমান হামলা এরা দারুণভাবে প্রতিহত করলেও শেষতক পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং রোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে এ সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠানের সুফলগুলো ভোগ করেছে, সবশেষে দীক্ষা নিয়েছে খ্রিস্টধর্মে। ওয়েলশরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।



*টারা ব্রুচ, আইরিশ কেলটিক জুয়েলারির সেরা নিদর্শন*

গল-এর কেল্টরা বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও শত্রুর সাথে লড়াই করে। একতা থাকলে তারা নিজেরাই মিলেমিশে অ্যাংলো-স্যাক্সন হামলা প্রতিহত করতে পারত।

**ওয়েলস**

ষষ্ঠ শতকে ওয়েলসে এক শক্তিশালী মানুষের আবির্ভাব ঘটে যিনি জনগণকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। তার নাম মেলগন, প্রচুর রক্তপাত, যুদ্ধ ও খুনখারাবী ঘটিয়ে তিনি গুইনেড (আঙ্গলেসি) কার্নাভন, মেরিওনেথ এবং ডেনবিগের কিছু

অংশ নিয়ে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরপর তার রাজ্য ক্ষুদ্র অংশে ভেঙ্গে বিভক্ত হয়ে যায়। গুইনেডের পরবর্তী তিনশ বছরের ইতিহাস, ওয়েলসের বাকি অংশের মতই, হানাহানিময়। অবিরাম গৃহযুদ্ধ দুর্বল করে দেয় রাজ্যকে এবং ইংল্যান্ডের হামলাকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। অষ্টম শতকের শেষদিকে, পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্যদের মত ওয়েলসও ভাইকিং হামলার শিকার হয়। ভাইকিংরা ক্রমে দুর্ধর্ষতর হয়ে উঠছিল। ওয়েলসের আবার সাধারণ শত্রু হয়ে দেখা দেয় ভাইকিংরা। এদেরকে ঠেকাতে হলে এক নেতার নেতৃত্বে একত্রিত হবার প্রয়োজন ছিল। সেরকম একজন নেতা ছিলেন রোড্রি মর (রোডেরিক দ্য গ্রেট) । ইনি ৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে গুইনেডের রাজকুমার বলে ঘোষণা দেন।

রোড্রি মেলগনের বংশধর। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি গোটা ওয়েলসের যুবরাজ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন যুদ্ধ জয় কিংবা অন্য রাজকুমারদেরকে তাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে। এরপরে তিনি ভাইকিংদের দিকে নজর ফেরান। ভাইকিংদের সাথে বিভিন্ন সময় লড়াই করেছেন রোড্রি। ৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অ্যাংলেসির এক যুদ্ধে ভাইকিংরা সম্পূর্ণভাবে পরাজয় বরণ করে মারা যায় তাদের নেতা হর্ম।

রোড্রির পৌত্র হাইওয়েল ডডা (হাওয়েল দ্য গুড) ছিলেন একজন বিখ্যাত শাসনকর্তা ও আইন-প্রণেতা। ইউরোপ ঘুরে তিনি দেখেছিলেন কে কিভাবে সরকার চালায়। দেশে ফিরে তিনি রাজকুমার ও সরকারি কর্মকর্তাদের এক মিটিং এ ডেকে পাঠিয়ে দেশের বিদ্যমান আইন সম্পর্কে আলোচনা করে নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে একমত হন। এ আইন ছিল মানব কল্যাণের আইন। রোড্রির প্রেরিত আইনে মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়।

রোড্রির পরে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গ্রুফিড অ্যাপ ললিউলিন আপ সেইসিল (১০৩৯-১০৬৩)। এই বিখ্যাত রাজকুমার সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করেন, ওয়েলশকে একটি জাতিকে পরিণত করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ওপর হামলাকারীদের হামলা প্রতিহত করেন।

গ্রুফিও খুন হয়ে গিয়েছিলেন। এরপরে তার উত্তরসুরি ব্লেডিন (১০৬৩-১০৭৫) আসেন ক্ষমতায়। এ সময় ওয়েলসকে ভাইকিং- নরম্যান হামলার শিকার হতে হয়। ১০৬৬ খ্রীস্টাব্দে, নরম্যান্ডের ডিউক উইলিয়ামের নেতৃত্বে নরম্যানরা ইংল্যান্ড আক্রমণ করেছিল। তারা অ্যাংলো স্যাক্সনদেরকে পরাজিত করে দক্ষিণ ওয়েলসে লুঠতরাজ করে এবং প্রতিষ্ঠা করে ছোট ছোট রাজ্য, যার নাম 'ওয়েলস মার্চেস।' শুধু গুইনিড আর মধ্য ওয়েলস এ হামলার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তবে ওয়েলস ওয়েন গুইনিডের ক্ষমতায় আসার (১১৩৭-১১৭০) সালে জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

### স্কটল্যান্ড

রোমানরা যখন প্রথম ব্রিটেনে আসে ওই সময় স্কটল্যান্ডের বেশিরভাগ অঞ্চলে বাস করত গেইলিক কেল্টরা। এরা কয়েকশো বছর আগে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে ওখানে অভিবাসী হিসেবে প্রবেশ করেছিল। রোমান বাহিনীর জন্যে তারা ছিল উপদ্রব বিশেষ। যুদ্ধের সময় সারা মুখে নীল রঙ মেখে থাকত বলে রোমানরা তাদের নাম দিয়েছিল পিকটি বা রঙিন মানুষ। দুই সম্রাট, হাড্রিয়ান ও অ্যান্টোনিয়াস পায়াস এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশে মজবুত দেয়ালের দুর্গ গড়ে তোলেন। পিকটিরা স্কটিশ হাইল্যান্ডে অবরুদ্ধ হয়ে থাকত। রোমানরা ব্রিটেন ছেড়ে চলে গেলে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে হামলা চালিয়ে বসে ব্রিটিশ কেল্টদের ওপর।



*ভাইকিংরা প্রথম দিকে ব্রিটেনের নদী তীরবর্তী শহর লুঠ করেই সন্তুষ্ট ছিল, পরে তারা বসবাস শুরু করে*

স্কটল্যান্ডের পরবর্তী দুশো বছরের ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না কোন নথিপত্র সংরক্ষিত না থাকার কারণে। ধারণা করা হয় পিকটরা, ওয়েলসে ব্রিটিশদের মত নিজেদের মধ্যে হানাহানি করত। ষষ্ঠ শতকে আয়ারল্যান্ড থেকে গেইলিক কেল্টদের পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে অভিবাসিত হয় পশ্চিম স্কটল্যান্ড ও পশ্চিম আইলে। এই গেলরাও স্কটিশ নামে পরিচিত ছিল, আর এখান থেকেই স্কটল্যান্ড নামের উৎপত্তি। অভিবাসীরা ছিল খ্রিস্টান, তারা পৌত্তলিক পিকটদের পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি (৫৬৩) কলম্বা নামে আয়ারল্যান্ডের এক গেইলিক ধর্মপ্রচারক আরগিলের আইওনা দ্বীপে এসে একটি মঠ নির্মাণ করেন। এ জায়গা থেকে তিনি এবং তাঁর কর্মীরা পিকটদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে থাকেন। শতাব্দী শেষ হবার আগেই এ কাজে তাঁরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেন।

স্কট ও পিক্ট, পরস্পর বিবাদমান দুই জাতিকেই ভাইকিংরা হামলা চালায় অষ্টম শতাব্দীতে। তারা প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে মঠ সহ নানা দালানকোঠার, ধ্বংস করে ফেলে শস্য ক্ষেত। তখন নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে একজন জাতীয় নেতার প্রয়োজন ছিল। ৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে সে নেতার আবির্ভাব ঘটে। নাম কেনেথ ম্যাক আলপাইন।

, ওই বছরে পশ্চিমে, স্কটদের রাজা নির্বাচিত হন কেনেথ এবং প্রায় সাথে সাথে ভাইকিংদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে বাহিনী প্রস্তুত করেন। সাত বছরের মধ্যে ভাইকিংদেরকে তিনি রাজ্য থেকে বের করে দেন এবং পিক্টিস রাজ্যে ঢুকে তাদেরকেও বিতাড়িত করেন। ৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কেনেথ গোটা স্কটল্যান্ডের অধিপতি বনে যান। স্কটল্যাণ্ডের প্রথম রাজা হিসেবে নিজের অবস্থান সুনিশ্চিত করতে তিনি আরগিল থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে নিয়ে যান পার্থশায়ারের স্কোনে। স্কটল্যান্ডের সকল উত্তরসূরি রাজাদের অভিষেক হতো স্কোনে।

কেনেথ মৃত্যুবরণ করেন ৮৬০ খ্রীস্টাব্দে, পরবর্তী একশ চল্লিশ বছর তাঁর বংশধররা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশকে ভাইকিংমুক্ত রাখতে। কেউ কেউ স্কটল্যান্ডের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন স্ট্রাথক্লাইড ও লোথিয়ানকে নিজের দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। তবে এ কাজে শুধু সফল হন দ্বিতীয় ম্যালকম। ইনি ১০05 খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতায় এসে স্ট্রাথক্লাইড ও লোথিয়ানকে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করে স্কটিশ জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

**আয়ারল্যান্ড**

আয়ারল্যান্ডের কেল্টদের সঙ্গে স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অনেক বিষয়েই ছিল অমিল। গেইলিক কেল্টরা ষষ্ঠ শতকে দ্বীপটিতে আসে এবং ওখানকার বর্বর অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। তবে ব্রিটেনে ব্রাইথোনিক গোষ্ঠী দ্বারা তারা কখনো প্রভাবিত হয়নি। তাছাড়া রোমান ব্রিটেন দখল করার পরেও তারা কখনো আয়ারল্যান্ডে যায়নি শুধু শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ছাড়া।

গেইলরা নিজেদের সভ্যতার উন্নয়ন ঘটানোর অনেক সময় পেয়েছিল এবং রোমান সংস্কৃতিও কিছু তারা গ্রহণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে। গেইলরা বেশ প্রতিভাবান ছিল। রোমানদের সাথে মিলে তারা নিজেদের প্রতিভার মিশেলে গড়ে তুলেছিল এমন একটি সংস্কৃতি যাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ইউরোপ।

পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যে স্থবির অবস্থা থাকলেও তা প্রভাব ফেলতে পারেননি আয়ারল্যান্ডে। একদল জলদস্যু দক্ষিণ ওয়েলস থেকে একবার বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে এক রোমান ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তার এক ছেলে ছিল প্যাট্রিসিয়াস বা প্যাট্রিক নামে। তাকে জেলে পোরা হয়। জেলে বসে সে স্বপ্ন দেখত কয়েদখানা ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়ে একটি মঠে ঢুকেছে এবং সেখানে পড়ালেখা করে আইরিশদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। একদিন সত্যি সে জেল ভেঙ্গে পালায় এবং চলে আসে একটি ফরাসী মঠে। কয়েক বছর বাদে সে ফিরে যায় আয়ারল্যান্ডে পোপের আশীর্বাদ নিয়ে এবং কুড়ি বছরের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে আইরিশদেরকে।

তবে পিটার আইরিশদের যুদ্ধোন্মাদনা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব দূর করতে পারেনি। ইউরোপের সর্বত্র ওই সময় কঠিন অবস্থা চলছিল। যদিও তখন গোটা ইউরোপে ধাতব কাজ, কলাই করা, গহনা তৈরি, কাঁচ উৎপাদন ইত্যাদি কাজে আইরিশরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। তারা অপূর্ব সুন্দর পাথরের ক্রুশ বানাত যার নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে সারা দেশে। তারা কবিতা ও কিংবদন্তীর কাহিনী লিখত। তারা প্রচুর মঠ নির্মাণ করেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে ইউরোপে গেছে তাদের ইউরোপীয় বন্ধুদের শিক্ষা দিতে। তারা তখন 'অন্ধকার যুগ' থেকে শিক্ষাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

আয়ারল্যান্ডকেও ভাইকিংদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে এবং এদেরকে ঠেকানোর মত নেতার অভাবও অনুভব করত আইরিশরা। ৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুনস্টারের রাজা ব্রায়ান বোরু লিনস্টারে হামলা চালিয়ে ওই রাজ্য দখল করে নেন এবং নিজেকে গোটা আয়ারল্যান্ডের রাজা বলে ঘোষণা করেন।

ব্রায়ান ভাইকিংদের সাথে বহু লড়াই করেছেন। ১০১৪ খ্রীস্টাব্দে ভাইকিংদেরকে ডাবলিনে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়, ওই বছরই তারা ব্রায়ানের সাথে গুড ফ্রাইডেতে ক্লোনটার্ফে এক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার মধ্যেই সম্পূর্ণ পরাজিত ভাইকিংরা ছুটে পালাবার রাস্তা পাচ্ছিল না। কিন্তু পালাবার সময় এদের দু'তিন জন ব্রায়ানের তাঁবুতে ঢুকে তাকে জবাই করে হত্যা করে। এটা ছিল আয়ারল্যান্ডের জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনজক ঘটনা। আজও তিনি সেরা আইরিশ রাজা হিসেবে সম্মানিত।

ব্রায়ানের মৃত্যুর পরে আয়ারল্যান্ড আবার নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। চল্লিশ অধ্যায়ে আমরা দেখব ব্রিটেনে এই বিভক্তিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিল নরম্যানরা আর কি দশা হয়েছিল আইরিশদের।

# পারস্যে সাসানিড সাম্রাজ্য

একুশ অধ্যায়ে আমরা যে পার্থিয়ান রাজাদের কথা উল্লেখ করেছি তারা আসলে পারস্যের ছিলেন না। শক্তিশালী কয়েকজন রাজা সিংহাসনে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন শুধু তাদের ফারসী প্রজাদের আনুগত্যের জন্যে। রোমের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল আত্মরক্ষামূলক। ট্রাজানের সময় রোমানরা পার্থিয়ান রাজ্যে প্রবেশের তেমন সুযোগ পায়নি আর পার্থিয়ানরাও এশিয়া মাইনরে রোমান অঞ্চল দখলের জন্যে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেনি। এটা ছিল খানিকটা যুদ্ধে স্থিতাবস্থার মত। ট্রাজান যখন মেসোপটেমিয়ায় হামলা চালায় এবং দখল করে নেন টেসিফোন, তাঁর উত্তরসুরি হাড্রিয়ান এ এলাকা থেকে রোমানবাহিনীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস ছিলেন সর্বশেষ রোমান সম্রাট যিনি পার্থিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে সফল হন। তিনি উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে (১৯৫-১৯৯) টেসিফোন জ্বালিয়ে দেন।



*কসরোস দ্বিতীয় 'ভিক্টোরিয়াস' নামে পরিচিত। ইনি জেরুজালেম লুঠ করেন এবং দখল করেন হলি ক্রস।*

২২৬ খ্রীস্টাব্দে, পারস্য সর্দার সাসানের সুদর্শন ও শক্তিশালী পৌত্র আর্দাসির পার্থিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এবং হত্যা করেন রাজাকে। সেই সাথে অবসান ঘটে আরসাসিড রাজবংশের। তারপরে তিনি সিংহাসন দখল করেন এবং শুরু হয় সাসানিড রাজাদের রাজত্বকাল। এই রাজারা হুনদের হামলা ঠেকিয়েও ৬৪০ খ্রীস্টাব্দে আরবদের আগমন পর্যন্ত টিকে ছিলেন।

সাসানিড রাজারা তাদের পার্থিয়ান পূর্বপুরুষদের চেয়ে দক্ষ ছিলেন, তাদের নতুন পারস্য সাম্রাজ্য আরো শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল ছিল। যদিও তারা প্রচুর খাজনা তুলেছেন, সেইসাথে স্থানীয় সরকারের ভূমি মালিকদের জন্যে বড় বড় জমিও দান করেছেন এবং উৎসাহ জুগিয়েছেন শহরের উন্নয়নের জন্যে।

পারস্যবাসী শীঘ্রি রোমের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি সংগ্রহ করে। অবশ্য এই সময় রোমে দুর্বল শাসকদের শাসন চলছিল।

আর্দাসির নিজে উত্তর মেসোপটেমিয়া পুনরুদ্ধার করেন। তার ছেলে প্রথম শাপুর দখল করেন দুরা এবং রোমান সিরিয়ায় অবস্থিত অ্যান্টিওচ। ২৬০-এ রোমান সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে সিরিয়ার বন্দি করে পার্সিয়ানরা এবং শাপুর তার ওপর অত্যাচার করেন।

শাপুর পুবে আফগানিস্তান পর্যন্ত এগিয়ে কুশান ইন্ডিয়ানদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করেছেন।

পারস্যে পুনর্জাগরণ শুধু সামরিক দিক থেকে নয় একই সময় শিল্পে ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিকশিত হয়ে উঠছিল। গ্রীক নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ অনুবাদও প্রকাশ করা হয়। পার্সিয়ানরা তাদের সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে এবং সশস্ত্র অশ্বারোহী ও ধনুর্ধর বাহিনীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে।

সাসানিডদের এই বিশাল পুনরুত্থান ঘটা সত্ত্বেও পারস্য সবসময়ই তার উত্তর সীমান্তের বর্বর ও পরবর্তীতে দক্ষিণ থেকে আরবদের চাপের মুখে ছিল। মাঝে মাঝে পার্সিয়ান ও রোমানরা একত্রিত হয়ে বর্বরদেরকে ঠেকিয়েছে, তবে দুটি শক্তি নিজেদের যৌথ সীমান্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শুধু শক্তি ব্যয়ই করেছে।

পারস্যবাসীর দীর্ঘ ইতিহাসে সম্ভবতঃ সাসানিড যুগ ছিল সেরা। সেচ ও কৃষিকাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করা হতো। ব্যবসা ও শিল্প ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, সওদাগররা চীন ও স্পেন পর্যন্ত গেছে বাণিজ্য করতে। আইন ঢেলে সাজানো হয় এবং রোমানদের মতই স্বচ্ছ ছিল সে আইন। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ায় ফারসী ডাক্তারদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র।

তবে সাসানিডরা চিরস্থায়ী ক্ষমতা ভোগ করে যেতে পারেনি। রোমান সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে গেলে এবং পশ্চিমের অর্ধেক অংশ স্থবির হয়ে পড়ায় পারস্য

বাইজেন্টিয়ামের সাথে অবিবেচকের মত বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কন্সটান্টিনোপল যতই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছিল পারস্য বাহিনী ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পারস্যে একের পর এক হামলা চালাতে শুরু করে হুনরা। এরা ৪৮৫ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে প্যারস্য রাজা পেরোজকে হত্যা করেছে। এরপরে, একশো বছরের বেশি সময় ধরে, সাসানিডরা নিজেদের অধিকার ভোগ করতে পারলেও তারা আসলে বর্বরদের ওপর নির্ভরশীল রাজা ছাড়া কিছু ছিলেন না।

সপ্তম শতকের শুরুতে দ্বিতীয় কসরোসের নেতৃত্বে পার্সিয়ানরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে আবার ফিরে পায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব। পাঁচ বছরের মধ্যে, ৬১৩–৬১৮, কসোরাস জয় করেন সিরিয়া, দখল করে নেন রাজধানী দামাস্কাস এবং জেরুজালেমে ঝড় তুলে চুরি করে আনেন হলি ক্রস। এটি তিনি টেসিফোনে নিয়ে যান। এরপরে তিনি এশিয়া মাইনর ও মিশরকে পদানত করেছেন।

কসরোসের পরে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে কাভাদ। ইনি বাইজেনটাইনদের কাছে রাজ্যের বেশ কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পরে পারস্যে শুরু হয়ে যায় অরাজকতা, আরবদের সহজ-শিকার হয়ে ওঠে দেশটি।

আরবদের দ্রুত ও স্থায়ী হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় ফারসীদের ক্ষমতা। তবে পারস্য সভ্যতার মৃত্যু ঘটেনি। রোম ও বাইজেনটিয়ামের সাথে চীন ও ভারতের যোগাযোগে মধ্যস্থতা ভূমিকা পালন করত পারস্য; বিখ্যাত সিল্করুটও নিরাপদ করে রেখেছে পারস্য। পারস্য সাম্রাজ্যই মূলতঃ পুবের সভ্যতাকে নিয়ে গেছে পশ্চিমের কাছে এবং পশ্চিমী ধ্যান ধারণা নিয়ে এসেছিল পুবে।

# প্রাচীন ভারতের অবসান

খ্রীস্টপূর্ব ২৩২-এ ভারতের মহান রাজা অশোকের মৃত্যুর পরে দেশটি নানা যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে এবং বহু বছর এ দেশ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়নি। এটা অনেকটা সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার মত, যে সভ্যতা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কোন চিহ্ন না রেখে।

ভারতের এই সময় সম্পর্কে যা জানা যায় তা খুবই অপ্রতুল। বাকট্রিয়ায় বসবাসরত কিছু স্বাধীন গ্রীক পাঞ্জাবে অগ্রসর হয় এবং সেখানে একটি রাজ্য গড়ে তোলে। আফগানিস্তানের কাবুলে ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। এ রাজ্যের স্থায়ীত্বকাল ছিল দুশো বছর, ওই সময় গ্রীকরা ভারতীয় সভ্যতায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। গ্রীক বিজ্ঞান, ভৌত, কলা সবকিছুরই চিহ্ন ছিল ওই সময়ের সংস্কৃতিতে।



*কালিদাস, সংস্কৃত সাহিত্যের সেরা কবি (৪০০ খ্রীষ্টাব্দ)*

খ্রী. পূ. ১০০তে রাশিয়া থেকে আসা প্রায় সভ্য একটি জাতি আগেই বাকট্রিয়া দখল করে এবং পাঞ্জাবে গ্রীক রাজ্যে হামলা চালায়। তারা কুশান রাজ্য নামে নিজেদের নতুন রাজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এদের সম্পর্কে খুব কমই জানি আমরা তবে এরা সময়ের সাথে নিজেদের রাজ্যের বিস্তৃতি মধ্য ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে

দিয়েছিল। এদের শাসন রাজ্যের বিস্তৃতি মধ্য ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। এদের শাসন কর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কনিষ্ক, তিনি সম্ভবত দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে বাস করতেন। ধারণা করা হয় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন জাতীয় পর্যায়ে এবং এ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যও চালু করেছিলেন, যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন চীনের সাথেও। এই সময় বৌদ্ধধর্ম চীনাদের কাছে পৌছুতে শুরু করে।

দুশো খ্রীষ্টাব্দের পরে কুশান রাজারা পারস্যের সাসানিড রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন, এবং এই শতক শেষ হবার আগেই কুশানদেরকে সরিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে গুপ্ত বংশের। প্রথম গুপ্ত রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩৬)। এই বংশ একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা টিকে ছিল প্রায় দুশো বছর। ভারতের জন্যে সময়টি ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ এমনকি ভারতের সবসময়ের সমস্যা বলে পরিচিত পথদস্যদের দৌরাত্ম্য এ গুপ্তযুগে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, লোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারত।

গুপ্ত শাসন হিন্দু পুনর্জাগরণের সৃষ্টি করে। শুধু হিন্দু ধর্ম বা বিশ্বাসের পুনরুত্থান নয় শিক্ষা, কলা ও বিজ্ঞানেরও পুনর্জাগরণ ঘটে। এই যুগে স্থাপত্য ও চিত্রকলা ছিল উল্লেখ করার মত। কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালিদাস নামের একজন কবির রচনা আজও সমাদৃত।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকার সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৬-৩৮৫) তাদের রাজ্য বিস্তার করেন পুবে ব্রহ্মপুত্র নদ ও দক্ষিণে শ্রীলংকা পর্যন্ত। কিন্তু সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় মধ্য এশিয়া থেকে আসা বর্বরদের উৎপাত লেগেই ছিল। এরা রোমান সাম্রাজ্য ও চীনের সীমান্তেও একই সমস্যার সৃষ্টি করে চলছিল।

পঞ্চম শতকের শেষভাগে হুনরা সাসানিড পারস্যে ঢুকে ভারতে চলে আসে। এই হামলা ভারতের জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হুনদের হামলায় স্থানীয় জনগণের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে ভারত আর কোন বিখ্যাত বংশ সৃষ্টি করতে পারে নি। একের পর এক হামলাকারী এসে ভারত শাসন করে গেছে এবং ১৯৪৮-এ ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার পরে কেবল ভারতীয়রা পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করতে পেরেছে।

হুনরা ভারতের নগর-জনপদ লুঠ করে, মানুষজন মেরে ধরে যতটা পেরেছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তবে তারা ভারতে বেশিদিন থাকেনি। এর কারণ সম্ভবত রাশিয়ার প্রবল ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত হুনরা ভারতের তীব্র গরম সহ্য করতে পারেনি।

হুনদের পরে ভারতে এসেছে তুর্কীরা। তবে এদের দেশ কিন্তু তুরস্ক নয়, মধ্য রাশিয়া। কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-পুবে তাদের বসবাস। তারা মোঙ্গলদের

আত্মীয়। তুর্কীরা ছিল ভয়ংকর, বুনো, অশিক্ষিত যোদ্ধার দল। তাদের সারাটা দিন কাটত ঘোড়ায় চড়ে। এমনকি ঘোড়ার পিঠেই তারা ঘুমিয়ে পড়ত। কৃষিকাজের প্রতি তাদের কোন রকম উৎসাহ ছিল না আর নিজেদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের প্রতিও কখনো আগ্রহ বোধ করেননি। তারা কোন দেশ আক্রমণ করলে সে দেশের ধন সম্পদ সব লুটে নিত, জ্বালিয়ে দিত ঘরবাড়ি, শস্য খেত। তারপর লুটের মাল নিয়ে ফিরে যেত বাড়িতে, মধ্য রাশিয়ায়।

বহু বছর ভারতকে ভয়াবহ অরাজকতার মাঝ দিয়ে চলতে হয়েছে। পুরানো আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। সপ্তম শতকে হর্ষ নামে এক নেতার নেতৃত্বে অল্প সময়ের জন্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হলেও তার মৃত্যুর পর পর সে অবস্থার অবনতি ঘটে। ৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুসলিম আরবরা ভারত আক্রমণ করে এবং পশ্চিমে আস্তানা গেড়ে বসে। তবে পরবর্তী তিনশ বছরে ভারতের এখানে সেখানে কিছু গ্রাম্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা ছাড়া আর কোন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। এমনকি কেন্দ্রীয় কোন সরকারের অস্তিত্বও ছিল না। এ সময়ে ভারতীয়রা তেমন কোন উন্নতি করতে পারেনি।

১০০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ নতুন মুসলিম হামলাকারীরা ভারতে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

# চীন ও বর্বররা

দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে বিখ্যাত সেনাপতি সাও এক সময়ের বিখ্যাত হ্যান বংশের সমাপ্তি টানেন। চীন ওই সময়ে ভয়ংকর প্লেগে আক্রান্ত, দেশটি প্রায় সাথে সাথে তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এগুলো ছিল উইদের উত্তরের রাজ্য, চুদের পশ্চিমের রাজ্য এবং উদের পুবের রাজ্য। শীঘ্রি এই রাজারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে লড়াই শুরু করে দেন এবং ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে উই রাজ্য জিতে যায় যুদ্ধে।

কিছু সময়ের জন্যে একতার বন্ধন স্থাপিত হলেও চীনা সীমান্তে বর্বরদের চাপে তা স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। চীনের মহা প্রাচীর পর্যন্ত ওই ভয়ানক যোদ্ধা জাতিকে ঠেকানোর জন্যে অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হয়। এরা সকল সভ্যতার জন্যে ছিল যন্ত্রণা বিশেষ।



*একাদশ শতকের জাপানী দরবারের দৃশ্য।*

চীনা সম্রাটরা সীমান্তের বর্বরদের প্রতিহত করতে কিছু বর্বর সর্দারকে আমন্ত্রণ করে এনে মস্ত ভুল করেন। এ ভুল রোমানরাও করেছিল এবং ফলাফল হয়েছিল একই– বর্বর হয়ে উঠেছিল প্রভু।

এই বর্বরদের মধ্যে নানা জাতের মানুষ ছিল– তুর্কী, মোঙ্গল, হুন। এরা মধ্য রাশিয়া থেকে এসে চীনে ঢুকে পড়ে এবং যথারীতি ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার পরে সেখানকার সভ্যতা আত্মস্থ করার চেষ্টা চালায়। হ্যান বংশের শেষার্ধে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। বর্বররা এ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ট্যাং বংশ চীনের ক্ষমতা দখল করে, চীনা সভ্যতায় নতুন যুগের শুরু হয়। এ সময় প্রচুর আবিষ্কার হয়েছে। যেমন ওয়াটার মিল (জল স্রোত দ্বারা চালিত কল), ঠেলাগাড়ি, প্রিন্টিং টাইপ, চমৎকার পোর্সেলিন, তৈজসপত্রেরও প্রভূত উন্নয়ন ঘটে। কিছু ট্যাং পোর্সেলিনের মূর্তি ছিল সত্যি দেখার মত। রাজধানী শহর নানকিং-এর বিস্তার ঘটানো হয় এবং সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা নির্মাণ করা হয়।

ট্যাং যুগ স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের জন্যেও বিখ্যাত। আদি মিশরীয়দের মত চীনারাও কবরে বড় বড় মূর্তি খোদাই করত। তারা সিল্কের ব্রাশ দিয়ে ছবি আঁকত। এসব ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ওই সময়ে যে কারো চেয়ে বেশি ছিল।

ট্যাং সম্রাট লি শিমিন পুনর্গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। হ্যান বংশের রেখে যাওয়া কার্যক্রম ট্যাং সম্রাটদের আমলে আরো উন্নতি লাভ করে। সেনাবাহিনীও নতুনভাবে গঠিত হয়।

চীনা ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য সময়ে চীনা ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়ে জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সুদূর তিব্বত পর্যন্ত। জাপান তার আদি যুগ কাটিয়ে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল মিশর, সুমের ও ভারতীয়দের মত। ক্রমে দ্বীপপুঞ্জগুলো সোগা রাজ পরিবারের অধীনে একত্রিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতিতে জাপানীরা আচরণগত একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গঠন করে। তারা চীনা পাণ্ডুলিপি, পোশাকের আদল, সামাজিক অভ্যাস এগুলোও অনুসরণ করত। একই চিত্র দেখা যেত কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামে।

তবে চীনের এই বিশেষ সময়েও তুর্কী আর মোঙ্গলদের হামলার কোন বিরতি ছিল না। ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দেখা যায় ট্যাং বংশের বর্বরদের চাপ নেয়ার মত শক্তি নেই। বর্বরদের একের পর এক প্রদেশ দখল এবং ওগুলো নিজেরাই ভেঙে আলাদা রাজ্য গঠন করতে থাকলে এ বিখ্যাত সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে শুরু করে। এরকম একটি দক্ষিণের সুং প্রদেশ ছিল চীনা সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের অন্যতম ধারক ও বাহক। এই ক্ষুদ্র প্রদেশ শাসন করে গেছেন তাই সুং (৯৭৫–১০০০) ও শেন-সুং এর মত দক্ষ শাসকরা। এদের একজন উত্তরাধিকার, হোয়াই-সুং শিল্পকলা ও কারিগরী বিদ্যার মস্ত সমঝদার ছিলেন। তিনি নিজে মুদ্রা সংগ্রহ করতেন, লিখতেন কবিতা এবং ছবি আঁকতেন মখমলের কাপড়ে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পোর্সেলিন বা

চীনা মাটির বাসনকোসন ও চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি ঘটে। সম্ভবতঃ সুং শাসনামলের চীনা পোর্সেলিনের সমাদর ছিল সবচেয়ে বেশি।

আরেক সুং সম্রাট, ওয়াং গাউচি, একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেশ শাসন করেছেন। তিনি বেশ কিছু সামাজিক সংস্কার সাধন করেন যা পশ্চিমা বিশ্বের চেয়েও অগ্রসর ছিল। তিনি মূল্য নির্ধারণ, বেতন কাঠামো তৈরি, চাষাবাদ ব্যবস্থাকে এমন ভাবে গড়ে তোলেন যাতে ক্ষুদ্র চাষীরাও সরকারি সাহায্যে বেঁচে বর্তে থাকতে পারত।

চীনা সংস্কৃতি যখন সুং-বংশের অধীনে সংরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে, ওই সময় দূর প্রাচ্যেও বিশেষ উন্নয়ন ঘটছিল। জাপানে রাজার আদালত হয়ে ওঠে শিল্পকলা ও শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে। তবে আদি চীনের মত জাপানকেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল : স্থানীয় শক্তিশালী ভূস্বামীরা চাপিয়ে রাখতেন চাষীদেরকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল না। ইন্দো-চীন ভেঙে গিয়ে আলাদা ভাবে রাজ্য স্থাপন করে এবং চীনা সভ্যতার আদলে গড়ে তোলে সংস্কৃতি।

চীনা সভ্যতার গোটা কাঠামো এবং ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া ও বার্মার সাংস্কৃতিক প্রশাখা সব কিছুই ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের। পৃথিবীর ইতিহাসে তার মত ভয়ঙ্কর মানুষ আর নেই। তিনি তাঁর রক্তপিপাসু দল নিয়ে যেখানে গেছেন, সমস্ত কিছু ছারখার করে দিয়েছেন। তেরো শতকের পূর্বভাগে চেঙ্গিস খানের দৃষ্টি পড়ে চীনের দিকে এবং বিশাল দেশটিতে হামলার জন্যে তিনি প্রস্তুত হন।

# আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা

প্রায় বার হাজার বছর আগে পেলিওলিথিক মানব রাশান স্তেপ থেকে বেরিং প্রণালী হয়ে আলাস্কায় ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে এগোয় উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দিকে। খ্রী. পূ, ২০০০-এ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দারা খাদ্যের জন্য শিকার বন্ধ করে ভুট্টা চাষ শুরু করে দেয়। শীঘ্রি নিকট প্রাচ্যের ফার্টাইল ক্রিসেন্টের মত গ্রাম্য সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে আমেরিকান সভ্যতায়। সম্ভবতঃ মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা ছিল সর্বসেরা। পরবর্তীতে আরো দুটি চমৎকার সভ্যতার জন্ম হয়, মেক্সিকোতে অ্যাজটেক এবং পেরুতে ইনকা। বিভিন্ন দিক থেকে আদি এশিয়ার মতই প্রগতিশীল ছিল এসব সভ্যতা। ইনকারা দক্ষ প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশাল এক সাম্রাজ্য পরিচালিত করত, যার সাথে প্রাচীন রোমের তুলনা করা যেতে পারে। মায়ারা অপূর্ব দক্ষতায় যে সব স্থাপত্য নির্মাণ করে গেছে তা টিকে থেকেছে শতশত বছর।

মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা ও হন্ডুরাসে মায়ারা কয়েক শতক ধরে সভ্য হয়ে উঠছিল। তারা চতুর্থ শতকে তাদের স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। আর ওই সময় পশ্চিম ইউরোপ প্রবেশ করতে চলেছিল অন্ধকার যুগে। মায়ারা প্রকাণ্ড ঝলমলে মন্দির ও কবর বানিয়েছে পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে যার সাথে মিশরের পিরামিডের মিল ছিল। সিমেন্ট বানানো হতো দুটো সমতল পাথরের মাঝখানে পানি ও বালি রেখে ঘষে। এ সব দালানে তারা দারুণ দারুণ মূর্তি খোদাই করত, দেয়ালে ছবি এঁকে রাখত। তারা অদ্ভুত ধরনের পিক্টোগ্রাফ লেখা আবিষ্কার করে। এগুলো এতই দুর্বোধ্য যে এর মানে আজতক উদ্ধার করা যায় নি। এদের ধারাবাহিক ইতিহাসের রেকর্ডও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি।



*মেক্সিকোর কাম্পোচে পাওয়া মায়া সিরামিকের মূর্তি (১১ ইঞ্চি)*

মায়ারা একটি পঞ্জিকা আবিষ্কার করে যা রোমান বিশ্বের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের চেয়ে উৎকৃষ্ট। জ্যোতির্বিদ্যাতেও তারা দীর্ঘ পদক্ষেপ নিয়েছিল। মায়াদের বড় বড়

শহরগুলো বাসস্থানের চেয়ে ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে বেশি ব্যবহার করা হতো। মায়ারা নানা দেবদেবী বিশ্বাস করত।

মায়ারা ছিল শান্তিপূর্ণ জাতি। বেশিরভাগ সময় তারা সরকারের সুশাসন ভোগ করেছে। তাদের সমাজ ছিল সুসংগঠিত। তারা বড় বড় বন সাফ করে সেখানে শস্য ফলিয়েছে। তারা উন্নত জাতি ছিল যদিও ধাতব যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানত না এবং যাতায়াতের জন্যে ঠেলাগাড়ির ব্যবহারও তাদের ছিল অজানা।

ভুট্টা চাষ ছিল মায়াদের প্রধান পেশা। ভুট্টা ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। ভুট্টা দিয়ে রুটি ও পিঠা বানানো হতো। তারা তামাক চাষও করত, ধূমপান করত মাটির পাইপে। তাদের তৈরি সুন্দর সুন্দর তৈজসপত্রের সাজসজ্জায় একেকটি গল্প থাকত।

সাধারণ মায়া পুরুষরা বাস করত কাঠের দেয়াল ঘেরা কুঁড়ে ঘরে, কিংবা ভুট্টা ক্ষেতের মাঝখানে। তারা ভুট্টা চাষ করে শুধু পরিবারের ভরণপোষণ নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে বাণিজ্যও করত। তারা খাবার জোগাত ধর্মযাজক ও সর্দারদেরকে।

মায়া সভ্যতার পতন ঘটতে শুরু করে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। পরে মায়া সংস্কৃতি আরেকটি মধ্য আমেরিকান সংস্কৃতি, টোলটেকের সঙ্গে মিশে যায়। টোলটেকদের শুরু মেক্সিকো থেকে। টোলটেকদের নিজেদের পূজ্য দেবদেবী ছিল। তারা নিজেদের দেবতার সাথে মায়াদের দেবতাদেরও পূজা শুরু করে। সবচেয়ে সম্মানিত দেবতা ছিলেন কুয়েটজালকোটল। তবে টোলটেকরা দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলিও দিত। এর প্রমাণ মিলেছে চিচেন ইটজায়; সেখানে ১৩০ ফুট গভীর একটি কুয়োয় শিশুদের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে।

টোলটেকরা একটা সময় অ্যাজটেকদের চাপের মুখে পড়তে থাকে। মেক্সিকোর ভবঘুরে এ জাতটি ছিল প্রচণ্ড সাহসী। মধ্য আমেরিকায় তাদের মত ভয়ঙ্কর জাতি আর কেউ ছিল না। এদের সম্পর্কে আটচল্লিশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ মধ্য আমেরিকার মতই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। আন্দেজ পবর্তমালার ছায়া ঘেরা পশ্চিম উপকূল, যা বর্তমানে পেরু নামে পরিচিত, সেখানে প্রথম সভ্য মানুষের আগমন ঘটে। খ্রী. পূ. ২৫০০ অব্দে তারা ততদিনে মরিচ, লাউ, সীম, সুতা ইত্যাদি উৎপাদন এবং পাথরের বড় দালান কোঠা নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। প্রথম শ্যাবিন ডি হুয়ানটার সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে পেরুর উত্তর হাইল্যাণ্ডে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৪০০ তে। মায়াদের মত শ্যাবিনরাও ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। শ্যাবিনে তিন হাজার বছরের অপূর্ব সুন্দর একটি মন্দির এখনো টিকে আছে। দালানের খাম্বায় খোদাই করা স্থাপত্য শ্যাবিন জনগণের জীবনাচারের পরিচয় দেয়, বিশেষ করে জানা যায় তারা কতটা বেড়ালপ্রিয় জাতি

ছিল। পুরুষ, নারী এবং প্রাণী, যার ছবিই আঁকত শ্যাবনরা, চেহারা ও লেজ লাগিয়ে দিত বেড়ালের মত। তারা বিশ্বাস করত বেড়ালের চেহারা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে দেবতার। মিশরেও কিন্তু বেড়ালকে পবিত্র প্রাণী বলে মনে করা হতো।

আদিয়ান সংস্কৃতির দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল পারাকাস, খ্রী. পূ. ৪০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৪০০। এরা এসেছিল দক্ষিণে, চিলি থেকে। তারা কাপড় বুনতে জানত এবং কাপড় বানাত। তবে এদের কাপড়ের নকশাতেও থাকত বেড়ালের ছড়াছড়ি।

তৃতীয় পেরুভিয়ান অধ্যায় নাজকা সংস্কৃতি। এরা স্থাপত্য ও কুমোরের কাজে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। উত্তর থেকে আসা মোচিকাদের হামলার শিকার হয়ে নাজকাদের পতন ঘটে।

মোচিকারা যুদ্ধবাজ ও বিজ্ঞান প্রিয় জাতি ছিল। তারা রাস্তাঘাট বানিয়েছে এবং আন্দেজের গিরিখাদের মাঝ দিয়ে চলাচলের রাস্তাও তৈরি করেছে। তাদের একটি কঠিন শ্রেণী বিন্যাস ছিল, তাতে প্রীষ্ট ও বৈজ্ঞানিকরা সবচেয়ে সম্মান পেতেন। মোচিকারা দক্ষিণ আমেরিকায় ৪০০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছে। তাদের চিন্তা চেতনা পরে গ্রহণ করে ইনকারা। তারা বিশাল বিশাল বিল্ডিং বানাত ক্রীতদাসদের (স্থানীয় ও আদিবাসী ইণ্ডিয়ান) দিয়ে। তাদের একটি স্থাপত্য আছে টুজিল্লোতে, পিরামিড অব দা সান নামে। এটি বানাতে হাজারো মানুষের কয়েক বছর সময় লেগেছে। ইটই লেগেছিল ১২ কোটি। আকারে এটি ছিল মিশরের বিখ্যাত গিজা পিরামিডের সমান।

১০০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ টিয়াহুয়ানাকোরা লেক টিটিকাকার দক্ষিণ সমভূমিতে বসতি স্থাপন শুরু করে। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হ্রদ। ওখানে টিয়াহুয়ানাকো নগরী এখনো দাঁড়িয়ে া ছ। তাদের তৈরি ধাতু, তৈজসপত্র আর কাঠের কাজ সারা পেরুতে ছড়িয়ে আছে

টিয়াহুয়ানাকোদের পরে আসে পেরুভিয়ান সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ জা ত ইনকারা। এদিকে মধ্য আমেরিকায় তিনটি আরো সভ্যতার বিকাশ ঘটছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মায়া যুগের সময়েই। এগুলো হলো টিওটিহুয়াকান, এদের নগরী ছিল বর্তমান মেক্সিকো সিটিতে, ওক্সাকার জাপোটেক এবং ভেরা ক্রুজের ওলমেক। এরা প্রত্যেকেই ভুট্টা উৎপাদন করত এবং সবাই একই বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য বুঝতে পারত এবং সবাই পালন করত একই ধর্ম। শুধু কথ্য রীতি, ভাষা ও প্রথা ছিল আলাদা।

এদের কিছু কিছু স্থাপত্য শিল্প অত্যন্ত চমৎকার। পাথর ও জেডের তৈরি কিছু কাজ তো দারুণ, পরফিরি (মূর্তি তৈরিতে ব্যবহৃত অত্যন্ত কঠিন নানা রকমের

শিলা) খোদাইও ছিল চমৎকার। যথারীতি এসব সভ্যতাতেও বেড়ালের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়।

টিয়াহুয়ানাকোরা প্রচুর দালান কোঠা নির্মাণ করেছে। সূর্যকে উৎসর্গ করা একটি পিরামিডের মূলদেশ ছিল ৭০০ বর্গফুট ও উঁচু ২০০ ফুট। পিরামিডের চুড়োয় ছিল একটি মন্দির। এক কথায় একটি অনন্য স্থাপত্য।

ত্রয়োদশ শতকে মেক্সিকোতে অ্যাজটেক ও পেরুতে ইনকারা প্রতিবেশীদের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ওইসব সংস্কৃতি ধারণ করে তারা নিজেদেরকে এতটাই সমৃদ্ধ করে তোলে যে ষোল শতকে লোভী স্পেনীয়রা তাদের ওপর হামলা চালিয়ে এই চমৎকার সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

# মধ্যযুগের ইউরোপ

অষ্টম শতকের শেষ দিকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাইকিংরা ব্রিটিশ আইলে তাদের প্রতিবেশীদের ওপরে আকস্মিক হামলা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। নবম শতকে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন ইংল্যাণ্ডের আলফ্রেড দ্য গ্রেট এবং ওয়েলসের রোড্রি মযের। কিন্তু তাতেও ভাইকিংরা দমে যায়নি। একের পর এক হামলা চালিয়ে গেছে। তারা গিয়েছিল উত্তর ফ্রান্স থেকে স্পেন, সেখান থেকে মরক্কো, মাজোরকা, ঢুকে পড়েছে ফ্রান্সের দক্ষিণে, রোমে, এমন কি ইটালিয়ান নগরী পিসাতেও লুণ্ঠন করেছে। তারা রাশিয়ার মাঝ দিয়ে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এগিয়েছিল।



*আলফানসো একাদশ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সালাদো নদীতীরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন*

একাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা কানুট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াকে ইউরোপীয় বৃত্তে নিয়ে আসেন। তিনি পোল্যাণ্ডের কিয়দংশসহ বাল্টিক সাগর তীরবর্তী রাজ্যগুলো নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন এবং আইসল্যাণ্ড ও সুইডেন তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তার সময় থেকেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলো ইউরোপের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

কানুটকে অনুসরণ করা ডেনিশ রাজারা নিজেদের শক্তি ও প্রভাব খাটিয়ে পৌছে যান জার্মানীতে। প্রায় পঞ্চাশ বছর, ১১৮০–১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তারাও বাল্টিক শাসন করেছেন। তবে পরের বছরে রাজা ভালদেমার দ্বিতীয় জার্মানদের কাছে নিদারুণ পরাজয় বরণ করেন। সুইডিশরা এদিকে পুব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, জয় করে নেয় ফিনল্যাণ্ড এবং উত্তর পুব রাশিয়া থেকে সুদূর লেক ল্যাডোগা পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করে।

জার্মানীর অটো দ্য গ্রেটের ভূ সম্পত্তি এমন বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলছিল যে তিনি বেশ কিছু জমি ভাসাল ডিউক ও বিশপদেরকে দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে সাম্রাজ্য ও পাপাসির ভেতরে কোন্দল শুরু হয়ে যায়। পোপরা সব সময় বিশপদেরকে নিয়োগ করতেন। জার্মান রাজারা চেয়েছিলেন জনগণ নিজেই বিশপ নির্বাচন করবে। ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দৃঢ়চেতা পোপ জর্জ সপ্তম লক্ষ্য করেন রোমের নেতৃত্ব হুমকির মুখে, তখন তিনি ঘোষণা দেন ইউরোপের সব জায়গায় একমাত্র পোপই বিশপদেরকে নিয়োগ দান করতে পারবেন। কোন রাজা, রাজপুত্র কিংবা ডিউক পোপ নিয়োগ করতে গেলে তার সঙ্গে গির্জার কোন সম্পর্ক থাকবে না। জার্মানীর রাজা হেনরী চতুর্থ পোপের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে নিজেই বিশপ নিয়োগ করেন। তাকে সাথে সাথে বহিস্কার করা হয়। এ শাস্তির মানে রাজার লোকেরা আর খ্রিষ্টিয় পদ্ধতিতে কবর দিতে কিংবা বিয়ে করতে পারবে না। তাই হেনরীর প্রজারা তাকে সমর্থন জানায় নি। কাজেই রাজাকে পোপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

কয়েক বছর বাদে হেনরী আবার পোপের বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং যথারীতি বহিস্কৃত হন। এবারে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে হামলা চালান ইটালিতে, দখল করে নেন রোম এবং পোপকে দক্ষিণে, নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন।

পাপাসির সাথে জার্মান রাজাদের এরকম বিবাদ সাম্রাজ্য ও রোমকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। তবে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উভয় পক্ষে একটি সমঝোতা হয়। শাসক শ্রেণী বিশপদের ওপরে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পান। এর মানে বিশপদেরকে দেশের আইন কানুন (বিষয়ী) মেনে চলতে হবে। তবে পোপের হাতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কাউকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করার ক্ষমতা থাকবে। ত্রিশ বছর বাদে আবার বিবাদের সৃষ্টি হয় যখন জার্মানীর সুদর্শন ও বেপরোয়া রাজা ফ্রেডরিক বারবারোসা (১১৫২–১১৯০) ১১২২ খ্রীষ্টাব্দের নীতিমালা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি উত্তর ইটালিতে হামলা চালান এবং রোমে ঢুকে পোপকে বহিষ্কার করে নতুন আরেকজনকে তার জায়গায় বসিয়ে দেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল ফ্রেডরিক গোটা ক্রিশ্চিয়ান চার্চ শাসন করবেন। কিন্তু ইটালিয়ানরা রাজার সৈনিকদের কর্কশ আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদেরকে যুদ্ধে

পরাজিত করে। ফ্রেডারিক আসল পোপের (আলেকজান্ডার তৃতীয়) কাছে ভুল স্বীকার করে তাকে রোমে ফিরিয়ে এনে নিজে প্রত্যাবর্তন করেন জার্মানীতে। ফ্রেডরিক তার রাজ্য ভালই চালাচ্ছিলেন। তবে ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে হলি ল্যাণ্ডে তৃতীয় ক্রুসেডে যোগ দিতে যাবার সময় পানিতে ডুবে মারা যান।

বারবারোসার বংশধররা পোপদের সাথে বিবাদ করেই চলছিলেন। তার পৌত্র, সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার খায়েশ জেগেছিল। কিন্তু তিনি জার্মানীকে ভালভাবে চেনেন না, জানেন না বলে বেশিরভাগ জার্মান ডিউক ও বিশপ তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তবে জ্ঞানী ও দক্ষ আইনজীবী পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সমর্থন করেন ফ্রেডরিককে। এরপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ফ্রেডরিকের দল লড়াই জিতে নেয়। তিনি নির্বাচিত হন সম্রাট হিসেবে।

ফ্রেডরিক দ্বিতীয়র সাথে পরবর্তী পোপদের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। খুব কম লোকই তাকে বুঝতে পারত। কারো কাছে তিনি ছিলেন অতি মানব, কারো মতে উন্মাদ। তাকে লোকে ডাকত 'স্টুপর মান্ডি' বা 'বিশ্বের বিস্ময়' বলে। ফ্রেডরিক গোটা ইটালিকে তার সাম্রাজ্যের অধীনে এনে পোপদেরকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চালাতে চেয়েছিলেন। একটি নতুন ল্যাটিন সাম্রাজ্য শাসন করতে যাচ্ছিল ইউরোপকে, আর রোম হতে যাচ্ছিল তার রাজধানী।

ওই সময়ের পোপ নবম গ্রেগরী বাধা দেন। ফ্রেডরিক ইটালি থেকে মার্চ করে রোমের দিকে অগ্রসর হলেও এ শহর দখল করতে পারেন নি। পোপের বাহিনী ও মিত্রপক্ষ তাকে পারমার যুদ্ধে পরাজিত করে। ফ্রেডরিকের ছেলেরাও লড়াই চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে সিসিলির ক্ষমতায় বসানো হয় ফ্রান্সের নবম লুইয়ের ভাই, ফরাসী যুবরাজ চার্লসকে। তবে এ কাজটা ঠিক করেননি পোপ। কারণ এতে ফ্রান্স জার্মানীর মতই আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। আর পোপরা ধর্মকর্ম বাদ দিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে শুরু করলে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তারা সামন্তদের চেয়ে বেশি সম্মান অর্জন করতে পারেননি।

জার্মানীর দৃষ্টি ততদিনে পুবের রাজাদের ওপরে পড়েছে, মাঝে মাঝে সামন্ত ডিউকদের নিয়ে তারা পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়ায় (বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়া) আক্রমণ চালিয়েছে। ওখানে নিজেদের লোকদের জন্যে তারা উপনিবেশ বানিয়েছে এবং স্লাভদের সাথে (তারা ওখানে শতশত বছর ধরে বাস করত) মারামারি করেছে।

ভূমধ্যসাগর এলাকায় শহর লুঠপাট করতে আসা ভাইকিংরা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি মূলতঃ আবহাওয়ার কারণে। গরম আবহাওয়া তাদের সহ্য হতো না। তবে কানুট একাদশ শতাব্দীতে মহাপরাক্রমশালী হয়ে ওঠার পরে ভাইকিংরা ইটালি ও

সিসিলির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। ইটালি তখন কতগুলো খণ্ড রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি দেশ। আর রাজ্যগুলোর যেমন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না, একতাও ছিল না। দক্ষিণ প্রভাবিত হয়ে উঠছিল ইসলাম দ্বারা, কারণ মুসলিমরা সিসিলি ও ইটালির আঙ্গুলের ডগায় বাস করেছে বহুদিন। উত্তরে আবার প্রভাব ছিল জার্মান ও ফরাসীদের। মাঝখানে ছিল রোম, পোপদের বাসস্থান।

যে সব ভাইকিং নরমাণ্ডিতে থিতু হয়েছিল (তাদেরকে নরম্যান বলা হতো, নর্সমেনের সংক্ষেপ) তারা ভূমধ্যসাগর এলাকায় অগ্রসর হতে শুরু করে। নরম্যান নেতা রবার্ট গুইসকার্ড দক্ষিণ ইটালিতে এসে টারান্টো ও ব্রিদিসির প্রধান বন্দরগুলো দখল করে ফেলেন। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ওখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেন এবং পোপদের সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোপরা বিশ্বাস করতেন নরম্যানদেরকে ধর্মযুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। উত্তরে, পিসার সামুদ্রিক শহর জেনোয়া ও ভেনিস ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করে প্রচুর ধন সম্পদ উপার্জন করেছিল। তাই তারা কোন দলে থাকতে চায়নি। স্বাধীন থাকতে চেয়েছে। তাই ইটালিকে একত্রীকরণের সকল চেষ্টার বিরুদ্ধে তারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শতাব্দী ধরে গোটা পেনিনসূলায় তারা ছিল সবচেয়ে ধনবান শহর, তাদের যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্তে একত্রীকরণকে অসম্ভব করে তোলে।

একত্রিত হবার এই শূন্যতা পরিণতিতে ইটালির জন্যে অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সৈন্যরা উত্তর ও মধ্যাংশের উর্বর ভূমিতে লুটপাট চালিয়েছে, রোমের বহুবার মালিকানা বদল হয়েছে, ফলে প্রতিবারই মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন হয়েছে ধ্বংস। ছোট রাজ্যগুলো নিজেদের সুবিধা মত জায়গা বদল করেছে। জাতীয় আনুগত্য বলতে কিছু ছিল না। এমনকি সামান্য ব্যাপার নিয়েও সমুদ্র তীরবর্তী ধনী শহরগুলো নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিনিময়ে পায় নি কিছুই। ওই সময় যদি মুসলমানদের মত শক্তিশালী ও কর্মঠ কেউ থাকত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সহজেই গোটা পেনিনসূলা দখল করে ধনী হয়ে যেতে পারত সে।

এরকম অস্থির সময়ে ইটালি হয়ে ওঠে বিখ্যাত রেনেসা যুগের পীঠস্থান। ছোট রাজ্যগুলো শিল্পকলা ও দালান কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছিল, শিল্পী ও কারিগররা সৃষ্টিশীল কাজ করার জন্যে উৎসাহ পেতে থাকেন। বাণিজ্যিক শহরগুলো এসব কাজে রসদ ও টাকাপয়সা জোগাবার ভার নেয়।

একত্রীকরণের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্সটান্টিনোপলের পতনের পরে ইটালি সমস্ত কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত জরুরী ভূমিকা রাখতে শুরু করে। কারণ ইটালি তখন ছিল ক্রিশ্চিয়ান চার্চের একমাত্র উৎসমুখ।

উনত্রিশ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি স্পেন ও পর্তুগাল ওমায়েদ খলিফাদের অধীনে ছিল। একাদশ শতকের শুরুতেও মুসলমানরা স্পেনের দক্ষিণ

ও পূর্বাংশসহ পর্তুগালের কিছু অংশ দখল করে ছিল। তবে মরক্কোতে নিজেদের জাতিগোষ্ঠীর অবিরাম সংঘর্ষে খলিফাদের শক্তি কমে আসছিল। পেনিনসূলা পুনর্দখলের জন্যে এটা একটা সুযোগ ছিল খৃষ্টান বাহিনীর জন্যে। একাদশ শতকে ক্যান্টিল ও লিয়নের রাজা (স্পেনের একটি রাজ্য) আলফানসো ষষ্ঠ গুয়াদারামা পাহাড়ি অঞ্চল পার হয়ে মাদ্রিদের সত্তর মাইল দক্ষিণে অবস্থিত টলেডো দখল করে নেন। ক্রমে খ্রিষ্টানরা পেনিনসূলার বড় একটি অংশ পুনর্দখল করে, তবে কাজটা করতে তাদের বহু সময় লেগেছিল বেশির ভাগ জায়গা যুদ্ধের জন্যে উপযুক্ত ছিল না বলে। তাছাড়া মুসলমানরাও নিজেদের এক চিলতে জমি ছাড়তে চায়নি। তাই প্রাণপণে লড়াই করেছে তারা।

১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাষ্টিলের রাজা আলফানসো নবম সালাদো নদীর তীরে উন্মুক্ত যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যান দক্ষিণে। মুসলিমরা গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওখানেই তারা দেড়শ বছর ছিল।

আলফানসোর পরে ক্ষমতায় আসেন পেড্রো দ্য ক্রুয়েল (১৯৫০–৬২)। এর সময়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বহু বছর ধরে চলেছে এ যুদ্ধ।

পর্তুগাল জ্ঞানী রাজা জন (১৩৮৫–১৪৩৩) উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের এলাকায় হামলা শুরু করেন। হামলাকারীরা মরক্কোর সমুদ্র উপকূলে চলে আসে এবং সমৃদ্ধ শহর ও বন্দরগুলোতে লুণ্ঠন চালায়। পর্তুগীজ নাবিকরা আবার সাগরে ছিল অজেয়। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে জন কিউটাতে একই সাথে জলে ও স্থলে হামলা চালান। কিউটা হলো আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, জিব্রোল্টারের বিপরীতে। পর্তুগীজরা দীর্ঘদিন কিউটা অবরোধ করে রাখার পরে ওটা দখল করে নেয় এবং আফ্রিকার মাটিতে প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর বিশেষ মূল্য ছিল। ক্যাসাব্লাঙ্কা ও তানজিয়ার দখল হয়ে যায় এবং উত্তর আফ্রিকার কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পেয়ে পতুর্গাল দেশ আবিষ্কারে বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হয়।

জার্মানীর অটো দ্য গ্রেটের সময় ফ্রান্স ছিল কতগুলো ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে একটি দেশ। এ দেশের বেশির ভাগ দখল করে রেখেছিল নরম্যানরা। ফ্রান্সের রাজারাও ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে ফ্রান্সের বেশির ভাগ মানুষ তাদেরকে মেনে নেয় নি। উইলিয়াম অব নরম্যাণ্ডি যিনি ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জয় করেন ইংল্যাণ্ড, তিনি ফ্রান্সকে প্রভু হিসেবে মেনে নিতে রাজি হন নি। ফরাসী ইতিহাসের চারশ বছর কেটে গেছে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধে কে ফ্রান্সের কোন্ অংশের দখল নেবে তার মীমাংসা নিয়ে।

১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের হেনরী দ্বিতীয় যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন ওই সময় তার অধীনে ছিল ফ্রান্সের বিশাল অঞ্চল, আঞ্জু, তুরিন, মেইন, আকুইটেন এবং নরম্যাণ্ডি। ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সিংহাসন হস্তান্তর করা হয় ধূর্ত ও যোগ্য

ফিলিপ অগাষ্টাসকে। ইনি ফ্রান্সকে একত্রিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। তিনি ফ্রান্সের রাজ্যগুলো থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই হেনরী দ্বিতীয়র ছেলেদেরকে তাদের বাপের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে থাকেন। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ইংল্যাণ্ডের রাজা হবার পরে ফ্রান্সের রাজ্যগুলোর ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে ফিলিপ একই সাথে বেশ কটি ফ্রন্টে ইংল্যাণ্ডের ওপর হামলা চালিয়ে বসেন। স্বল্প সময়ের অভিযানে তিনি বিশাল এলাকা ও প্রচুর বড় বড় শহর দখল করতে সমর্থ হন।

এই স্বোপার্জনের বেশিরভাগ ফ্রান্সের হাতেই ছিল ইংল্যাণ্ডের এডোয়ার্ড তৃতীয় (১৩২৭–৭৭) আমল পর্যন্ত। ফিলিপের ছেলে লুই অষ্টম ফরাসী আইন ফ্রান্সের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং তার ছেলে নবম লুইর আমলে ফরাসীরা সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকে।

লুই ছিলেন একজন অসাধারণ রাজা। মাত্র বার বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও দয়ালু। একই সাথে সাহসী এবং বেপরোয়া। ফরাসী ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা তিনি। ফিলিপ অগাষ্টাসও যা পারেননি, নবম লুই তা পেরেছেন– সামন্ত ডিউক ও মাউন্টদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়েছেন। লুই ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছেন। তার সময়ে ফ্রান্স বেশ শান্তিতে ছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশটি। বিশেষ করে স্থাপত্য, ক্যাথেড্রাল নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল অন্যতম। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গোটা ইউরোপে দর্শন বিষয়ে পড়াশোনার জন্যে পীঠস্থান। বিভিন্ন দেশ থেকে চিন্তাবিদ ও লেখকরা এসে ভিড় জমাতেন প্যারিসে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন ঘটে।

লুইর উত্তরাধিকারীরা তার মত জ্ঞানীগুণী ছিলেন না। বরং আগ্রাসী মনোভাবের ছিলেন। তারা পোপ ও প্রতিবেশী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ বোনিফেস অষ্টম অবিবেচকের মত ঘোষণা করে বসেন সকল রাজা ও যুবরাজদের ওপর পোপদের আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং সকল সরকারি কর্মকাণ্ডও তাদের কথায় চলবে। ফ্রান্সের ফিলিপ পঞ্চম এ ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে একটি সেনাদল পাঠিয়ে দেন পোপকে গ্রেফতারের জন্যে। গোটা খ্রিষ্টান জাতি ভয়ে কেঁপে ওঠে। তবে বোনিফেসকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি কিছুদিন পরে মারা যান। তার উত্তরসূরিরা ফিলিপের আনুগত্য স্বীকার করেন।

পোপরা রোমে ফিরে আসেন ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, নবম জর্জের সময়ে। তার মৃত্যুর পরে, পরের বছর আরবান ষষ্ঠকে কার্ডিনালরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। কিন্তু ফরাসীরা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা নির্বাচিত করে ক্লেমেন্ট অষ্টমকে এবং তাকে দক্ষিণ ফ্রান্সের আভিগননে পাঠিয়ে দেয়। ওখানে আগে

থেকেই বাস করতেন পাপাল সী। একই রাজ্যে দু'জন পোপ থাকায় একটা তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাদেরকে ইউরোপীয় যুবরাজরা সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে সমর্থন দিতে থাকেন। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা চলেছে টানা সত্তর বছর। এতে গির্জার সম্মানহানিই হয়েছে।

১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সকল দল ঐকমত্যে পৌছে রোমে, মার্টিন পঞ্চমকে তাদের পোপ হিসেবে মেনে নেয়। এদিকে ফ্রান্স বেশ কটি যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরেছে (ক্রেসের যুদ্ধ ১৩৪৬, পয়েটারের যুদ্ধ ১৩৫৬ ও আগিনকোর্টের যুদ্ধ ১৪১৫)। আগিনকোর্টের বিজয়ী হেনরী পঞ্চম ফ্রান্সকে বাধ্য করেন 'ট্রিটি অব ট্রয়'কে মেনে নিতে (ফরাসী রাজা চার্লস চতুর্থের মৃত্যুর পরে তাকে রাজা বানাতে হবে।) ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে হেনরীর মৃত্যুর পরে তার শিশুপুত্র হেনরী চতুর্থ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ক্ষমতা দখল করে নেন হেনরী পঞ্চমের ভাই ডিউক অব বেডফোর্ড। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডমরেমি থেকে আসা এক ফরাসী গ্রাম্য তরুণী, জোন অভ আর্ক (বিশ্বাস করা হতো তাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্যে) চার্লস ষষ্ঠের বড় ছেলে ডফিন চার্লসকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। বলে সে নিজেই ফরাসীদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই মেয়েটি অর্লিন্সে ইংরেজদেরকে পরাজিত করে উত্তরে বিতাড়িত করে এবং ডফিনকে রেইমসে চার্লস সপ্তম হিসেবে সিংহাসনে বসায়।

জোন অব আর্ক বার্গানডিয়ানদের সাথে ছোটখাটা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে বন্দী হয়। তাকে তুলে দেয়া হয় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা তাকে আধ্যাত্মিক ডাইনি বলে অভিযুক্ত করে পুড়িয়ে মারে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইংরেজদের হাতে ক্যালাইস আর গিসনেস ছাড়া আর কোন ফরাসী জমি ছিল না। চার্লস সপ্তম মারা যান ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে। ক্ষমতায় আসেন ধূর্ত লুই একাদশ। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে তখন শান্তি বিরাজ করছিল, এ সুযোগে তিনি বার্গান্ডিদের ওপরে হামলা করে বসেন। ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বার্গান্ডি সবসময় দেশটির জন্যে একটি বিপজ্জনক প্রতিবেশী ছিল। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লুই একাদশের মৃত্যুর সময় ফ্রান্স ছিল সম্ভবতঃ ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি এবং মহাদেশে ভবিষ্যতে প্রভাব বিস্তার করার মত অবস্থানেও ছিল। তবে ফ্রান্স নয়, ষোড়শ শতকে ইউরোপ শাসন করেছে স্পেন তার বিশাল ধন-সম্পদের পাহাড় নিয়ে।

# মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজ

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ইউরোপে বর্বর হামলা ধ্বংস করে দিয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের একতাকে। সেই সাথে সমাজের কাঠামোই গিয়েছিল বদলে। রোমের অধীনে ছোট কৃষক কিংবা প্রাদেশিক সরকারি কর্মকর্তারা স্থায়ী হবার আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন। দ্রব্যমূল্য হয়তো বৃদ্ধি পেত কিংবা সাম্রাজ্যের সীমান্তে বুনো উপজাতিরা হামলা চালাত, তবে নাগরিকদের পেছনে ছিল রোমান আইন ও বিচারের শক্তি।



*মধ্যযুগের একটি ইউরোপীয় গ্রাম*

বর্বরদের আক্রমণ এ অবস্থা বদলে দেয়। দীর্ঘ দিন ধরে সাধারণ মানুষকেও আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হতো। সে হয়তো ছোটখাট খামার কিংবা আঙুরের বাগান দিয়ে নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারত, কিন্তু সভ্য মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থায়ীত্বের আনন্দ তার সাথে উপভোগ করা সম্ভব হতো না। ফলে বিশৃঙ্খল এ সমাজে নতুন ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়– ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র।

বর্বররা কোন দেশ দখল করতে পারলে সর্দার সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে তার নেতাদের হাতে জমি তুলে দিত। তবে এতে সমস্যাও ছিল। কোন কোন আগ্রাসী মনোভাবের নেতা তার প্রতিবেশীর জমি দখল করতে চাইত এবং অধিকতর শক্তিশালী হয়ে তার সর্দারকেই বিতাড়িত করত দেশ থেকে।

ষষ্ঠ শতকে ফ্রাঙ্করা তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন শুরু করলে রাজারা জমি উপহার দেয়ার প্রক্রিয়া বদলে ফেলেন। পুরস্কার হিসেবে নেতাকে জমি দেয়া হতো এ শর্তে যে জমির ওপরে রাজার পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং নেতা সর্দার বা রাজার আনুগত্য স্বীকার করে তাদের (রাজা বা সর্দার) জন্যে যখন প্রয়োজন হবে তখনই যুদ্ধে যাবে। লর্ড বা জমিদারকে তার জমিদারী থেকে সশস্ত্র সেনা সরবরাহ করতে হতো এবং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল তার। এ ছাড়া তার খামার ও জমির শিল্প কারখানা থেকে লভ্যাংশের ভাগও পেতেন রাজা।

তাই বলে এ নিয়ম চালু করায় ক্ষমতা দখলের বিপদ কিন্তু পুরোপুরি কেটে যায় নি, বিপদের মাত্রা হ্রাস করেছিল মাত্র। কাজের বিনিময়ে জমি পুরস্কার কিংবা লভ্যাংশের ভাগ পাবার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলছিল। অনুদানের পরিমাণ মাঝে মাঝে এমনই বিশাল ছিল যে একজন মানুষের পক্ষে তা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হতো। তাই সে রাজ্যকে ছোট ইউনিট বা স্টেটে ভাগ করে ফেলে। এর মধ্যে কোনটি আবার দ্বিতীয়বার বিভক্ত করতে হতো। এতে দেখা যায় যে জমিদারের বেশি জমি ছিল তাকে অন্যেরা সমীহের চোখে দেখত। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপদের একটা সম্ভাবনা ছিল। ক্ষমতাবান জমিদার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইলে সে তার অধীনস্ত জমিদারদের কাছে আনুগত্য দাবি করতে পারত। বিপদটা বৃদ্ধি পায় শার্লেমেনের মৃত্যুর পরে যখন জমিদাররা নিজেরাই খাজনা তোলার ক্ষমতা পেয়ে যান এবং প্রজাদেরকে তাদের জমি ছেড়ে যেতে নিষেধ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। জমিদারির নবম শতকের শেষার্ধে স্টেট অনুসারে টাইটেল প্রদান করা হতে থাকে ডিউক, মারকুইস্যাট, কাউন্ট, ব্যারন ইত্যাদি। জার্মানীর অটো দা গ্রেট কিংবা ফ্রান্সের লুই নবম কেবল মাত্র জমিদারদের খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন।

এই পদ্ধতি বা ফিউডাল সিস্টেম ডিউক অব নরম্যাণ্ডি উইলিয়ামের হামলার সময় ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যাণ্ডে। তবে উইলিয়াম এ পদ্ধতির অনেকটাই পরিবর্তন করেছেন। ফিউডাল সিস্টেমের সকলকে আগে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, তারপরে জমিদারের কাছে। কাজেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান জমিদারটি বিদ্রোহ করতে চাইলেও তার প্রজারা রাজাকে সমর্থন দিতে বাধ্য ছিল।

বিদ্রোহের আশঙ্কা অবশ্য আরো একটা কারণে কমে এসেছিল। উইলিয়াম প্রচুর জমি দান করতেন জমিদারদেরকে। তবে এক্ষেত্রেও কৌশল অবলম্বন করেছেন উইলিয়াম। একজন কাউন্টকে হয়তো এক হাজার একর জমি তিনি দিয়েছেন। তবে সে জমিও ছিল নানা ভাগে বিভক্ত। কোন অংশ ছিল ডেভনশায়ারে, কোনটি সাসেক্সে আবার কোনটি ইয়র্কশায়ারে। ফলে একজন কাউন্ট ইচ্ছে করলেই তার সমস্ত বাহিনী এক জায়গায় একত্রিত করতে পারতেন

না। তাকে অন্যের জমিদারী পার হয়ে নিজের জমিতে যেতে হতো। সেক্ষেত্রে অপর পক্ষ কাউন্টকে নিজের জমিতে ঢুকতে নাও দিতে পারত কিংবা সে হয় তো রাজার পক্ষ অবলম্বন করত।

উইলিয়ামের এই সামন্ত প্রথার কারণে নরমান রাজারা ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বিজয়ের পরে ইংল্যাণ্ডে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শাসন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু নিচু স্তরের মানুষজনের কি রকম অবস্থা ছিল? ফিউডাল সিষ্টেমে বেশ ভালভাবেই শস্য উৎপাদন করা যেত। নিজের চাহিদা মিটিয়েও ব্যবসা করতে পারত। তবে এ জন্যে তাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হতো। একজন সার্ফ (সামান্য অধিকার সম্পন্ন ক্রীতদাস) কিংবা একজন ফ্রী ম্যানের নিজের অবস্থার উন্নয়নের কোন সুযোগই থাকত না। কোন সুহৃদয় জমিদারের অধীনে হয়তো সার্ফরা কিছু টাকা পয়সার মালিক হয়ে জীবনকে খানিকটা উপভোগ করতে পারত। যেমন দামী জামাকাপড় এবং বাড়ি ক্রয়। তবে এরকম হৃদয়বান জমিদারের সংখ্যা ছিল কম।

ইউরোপে ফিউডাল সিষ্টেম টিকেছে বহু বছর। তবে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি গ্রামে, কারণ এ ব্যাপারটি নির্ভর করত জমিজমার ওপরে। অবশ্য এ প্রথার শুরুর দিকে শহরের চেয়ে গ্রামের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে ক্রুসেডাররা পুবে আসতে শুরু করলে পুব-পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্য চালু হয়ে যায় এবং শহরের ব্যাপ্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন নতুন শ্রমশিল্প সৃষ্টি হতে থাকে এবং যারা গ্রামে থাকতে পারত না তারা শহরে চলে আসতে শুরু করে। শহরগুলো অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত সরকারের আদলে গড়ে ওঠে। শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায় তাদের ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধির জন্যে।

ফিউডালিজম শুধু জমি নয়, সিষ্টেম চালু রাখার জন্যে শ্রমিকদের ওপরেও নির্ভরশীল ছিল। বিশেষ করে সার্ফ জনগণ, এদেরকে কম মজুরী দিয়ে জমিদাররা খাটিয়ে নিতেন বেশি। সার্ফরা বিশ্বস্ত ও শান্তিপ্রিয় হবার কারণে জমিদাররা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী থাকার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকদের বিদ্রোহের পরে সার্ফ প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ইংল্যাণ্ডে সামন্তপ্রথারও অবসান ঘটে। তার জায়গায় আবির্ভাব ঘটে বাণিজ্যিক সমাজের। তবে এ সামন্ত প্রথার কারণেই কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল।

# ইসলাম ও ক্রুসেড

দীর্ঘ তিনশ বছর সাবলীল গতিতে চলার পরে, দশম শতকে হঠাৎ করেই হোঁচট খায় ইসলাম, স্থবির একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় কিছু সময়ের জন্যে, এর প্রভাব ও শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। ইসলামী সংস্কৃতি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের সর্বত্র বিস্তৃত থাকলেও এর সামরিক শক্তি সামর্থ্য যেন মিইয়ে গিয়েছিল। ইসলামী বিশ্বাস নিয়ে আরব ও তুর্কীদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে এর সুযোগ পুরোটাই গ্রহণ করে খ্রিষ্টানরা। কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং সিসিলির কিছু অংশ চলে যায় নরম্যান অথবা ফরাসীদের কাছে।

এদিকে, মধ্য রাশিয়া থেকে আসা তুর্কীরা নিকট প্রাচ্য ও ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ শুরু করে দেয়। গজনাবিদ (বর্তমানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান) তারা দখল করে নেয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তারা ভারতের দিকে অগ্রসর হয় এবং সিন্ধু নদ পার হয়ে গঙ্গার দিকে পা বাড়ায়। লাহোর ও পেশোয়ারের পতন ঘটে এবং মুসলমানদের জায়গায় চলে আসে হিন্দু ধর্ম মতাবলম্বীরা। এটা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করেছিল যা চিরকালের জন্যে ভারতের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। আর এই বিভেদই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে- ভারত ও পাকিস্তান।



*মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম সেরা বীর সালাদিন,*

আরেক ভয়ঙ্কর তুর্কী উপজাতি, সেলজুকরা রাশিয়া থেকে দলে দলে নেমে এসে পারস্য ও গজনাবিদে হামলা চালিয়ে দেশ দুটিকে অত্যন্ত দ্রুত পদানত করে। দখল হয়ে যায় বাগদাদ এবং তুর্কী নেতা তুঘরিল খলিফা বা সুলতানের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন। তুঘরিল এরপরে অগ্রসর হন আর্মেনিয়ার দিকে এবং তার উত্তরসূরিরা সিরিয়ান শহর ও সমভূমি লুট করে। ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সেলজুকরা পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল।

ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে, মরোক্কান মুসলিমরা দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং ইসলামকে আফ্রিকার একেবারে কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তারা স্পেন ও পর্তুগালেও হামলা চালিয়েছে এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে পাঠানো সকল ইউরোপীয় সৈন্যকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারা স্পেনে সেভিল, সারাগোসা এবং ভ্যালেনসিয়া দখল করে প্রায় পেরিনিজ পর্যন্ত পৌছে যায়।

ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল তুর্কীদেরকে আর এগোতে দেবে না। তুর্কীরা পবিত্রভূমি প্যালেষ্টাইনে তীর্থ করতে আসা হাজারো মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করলে ইউরোপীয় যুবরাজ ও রাজারা প্রতিশোধ নিতে একতাবদ্ধ হন। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ আরবান দ্বিতীয় খ্রিষ্টান নেতাদেরকে ভেদাভেদ ভুলে যৌথ একটি প্রকাণ্ড বাহিনী গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানান এবং পূর্বে যাত্রা করেন তুর্কীদের হাত থেকে পবিত্র ভূমিকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। ক্রুসেডার বা ধর্মযোদ্ধা পিটার দ্য হারমিট পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর হলেও ওখানে পৌছতে পারেন নি। এশিয়া মাইনরে তিনি নিহত হন। তারপর গডফ্রে অব বুলিয়ন, ডিউক অব লোরেন মিলে যৌথ সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযানে নেমে পড়েন। এ ছিল প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধ আন্তর্জাতিক ও খ্রিষ্টানদের বোঝানোর জন্যে সকল নাইট ও সৈনিকরা তাদের ইউনিফর্মে লাল ক্রস পরতেন। নেতারা ছিলেন রাজা কিংবা যুবরাজদের সন্তান, ছোটখাট জমিদারীর ডিউকসহ গডফ্রে, রবার্ট, ডিউক অব নরম্যাণ্ডি (ইংল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম দ্য কনকারারের বড় ছেলে) প্রমুখ।

বিশাল বাহিনী পুব দিকে অগ্রসর হয়ে কন্সটানটিনোপলে পৌছে যায়। সংস্কৃতিবান বাইজেনটাইনরা তাদেরকে খুবই শীতল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। কারণ তারা পশ্চিমা ইউরোপীয়দেরকে পছন্দ করত না। তাদের চোখে ওরা ছিল কর্কশ ও অভদ্র।

ক্রুসেডাররা এশিয়া মাইনরে পৌছুলে সেলজুকরা তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে। কাউন্ট অব ফ্লান্ডার্স বল্ডউইনকে জেরুজালেমের সিংহাসনে বসানো হয় (১১০০-১১১৮)। খ্রিষ্টানদের জন্যে এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিষ্টান প্রদেশ, এর মধ্যে এডেসা, অ্যান্টিওচ এবং দামাস্কাসও ছিল।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইসলামের পুনর্জাগরণ হলে এসব অঞ্চলের কিছু এবং এডেসা থেকে ইউরোপীয়দেরকে বের করে দেয়া হয়। এর ফলে ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ইউজিনিয়াস তৃতীয় দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। এ ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় ১১৪৭-এ, পরিচালনা করেন ফ্রান্সের সপ্তম লুই এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কনরাড তৃতীয়। কিন্তু দামাস্কাসে পৌছুলে, ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হন।

ইসলামের যাত্রা আবার শুরু হয়। ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক থেকে আসা সালাদিন নামে এক প্রতিভাবান ও কঠোর-কোমলে মেশানো হৃদয়বান সৈনিক, যাকে খলিফা মিশরের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, সেই তিনি নিয়োগ কর্তাকে অপসারণ করে নিজেই ক্ষমতায় বসেন। নতুন একটি মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্য তাঁর ছিল, যে সাম্রাজ্য হবে সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী, পশ্চিম ইউরোপীয় ও বাইজেনটাইনিদেরকে ঠেকাতে সক্ষম। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি জয় করেন মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লিবিয়া ও এশিয়া মাইনরের অংশ বিশেষ। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সালাদিন জেরুজালেম দখল করেন।

১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপ একত্রিত হয় তৃতীয় ক্রুসেডের জন্যে। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রথম রিচার্ড। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাষ্টাসকে নিয়ে রিচার্ড গড়ে তোলেন বিশাল এক সেনাবাহিনী। এই বাহিনীর ভরণ পোষণের খরচ যোগাতে তিনি প্রজাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন করের বোঝা। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেডরা একর (Acre) দখল করেন তবে জেরুজালেম যাত্রার পথে দুই নেতা একে অন্যের সাথে ঝগড়া করে যে যার রাস্তা মাপেন। ফিলিপ ফিরে আসেন ফ্রান্সে, রিচার্ড অভিযান বাদ দিয়ে ফিরতি পথ ধরেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে অপহরণ করা হয় এবং মুক্তিপণের জন্যে বন্দী করে রাখা হয়। তবে হলিল্যাণ্ড ব পবিত্র ভূমি ছেড়ে আসার আগে রিচার্ডের সঙ্গে সালাদিনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সংস্কৃতানুরাগী সালাদিন সেলজুকদের মত ছিলেন না। তিনি খ্রিষ্টানদেরকে পবিত্র নগরী দর্শনের অনুমতি দিতেন, অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও কোন ক্ষতি করেন নি সালাদিন। এটাই ছিল তার মহানুভবতা।

আরো পাঁচটি ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল : চতুর্থ ক্রুসেডের সময়কাল ছিল ১২০২–১২০৪। পশ্চিম ইউরোপের নেতারা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হলিল্যাণ্ডকে পুনরুদ্ধার। তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল ইটালিয়ান নগরী ভেনিস ও জেনোয়ার ধনী ব্যক্তিরাও। এ দুটি নগরী ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ক্রুসেডাররা কন্সটানটিনোপলের দিকে প্রথমে যাত্রা করে। কিন্তু মাঝপথে মুসলিম অঞ্চলে প্রবেশের পরিকল্পনা তারা ত্যাগ করে। তারপর, কি কারণে কে জানে, তারা কন্সটান্টিনোপলে ঢুকে শহরে লুটপাট চালাতে শুরু করে। পরের পঞ্চাশ বছর পশ্চিম ইউরোপীয়রা ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিয়েছিল নয়া রোমান সাম্রাজ্য।

কন্সটান্টিনোপল দখল করায় ইতালিয়ান শহরগুলো অবশ্য বেশ লাভবান হয়েছিল। কারণ এর ফলে ঈজিয়ান সাগরে তাদের যাতায়াতের পথ সুগম হয় এবং

নতুন নতুন বন্দর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। যদিও বেশিদিন তারা বাণিজ্য চালাতে পারেনি কিন্তু যেটুকু সময় পেরেছে তাতেই সবাই লাল হয়ে গিয়েছিল।

বাইজেনটিয়াম ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে অবশেষে তার হারানো রাজধানী কন্সটান্টিনোপলকে ফিরে পায় এবং ল্যাটিন সাম্রাজ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্রাট ক্ষমতায় বসেন। তবে অর্থহীন যুদ্ধ পরিণতিতে তুর্কী ও মুসলিমদেরকে ইউরোপে প্রবেশের পথ সহজ করে দিয়েছিল। ইসলামেরও কিন্তু কম ক্ষতি হয় নি। নিকটপ্রাচ্যে তার শক্তি আর আগের মত ছিল না। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলিমরা চেঙ্গিস খানের বাহিনীর সাথে লড়াই করতে গিয়ে এমনভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল যে উঠে দাঁড়াতে তাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল।

শেষ ক্রুসেড ছিল অমীমাংসিত। এই পবিত্র যুদ্ধের শেষে হলিল্যাণ্ড মুসলমানদের হাতেই থেকে যায়। তবে এ যুদ্ধ আবার আরেক দিক থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ যুদ্ধের কারণেই ইটালিয়ান শহরগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিম ইউরোপ ধন সম্পদে টইটুম্বুর হয়ে ওঠে যা আগে ছিল না। খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যেকার অবিরাম শত্রুতা বা বিরোধিতা দূর প্রাচ্য থেকে আমদানী করা মালামালের মূল্যের ওপরে বিরাট প্রভাব রেখেছিল কারণ এসব মালামাল মুসলিম ও তুর্কী অঞ্চলের ওপর দিয়ে পরিবহন করা হতো। স্বাভাবিকভাবেই মালের ওপরে কর ধার্য করা হতো এবং ওই মাল যখন ইউরোপের বাজারে পৌছুত তখন দাম যেতে বেড়ে। তখন ইউরোপীয়রা দূর প্রাচ্যে স্থাপিত পুরানো বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে মাল পৌছানোর জন্যে নতুন পথ ও নতুন বাজার খুঁজতে থাকে।

# চেঙ্গিস খান ও পূর্ব

দ্বাদশ শতকে ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের মত দূরপ্রাচ্যেও অস্থির সময় বিরাজ করছিল। চীনে সুং বংশ যখন প্রাচীন চীনা সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত, ওই সময় চীনা সীমান্তে বিভিন্ন উপজাতির মাঝে অবিরাম বিক্ষোভ চলছে এবং সে জন্যে সুং ডাইন্যাস্টির শান্তি অন্তর্হিত। একবার এক সম্রাট এসব উপজাতি থেকে কিন নামের উপজাতিকে নিযুক্ত করেন অন্য উপজাতির সাথে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিনরা উল্টো সুংদের শত্রু হয়ে বসে তাদের রাজ্যের বড় একটি অংশ দখল করে ফেলে। অনেক দিন পরে তারা দখল করা অংশ ছেড়ে চলে যায় এবং পিকিং প্রদেশে নিজেরাই একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কিনরা চীনা সংস্কৃতি আত্মস্থ করেছিল চীনের আগেকার হামলাকারীদের মতই। এদিকে সুংরা আবার উঠে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী করে নেন নিজেদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এবং শিল্পকলা ও শ্রমশিল্পের উৎকর্ষ বিধানে কাজ চালাতে থাকেন।

হঠাৎ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বভাগে, চীন আক্রমণ করে বসেন ইতিহাসের সর্বকালের সেরা যোদ্ধা ও বিজয়ী চেঙ্গিস খান।

চেঙ্গিস খানের মোগল নাম তেমুজিন, জন্ম ১১৬২ খ্রীস্টাব্দে, মঙ্গোলিয়ার বৈকাল হ্রদের কাছে। তাঁর বাবা, এক মঙ্গোল সর্দার শৈশবেই সন্তানকে পিতৃহারা করেন। ফলে কঠিন জীবন শুরু হয় তেমুজিনের। তবে বাবার প[illegible] ধরে তিনিও সর্দার হয়েছিলেন প্রতিবেশীদের সাথে একের পর এক যুদ্ধে জিতে। [illegible]ই প্রধান মঙ্গোল সর্দার হবার খায়েশ ছিল। তেমুজিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল আরো ওপরে, আকাশ ছোঁয়া। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন একটি মঙ্গোল বাহিনী গড়ে তুলবেন যারা পৃথিবীর যে কোন দেশে হামলা চালাতে সক্ষম হবে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে, তেমুজিন, যিনি ছিলেন মঙ্গোলদের রাজা বা 'খান', নিজের নামকরণ করেন 'চেঙ্গিস' এর অর্থ 'সর্বময় প্রভু।' তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ছড়িয়ে অগ্রসর হবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলোকে একত্রিত করে তাদেরকে তিনি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনীতে রূপান্তর ঘটান। তার বাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগ অশ্বারোহী সাহসী পুরুষ, যারা অত্যন্ত দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল। এরা অসম্ভব দ্রুত গতিতে ঘোড়া চালাতে পারত। তাদের এই দ্রুত গতির অশ্বচালনা ইউরোপীয় ও মুসলমানদের আতঙ্কিত করে তুলত। কারণ তাদের পক্ষে অতি দ্রুত ঘোড়া চালানো সম্ভব ছিল না।

চেঙ্গিস খান চীনে প্রথম হামলা চালান ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধ যাত্রার আগে তিনি তার দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর অশ্বারোহী বাহিনীকে বলেছিলেন 'চীনের সম্রাটরা আমাদের পূর্ব পুরুষ ও জাতিগোষ্ঠীর অনেক ক্ষতি করেছে। মেরে ধরে হত্যা করেছে। মহান ঈশ্বর আমাকে আশ্বস্ত করেছেন এবার আমার জয় হবেই। তিনি আমাকে সুযোগ ও ক্ষমতা দিয়েছেন এই চীন রাজ্য আক্রমণ করে আমাদের পূর্ব পুরুষের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার।' (চেঙ্গিস খানের জাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজন ছিলেন তুর্কী যারা মধ্য রাশিয়া থেকে এসেছিলেন)

চেঙ্গিস খানের ভয়াবহ আক্রমণের জন্যে চীনের শাসককূল মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, চীনের মহা প্রাচীর তিন জায়গায় ভেঙে ফেলা হয়। এই ফাটল বা গর্ত দিয়ে মঙ্গোল সর্দার তার বাহিনী নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোটা উত্তর চীন চলে আসে তার হাতের মুঠোয়।



*চেঙ্গিস খান (১১৬২–১২২৭) তের শতকের প্রথম ভাগে এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নেন এবং স্থায়ী একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা তার ছিল। তবে তার আগেই তিনি মারা যান।*

চেঙ্গিস খানের বিজয় অভিযানের কাহিনী বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। নিকট প্রাচ্যের কয়েকজন মুসলিম নেতা অবশ্য এ গল্প বিশ্বাস করতে চাননি। তবে চেঙ্গিস খানের এক দূত তাদেরকে কিন সম্রাটের অপূর্ব একটি রত্ন দেখালে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন সত্যি চেঙ্গিস খান চীন দখল করেছেন।

চীন অভিযানের বাকি দায়িত্ব অর্পিত হয় চেঙ্গিস খানের বিশ্বাস্ত সহকারী মুখুলির কাঁধে। পুরো বাহিনী নিয়ে তিনি একে একে অভিযান চালান খোয়ারেজম (উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলিম রাজ্য), পূর্ব পারস্য ও আফগানিস্তানে। তিন বছরের মধ্যে তিনি ওই অঞ্চল জয় করেন এবং দখল করেন এর প্রধান শহরে বোখারা ও সমরখন্দ। সমরখন্দ অপূর্ব সুন্দরী এক নগরী।

চেঙ্গিস খান ওই শহরে লুটপাট চালাননি দুইলাখ মুদ্রা পেয়ে। তবে শহরের হাজার হাজার আদিবাসী, যাদের বেশিরভাগ ছিলেন শিল্পী, লেখক ও কারিগর, তাদেরকে ধরে মঙ্গোলিয়ার উত্তর চীন ও উত্তর রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় কাজ করার জন্যে। চীন ও মঙ্গোলিয়া এভাবে পশ্চিমা সভ্যতার আরো কাছে চলে আসে।

১২২৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ চেঙ্গিস খান গোটা এশিয়ার অধিপতি হয়ে বসেন শুধু ভারত ও সুং সাম্রাজ্য ছাড়া। তবে তার ক্ষমতার দাপটের আঁচ ওই দেশের মানুষও টের পেয়েছিল বলে তারা চেঙ্গিস খানের প্রতি ছিল নতজানু। চেঙ্গিস খানের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পারস্য থেকে পিকিং, সাইবেরিয়া থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত। বলা হতো এ বিশাল সাম্রাজ্যের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় পৌঁছুতে নাকি দু'বছর সময় লাগত।



*কুবলাই খান, চেঙ্গিস খানের পৌত্র, ছিলেন একজন সুশাসক।*

১২২৭ খ্রীস্টাব্দে এই বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চীন পরিদর্শনের পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শান-শি প্রদেশে তার মৃত্যু ঘটে। তারপর ক্ষমতায় আসেন তার ছেলে ওগদাই। তার একমাত্র কাজ ছিল বাপের রেখে যাওয়া প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যকে সুসংহত রাখা। কিন্তু ওগদাই ছিলেন অপদার্থ ও মদ্যপ। মাঝেমাঝে মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকতেন। সাম্রাজ্যের দেখভাল করতেন চেঙ্গিস খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চীনা কূটনীতিক ই-লি-চুতসাই। তিনি মোঙ্গল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে নানা জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। জমির পরিমাণ অনুসারে তিনি কর ধার্য করতেন, শুকনো আর মরুভূমি এলাকায় সেচ প্রকল্পের উন্নয়ন ঘটানো হয়। মূল রাজপথে একটু দূরে দূরে কুয়ো খনন করা হয়েছিল পথচারীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে ঘোড়সওয়ারের সাহায্যে চিঠিপত্র বিলির ব্যবস্থা করা হয়। রাজধানী কারাকোরামের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়।

ওগদাই ওদিকে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিজেকে সামরিক অভিযানে ব্যস্ত রাখতে শুরু করেন। রাশিয়ার বুনো, নিষ্ফলা জমির মাঝ দিয়ে মস্কো পৌঁছান। সে সময় মস্কো ছিল ছোট একটি শহর মাত্র। তিনি পশ্চিমে ইউরোপের দিকে আরো অগ্রসর হন এবং পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী দখল করেন। গোটা ইউরোপ শংকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল তিনি দানিউব পাড়ি দিয়ে জার্মানী ও ফ্রান্সে ঢুকে পড়েন কিনা দেখার জন্যে।

তবে ওগদাই তার আগেই, ১২৪১ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। প্রায় সাথে সাথে তার বাহিনী রাশিয়ার দিকে ফিরে যায় যেখানে ভোলগা নদীর তীরে তারা অবস্থান নিয়েছিল। এর কারণ আমাদের জানা নেই।

পরবর্তী কুড়ি বছরের মোঙ্গল শাসনের চিত্র পরিষ্কার নয়। চেঙ্গিস খানের সন্তান ও পৌত্ররা পরস্পরের সাথে শুধু ঝগড়া বিবাদই করে আসছিল। তারপর চেঙ্গিস খানের এক নাতি, কুবলাই খান নিজেকে পিকিং-এর রাজা বলে ঘোষণা করে চীনা সম্রাটদের সকল আচার-আচরণ অভ্যাস করে ফেলেন। তিনি চীনা ভাষায় লিখতে পড়তে জানতেন, গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধধর্ম এবং দরবারে চীনা আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করা হতো।

১২৫০ খ্রীস্টাব্দের কিছু পরে কুবলাই খান সুং চীনে হামলা করে বসেন এবং দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে জয় করে নেন গোটা সাম্রাজ্য। ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সম্রাট হন ও প্রতিষ্ঠা করেন মোঙ্গল ইউআন বংশ। তিনি গোটা চীনতো বটেই সেই সাথে মোঙ্গল সাম্রাজ্য যা রাশিয়া থেকে চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, একাই শাসন করেছেন। তিনি যেন চীনাদের চেয়েও বেশি চীনা হয়ে গিয়েছিলেন। তার দরবার বোঝাই ছিল শিক্ষিত চীনা ভৃত্য ও পারিষদে। তিনি চমৎকার সব দালান কোঠা নির্মাণ করেন, শিল্প শ্রমের উন্নতি ঘটান, তার সাম্রাজ্যে ধন-সম্পদ উপচে পড়ছিল। চীনের এই সমৃদ্ধ অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ভেনেশিয়ান পর্যটক ও সওদাগর মার্কোপোলো (১২৭৫)।

কুবলাই খান ১২৯১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য আগে থেকেই বিরাট মোঙ্গল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কারণ বহু দূরের অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিনই ছিল কুবলাই খানের জন্যে।

মোঙ্গলরা হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড লুণ্ঠন করে ফিরে গেলেও তাদের হামলার প্রভাব ছিল স্থায়ী। চীনের বিপুল ধন সম্পদ এবং এর আশ্চর্য অগ্রসর সভ্যতা প্রথমবারের মত পশ্চিমা জগতের নজর কাড়ে। প্রথমে পারস্য, তারপরে পার্থিয়া, আবার পারস্য এবং সবশেষে ইসলাম চীন ও পশ্চিমের মধ্যে যোগসূত্রিতা হয় বন্ধ করে দিয়েছে নতুবা সীমিত যোগাযোগের ব্যবস্থা রেখেছে। বাণিজ্য করার রাস্তা ছিল খুবই ঝামেলা পূর্ণ। যদিও রোমানরা দূর প্রাচ্যের সাম্রাজ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে চীনা সিল্কসহ অন্যান্য জিনিসপত্র কিনত, তবে চীনা সভ্যতার ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখত খুব কমই। পশ্চিমের উৎসাহী সওদাগররা চীনে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বাণিজ্যের সন্ধান পেয়ে যায় এবং ত্রয়োদশ শতক শেষ হবার আগেই ইউরোপীয়রা চীনা মাটিতে ব্যবসা শুরু করে দেয়।

পশ্চিম ইউরোপের সাথে চীনের শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইসলামী জাতিগুলোর জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দেয়। কারণ ওই সময় ইসলামের পড়ন্ত অবস্থা চলছিল।

কুবলাই খানের মৃত্যুর পরে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাঙনের মুখে পড়লেও এর বহু অংশ চেঙ্গিসখানের বংশধরদের হাতে ছিল। তবে তাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসেন চেঙ্গিস খানের এক বংশধর, তৈমুর লং, ১৩৬৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জন্ম তুর্কীস্তানে, ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে, তিনি ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাজধানী সমরখন্দের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। এবং পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন।

তৈমুর লং বিশাল এক বাহিনী গঠন করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সহজে সকলের মন জয় করে নিতে পারতেন। তার গঠিত বাহিনীর সাথে চেঙ্গিস খানের বাহিনীর তুলনা করা যেত।তিনি প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। জয় করেন পারস্য ও মধ্য এশিয়া। তারপর ঝড় তুলে ঢুকে পড়েন রাশিয়ায়, পৌছে যান মস্কো। তবে আগের একজন বিজয়ীর হামলার শিকার হয়ে মস্কো তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিনি সিরিয়ায় অটোমান তুর্কীদের ওপর হামলা করেন এবং ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ঢুকে দখল করে নেন দিল্লী।



*তৈমুর লং, চেঙ্গিস খানের বংশধর, পূর্ব পুরুষের বিশাল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেন কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। তবে তার মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্য ভেঙে যায়।*

গোঁড়া মুসলমানদের ঘোর বিরোধী তৈমুর লং তার শত্রুদেরকে বিপুল সংখ্যায় কচুকাটা করেছেন। পারস্যের ইস্পাহানে তিনি নগরীর দেয়ালের গায়ে ৭০,০০০ মানুষের খুলি স্তূপ করে রেখেছিলেন। এরা সবাই ছিল তার বর্বর হামলার শিকার।

১৪০২ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর লং আঙ্কারায় আবার অটোমানদেরকে পরাজিত করেন। এবারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বায়েজিদ দ্বিতীয়। এরপরে তিনি চীনে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। তবে চীনে অভিযানের আগেই ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে মারা যান তৈমুর লং।

তৈমুর লং-এর মৃত্যুর পরপর তার সাম্রাজ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেলেও ইউরোপ ও এশিয়ায় তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে তার এক বংশধর, বাবর, ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত মোঘল সাম্রাজ্য।

তৈমুর লং-এর মৃত্যুতে ইসলাম সুযোগ পায় সামনে এগিয়ে যাবার এবং নিকট প্রাচ্যে সে এক সময় কর্তৃত্ব করতে থাকে।

# বাইজেনটিয়ামের অবসান

দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, সম্রাট দ্বিতীয় বাসিলের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন চারশ বছর আগের জাস্টিনিয়ানের মতই প্রায় কাছাকাছি অঞ্চল দখল করেছিল। এ সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি এসেও ইসলাম কিছু করতে পারেনি এবং ফার্টাইল ক্রিসেন্টেও বাইজেন্টাইনি উত্তাপ অনুভব করেছিল। বুলগেরিয়ান লুটেরাদেরকে এ সাম্রাজ্য হঠিয়ে দেয়ার পাশাপাশি উপকূলে আরব জলদস্যুদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে।



*তৈমুর লং ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে আংকারায় সুলতান বায়েজীদ দ্বিতীয়কে পরাজিত করে দখল করেন অটোমান।*

অভ্যন্তরীণভাবে বাইজেনটিয়াম একটি স্থায়ী ও সুস্থ সরকার উপভোগ করছিল এই স্থায়ীত্ব ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটায়। তবে সম্পদের বেশিরভাগই চলে যাচ্ছিল কয়েকজন সম্রাট, রাজ দরবার, অভিজাত, সওদাগর, সেনাপতি ও নৌবহর প্রধানদের হাতে।

পরবর্তী শতকে সেলজুক তুর্কীরা বাইজেনটাইনিদেরকে আক্রমণ করে এবং ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে উৎখাত করে। শুধু গ্রীস আর এশিয়া মাইনরের কিছু অংশে তাদের হাতে ছিল। ওই সময় ইউরোপ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের প্রথম সেলজুকদের নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচয় ঘটে, আর বাইজেনটাইনিদের সেলজুকদেরকে দমন করার মত শক্তি না থাকায় তারা পশ্চিমা ইউরোপীয় যুবরাজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। বাইজেনটাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। এভাবে জেগে ওঠে ক্রুসেড যার কথা এর আগে আমরা আলোচনা করেছি।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাইজেনটিয়ামকে চলতে হয়েছে শুধু বহিরাগতদের সাথে লড়াই করে– বুলগেরিয়ান, ইটালিয়ান এবং তুর্কী– এ ছাড়া ঘরের দ্বন্দ্বতো ছিলই। সম্রাটরা নির্বাচিত হতেন আর তাদেরকে সিংহাসনচ্যুত করা হতো। তবে অষ্টম মাইকেল কিংবা দ্বিতীয় ম্যানুয়েলের মত শক্তিশালী শাসকরা সাম্রাজ্যের একতা ও শান্তি মাঝেমাঝে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কিন্তু অবরোধ, বিদেশীদের অলস বিনিয়োগ ও শাসক শ্রেণীর জড়ত্ব বাইজেনটাইন সমাজের কাঠামোকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল। এ প্রথা বা অবস্থা থেকে বেরিয়ে যেতে অনিচ্ছুক বাইজেনটাইনরা স্থির দাঁড়িয়ে থাকত, অথচ একই সময় বাকি পৃথিবী তাদের পাশ কাটিয়ে অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সম্রাটেরা বেশ কয়েক শতক কনস্টান্টিনোপলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করলেও শেষ দিকে তা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে, বিখ্যাত অটোমান সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ ইউরোপে যেটুকু বাইজেনটাইন সম্পত্তি ছিল তা এক থাবায় দখল করেন। এর মধ্যে ছিল বুলগেরিয়া, উত্তর ও মধ্য গ্রীস। ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরাজিত হন আঙ্কারায়, তাকে বন্দী করেন তৈমুর লং। এতে তুর্কীদের হামলা থেকে সাময়িক একটা অবসর পায় বাইজেনটিয়াম।

তৈমুর লং-এর মৃত্যুর পর তার অগোছালো সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে। অটোমান তুর্কীরা তক্ষুণি তাদের সেনাবাহিনী একত্রিত করে বাইজে টাইনিনদের ওপরে হামলা চালাতে শুরু করে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সুলতান মোহাম্মদ দ্বিতীয় কনস্টান্টিনোপলে শেষ হামলা চালাবার জন্যে প্রস্তুত হন।

টানা আট হপ্তা, শতাধিক অটোমান কামান দিয়ে অবিরাম বর্ষণ চলে নগরীকে লক্ষ্য করে। ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় নগরীর দেয়াল ও মন্দিরে নরহত্যা চলে নির্বিবাদে। মের শেষদিকে সম্রাট কন্সটানটিন একাদশ খুন হয়ে যান। প্রায় সাথে সাথে তার সেনাপতিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয়ে যায়। পতন ঘটে বিশাল নগরীর আর সমাপ্তির ঘন্টা বাজে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের। পরাজিত বাইজেনটাইনরা দলে দলে পালিয়ে যায় পশ্চিমে। সেখানে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

# ইসলাম ও অটোমান

চেঙ্গিস খান যখন তার অজেয় ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে এশিয়ায় অভিযান চালাচ্ছেন (১২০৬-১২২৫) ওই সময় ইসলাম পড়ন্ত দশার নতুন প্রসব বেদনা ভোগ করছিল। মুসলিম তুর্কীরা ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপীয়দের হাতে শুধু পশ্চিমেই নয়, এশিয়া মাইনরের নিকট প্রাচ্য ও সিরিয়াতেও পরাজিত হচ্ছিল। তুর্কীরা তাই মোঙ্গল সর্দারকে প্রতিহত করতে পারেনি। চেঙ্গিস খান শুধু ভারতে থিতু হননি। কারণ মোঙ্গলরা এসেছিল শীতের দেশ রাশিয়া থেকে। ভারতের গরম আবহাওয়া তারা সহ্য করতে পারছিল না।

মুসলিম তুর্কীরা কয়েক বছর চুপচাপ ছিল, তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে যখন পরিষ্কার হয়ে যায় কুবলাই খানের বিশাল সাম্রাজ্য আর টিকছে না, তারা আবার ইসলাম প্রচারের শক্তি বুকে নিয়ে বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

তুর্কীরা প্রথমে সিন্ধু উপত্যকা গঙ্গা নদীর মাঝখানের এলাকা দখল করে। আর এ কাজ করতে গিয়ে তারা প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। অশোক ও হর্ষের সময়ে সযত্নে গড়ে তোলা কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় তুর্কীরা এবং শস্য খেতের রূপান্তর ঘটায় ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার জমিতে। সুপ্রাচীন এক সভ্যতার অধিকারী ভারতীয়দের জন্যে খুবই কঠিন একটা সময় যাচ্ছিল। তাদের দৈন্য দশার পরিসমাপ্তি ঘটে ষোড়শ শতকে প্রথম মুঘল বাদশা বাবরের আমলে। তিনি এমন এক মজবুত সাম্রাজ্য গঠন করেন যা স্থায়ী ছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।



*মহম্মদ দ্বিতীয়, অটোমান সুলতান, তিনি ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্সটান্টিনোপল দখল করেন।*

মুসলিম তুর্কীরা তাদের ইসলামী বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ-পুব এশিয়া সহ ইন্দোনেশিয়াতেও। তবে ইসলামের এ সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন।

সেলজুকরা চেঙ্গিস খানকে প্রতিরোধ করতে না পারলেও তার মৃত্যুর পরে তাঁর লৌহ শাসনের অবসান ঘটলে এশিয়া মাইনরের আরেক দল মুসলমান উঠে দাঁড়ায় এবং উপমহাদেশের সকল মুসলিমদেরকে একত্রিত করে। কয়েক বছরের মধ্যে তারা সকল বিরুদ্ধ পক্ষকে ধ্বংস করে এবং বাইজেনটাইনিদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে ইউরোপে প্রথম নিজেদের সফল প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়ে তাদের সুলতান ওরখান (১৩২৬-৫৯) তুর্কী বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন এবং নিজের বাহিনীকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত করেন। ওরখানের পরে ক্ষমতায় আসেন মুরাদ প্রথম, ইনি ত্রিশ বছর শাসন করেছেন (১৩৫৯-৮৯) এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন অটোমান সাম্রাজ্য। পিতা ওসমান প্রথমের (১২৯৯–১৩২৬) নামে তিনি সাম্রাজ্যের নামকরণ করেছিলেন।

মুরাদ মাঠে ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ ও সফল নেতা। তিনি খুব ভাল মধ্যস্থাকারীও ছিলেন, যুদ্ধের বদলে আলোচনার মাধ্যমে রাজ্যের সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন। তার সময়ে ইউরোপে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে অটোমানরা। আড্রিয়ানোপল ও সালেনিকা নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাইজেনটাইন নগরী তিনি দখল করেন। ফলে কন্সটান্টিনোপলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সম্রাট তখন মুরাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং তাকে অধিকর্তা হিসেবে ঘোষণা দেন।

এক যুদ্ধে সার্বিয়ানরা তুর্কীদেরকে পরাজিত করে। ওই যুদ্ধে মুরাদ নিহত হন। তারপর সিংহাসনে বসেন তার ছেলে বায়েজিদ। ইনি ইউরোপে বহুবার হামলা চালিয়েছেন। বায়েজিদ গ্রীসের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নেন এবং হুমকি দেন কন্সটান্টিনোপলকে। তবে তৈমুর লং-এর আগমনের খবর পেয়ে ফিরে আসেন এশিয়া মাইনরে।

তৈমুর লং এশিয়া মাইনরে হামলা চালিয়েছিলেন তার মিত্র শিবাসের আমিরের পক্ষে। আমিরকে অটোমানরা আক্রমণ করেছিল। ১৪০২ খ্রীস্টাব্দে, আঙ্কারায় তৈমুর লং বায়েজিদকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, ধ্বংস করে দেন তার সেনাবাহিনী এবং বন্দী করেন সম্রাটকে। বায়েজিদ কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। এশিয়া মাইনরে ভয়াবহ লুটপাট চলে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অটোমান ক্ষমতা।

বায়েজিদের উত্তরসুরি প্রথম মহম্মদ যেটুকু অটোমান সাম্রাজ্য শাসন করার জন্যে পেয়েছিলেন তা নিয়ে শান্তিতে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৪২১ খ্রীস্টাব্দে, তার উত্তরসুরি মুরাদ প্রথম (১৪২১–১৪৫১), বাইজেনটাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর লং মারা গেলে তার সাম্রাজ্যও

খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে শুরু করে। ওই সাম্রাজ্য নিয়ে আর বিপদের আশংকা ছিল না। মুরাদ নতুন করে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার কিছু অংশ অধিকার করেন এবং তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসেন বসফরাসের কয়েক মাইলের মধ্যে। দু'বছর পরে তার মৃত্যু হলে তার উত্তরসুরি, মহম্মদ দ্বিতীয় দখল করেন কন্সটান্টিনোপল এবং অবসান ঘটান বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হবার পরে এক হাজার বছর রাজত্ব করে গেছে।

কন্সটান্টিনোপল দখল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপরে, প্রায় পাঁচশ বছর আটোমান তুর্কীরা নিকট প্রাচ্য ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল শাসন করেছে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল।

# ইউরোপে রেনেসাঁ

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক নব জাগরণ সূচিত হয়। এই নবজাগরণের আগমন এমন একটি সময়ে যখন ইউরোপের জাতিগুলো সভ্যতা বিকাশে নিজেদের ভূমিকা খুঁজে পেয়েছে, যখন মানুষ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার শুরু করেছে। এই নবজাগরণই হলো ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ, যার শুরু ইটালি থেকে।



*সেন্ট পিটার্স, রোম-মাইকেল এঞ্জেলোর অসাধারণ সৃষ্টি*

গ্রীস ও রোমের সমৃদ্ধ সাহিত্য ও চিন্তা চেতনা পশ্চিমে একরকম ডুবন্ত অবস্থায় ছিল বর্বরদের হামলার কারণে। এখানে সেখানে বিশেষ করে আইরিশ মঠে পণ্ডিতরা এই প্রাচীন লেখকদের অনেক কাজই কপি করেছেন। তবে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিতরা সেসব পাণ্ডুলিপির প্রতি আগ্রহ দেখাননি যেগুলো খ্রিস্টান লেখকদের নয় এবং যাতে খ্রিস্টান ধর্মের চিন্তা-চেতনার কথা উল্লেখ ছিল না। প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, লুক্রেটিয়াস এবং সেনেকার মত দার্শনিকদেরকে অভিহিত করা হয়েছিল অধার্মিক, মূর্তিপূজারী বলে। কিছুকালের মধ্যেই এই সাহিত্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর, চতুর্দশ শতকে, যখন রোমান ক্যাথলিক চার্চে দু'জন পোপ একই সাথে কাজ করতেন, শিক্ষিত মানুষরা ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকটাই মুক্ত হয়ে

তাদের চিন্তাচেতনার সমর্থন খুঁজতে থাকেন। তারা মঠগুলোতে পাণ্ডুলিপির সন্ধান পেয়ে যান। চার্চের ভাষা ল্যাটিন প্রাচীন হওয়ায় ধ্রুপদ এই সাহিত্যের অনুবাদকর্ম তাদের জন্যে কিছুটা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। তবে বাইজেনটিয়াম থেকে আসা গ্রীক পণ্ডিতরা এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করেন। তারা আবিষ্কার করেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন।

শিক্ষিত এই মানুষরা 'হিউম্যানিস্ট' হিসেবে অভিহিত হন। তারা বিশ্বাস করতেন তাদের চিন্তাধারার সাথে যীশুর শিক্ষার মিল আছে, তাদেরকে গির্জার বড় একটি অংশ সমর্থন জানাত। শুধু বিশপ ও তাদের আদালত নতুন চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটলে নিজেদের সর্বনাশ হয়ে যাবে ভেবে হিউম্যানিস্টদের বিরোধিতা করতে থাকে। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কন্সটানটিনোপলের পতনের পরে আরো অনেক বাইজেন টাইন পণ্ডিত চলে আসেন পশ্চিম ইউরোপে, সঙ্গে ছিল নানা ধরনের প্রচুর প্রাচীন রচনা। এর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রীক ভাষায় রচিত নিউ টেস্টামেন্ট।

নিউ টেস্টামেন্টসহ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপরেও রচনা প্রকাশিত হয় সারা ইউরোপ জুড়ে। ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এর মাধ্যমে ইউরোপে মুদ্রণের কাজ শুরু হয়। শীঘ্রি শিক্ষিত লোকেরা হাতে পেতে থাকেন ছাপানো বই। যদিও বইগুলো দামে তেমন সস্তা ছিল না। দর্শন, অভিযান ও ইতিহাসের মূল রচনাগুলোও প্রকাশিত হচ্ছিল।

রেনেসাঁ সময়ে অসাধারণ কয়েকজন শিল্পী সাহিত্যিকের জন্ম। এদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী ডাক্তার র‍্যাবেলেইস যিনি 'Gargantua' গ্রন্থটি রচনা করেন। সার্ভান্তেস লেখেন তার অমর ক্ল্যাসিক ডন কুইক্সোট। ইটালিয়ান কূটনীতিক ম্যাকিয়াভেলি রচনা করেন The Prince (দ্যা প্রিন্স)। পর্তুগীজ কবি ক্যামিওন 'লুসিয়াড' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ভাস্কো দা গামার অবিস্মরণীয় অভিযাত্রার কাহিনী। ইংরেজ লর্ড চ্যান্সেলর স্যার টমাস মূরের অবিস্মরণীয় কীর্তি ইউটোপিয়া। সর্বকালের সেরা নাট্যকার লেখক ও কবি শেক্সপীয়র সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে লিখতে শুরু করলেও তিনি ছিলেন ইংরেজ রেনেসাঁর পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এটা এখন লিখে বোঝানো সম্ভব নয় হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির বদলে ছাপা বই পড়া সে সময় কি দারুণ আনন্দের ছিল পাঠকের কাছে।

শিক্ষা ও লেখার পাশাপাশি শিল্পকলার সব ক্ষেত্রেই দারুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল– চিত্রকলা, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। আর এ জাগরণের শুরু ইটালি থেকে। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রকলা ছিল আরস্ট ও একঘেয়ে। এর মধ্যে জীবনবোধের ব্যাপারটি তেমন ছিল না; এরপরে ইটালিয়ান চিত্রকর গিয়োর্টো ন্যাচারাল কালার দিয়ে আঁকতে শুরু করেন এবং বিশ্ব চিত্রকলার দ্বার খুলে দেন। তিন বা চার শতক ধরে ইটালিয়ান, ফ্লোরেনটাইন, ভেনেশিয়ান, কিংবা রোমানরা প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীদের সৃষ্টি করেছেন। স্থপতি ব্রুনেলেশচি অগাস্টাসের আমলের স্থপতি ভিট্রুভিয়াসের অসাধারণ সব কর্মের আবিষ্কারসহ পুনঃ উন্নয়ন করেছেন। তবে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির ছবি এবং মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য ছিল পৃথিবীর

সেরা। এ ছাড়াও রেনেসাঁ যুগ উপহার দিয়েছে ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি ডোনাটেল্লো, বতিচেল্লি, টিটিয়ান ও রাফায়েলের মত চিত্রকরদের। লিওনার্দো এবং মাইকেল এঞ্জোলো স্থপতি, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক এবং কবিও ছিলেন। সম্ভবতঃ এরকম বহুমুখী প্রতিভা আর কেউ ছিলেন না। শুধু উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের ইসামবার্ড কিংডোম ব্রুনেল ছাড়া।

ইটালির বাইরেও প্রতিভাদীপ্ত মানুষের অভাব ছিল না। ডাচরা শিল্প কলার অন্যতম সেরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত পেইন্টার ছিলেন রেমব্রানড্‌ট। স্প্যানিশ পেইন্টারদের মধ্যে ছিলেন এল গ্রেসো ও ভেলাসকুয়েজ, ওদিকে জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করতেন ডুয়েরার এবং হলবিয়েন।

রেনেসাঁ যুগে বিজ্ঞানের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। বিশেষ করে গবেষণামূলক বিজ্ঞান। বহু শতক ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহিত করেছে চার্চ। মূলতঃ ভয় ও অজ্ঞতা থেকে। ইংরেজ সন্ন্যাসী রজার বেকন বিস্ফোরণের বারুদ আবিষ্কার করেন। তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ভীত সন্ন্যাসীদের অনুরোধে পোপ বেকনকে গবেষণা করতে নিষেধ করেন। বারুদের ব্যবহার শুরু হলে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতো। সম্রাট এটি করায়ত্ত করতে পারলে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন। পোলিশ জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং পৃথিবী গোল। চার্চ তখন কোপার্নিকাসসহ এ মতবাদে কেউ সমর্থন জানালে তার গর্দান নেয়ার হুমকি দেয়। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি কোপার্নিকাসের ধারণা সত্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু গির্জা তাকে ধর্মমতের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করলে গ্যালিলিও বলতে বাধ্য হন তিনি ভুল কথা বলেছেন।

রেনেসাঁ যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও মেডিসিন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে পরীক্ষা করা হয়। গির্জার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে ভেসালিয়াস গোটা মানব শরীর শুধু কাঁটা ছেঁড়াই করেননি, অ্যানাটমির ছবিও এঁকেছেন। তার এ গবেষণা সার্জারী ও মেডিসিনের জন্যে নতুন দুয়ার খুলে দেয়। আলকেমিস্টরা ধাতু থেকে সোনা বানাতে চাইছিলেন, তবে আরো অগ্রসর রসায়নবিদরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন এটা অসম্ভব।

রেনেসাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের স্বাধীনতা। মানুষ স্বাধীনভাবে লিখতে, পড়তে, ভাবতে, ছবি আঁকতে এবং কোন কিছু নির্মাণ করতে পারত। কর্তৃত্বপরায়ন চার্চের সীমাবদ্ধ আঁতেল মার্কা নিয়ম কানুন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তবে এটা ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেনি। বরং বলা যায় সেরা সেরা ছবি কিন্তু আঁকা হয়েছিল খ্রিস্টান ঐতিহ্যের কাছ থেকে ধার করে। সবার উপরে রেনেসাঁ ছিল মানব সভ্যতার উন্নয়নের একটি অধ্যায় যার হাত ধরে অসীম ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার দিকে পা বাড়িয়ে ছিল মানুষ।

# আবিষ্কারের যুগ

পনের শতকের শুরুতে অটোমান সাম্রাজ্য এতই শক্তিশালী ছিল যে এটি পশ্চিম ইউরোপীয় এবং দূর প্রাচ্যের মাঝখানের ধনী দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত। অটোমানরা পুব ও পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্য চালাতে অনুমতি দিলেও মাল পরিবহনের ওপরে কর আদায় করতেন। করের হার এতই বেশি ছিল যে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য দূরপ্রাচ্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে ভেনিস কিংবা পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্যিক শহরগুলোতে বিক্রি হতো। বিশেষ করে মসলার দাম পড়ত বেশি, পশ্চিমে এটির প্রচুর চাহিদার কারণে। মসলা মাখিয়ে মাংস কিংবা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বেশিদিন সংরক্ষণ করা হতো। অটোমানরা নিজেরাও লাভজনক ব্যবসা চালাতেন। পারস্য থেকে ভারত ও চীনে যাবার ক্যারাভানের রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করে তারা অর্থ উপার্জন করতেন।

মার্কোপোলো চীনে (১২৭১-৯৫) ভ্রমণ শেষে সে দেশের বিপুল সম্পদ ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিলে গোটা পশ্চিম ইউরোপ দারুণ আশ্চর্য হয়ে যায়। আগ্রহী মানুষজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে এবং দূর প্রাচ্যে যাবার নতুন রাস্তা খুঁজে বের করে।

১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে সম্মিলিত নৌ ও সেনা পর্তুগীজ বাহিনী উত্তর আফ্রিকার কিউটায় হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেয় মূরদের কাছ থেকে। এই বিজয় প্রথম সত্যিকারের ইউরোপীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করে উত্তর আফ্রিকায় পরবর্তী শত বছরের জন্যে। তাছাড়া এর ফলে আবিষ্কারের যুগও শুরু হয়ে যায়। পর্তুগীজ নাবিকরা দূর প্রাচ্যে পৌছার নতুন রাস্তা খুঁজে বের করে অটোমান সাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন না করেই। প্রিন্স হেনরীর নেতৃত্বে (১৩৯৪-১৪৬০) সাগ্রেসে প্রতিষ্ঠা করা হয় নৌ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্যোতির্বিদ্যা, মানচিত্র তৈরি ও ভূগোল পড়ে পর্তুগীজ নাবিকরা নির্ধারিত অভিযানে বেরিয়ে পড়ত।

পর্তুগীজ নাবিকদের কাছে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিচিত হলেও তারা বেশিদূর এগোতে পারেনি। কারণ এক জায়গায় সমুদ্রের জল নাকি টগবগ করে ফুটত এবং সাগর থেকে আগুনের শিখা উঠে আসত। হেনরী ওরফে হেনরী দ্য নেভিগেটর পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনদেরকে অনুরোধ করেন ভয় জয় করে দক্ষিণ দিকে রওনা হতে, তিনি অভিযানের টাকা জুগিয়েছেন। ক্রমে ভয় কমে যায় ক্যাপ্টেনদের এবং তারা আস্তে-ধীরে দক্ষিণে অভিযান শুরু করেন।

১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে গিল ইয়ান্স অবশেষে কেপ বোজাডর ঘুরে গালফ অব গিনির দিকে অগ্রসর হয়ে ফুটন্ত সমুদ্র নিয়ে কুসংস্কার দূর করতে সমর্থ হন। তার

অভিযানে উৎসাহী হয়ে অন্যান্য পতুর্গীজ অভিযাত্রীরাও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং নিরক্ষবৃত্তের দিকে অগ্রসর হবার সাহস দেখান। প্রিন্স হেনরী মারা যান ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে, ভারতে যাবার রাস্তা আবিষ্কার হবার আগেই। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে, বার্থেলোমিউ ডিয়াজ কেপ অব গুড হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছে ওটাকে চক্কর দিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে নোঙর করেন। তিনি আরো এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু নাবিকরা বিদ্রোহের হুমকি দিলে পর্তুগালে ফিরে আসতে বাধ্য হন। রাজা এ অভিযানে খুব খুশী হয়েছিলেন। ডিয়াজ অন্তরীপে ভয়ংকর আবহাওয়ার বর্ণনা দিয়ে ওটাকে ঝড়ের অন্তরীপ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু রাজা তাকে আশাবাদী হবার পরামর্শ দিয়ে অন্তরীপের নাম রাখেন কেপ অব গুড হোপ। এ নাম আর বদলায়নি।



*ক্রিস্টোফার কলম্বাস চীনা অভিযানে পর্তুগীজ সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হন। শেষে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ঈসাবেলার কাছে যান।*

দশ বছর পরে ভাস্কো দা গামা ওই অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে পূর্ব উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ভারত মাহসাগর পাড়ি দেন এবং কালিকোটে পৌছেন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে দূর প্রাচ্যে পৌছার একটি সামুদ্রিক পথের অবশেষে খোঁজ মেলে। অভিযানে বহু সময় লাগলেও এ সমুদ্র যাত্রা পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্যে ছিল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। দূর প্রাচ্য থেকে জাহাজ বোঝাই করে মসলা আনা হয়েছিল এ অভিযানে এবং এর দাম সস্তাই পড়েছিল। এ দিকে

অন্যান্য নাবিকরা পশ্চিমে অভিযানের কথা চিন্তা করে সরাসরি চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে পৌছেন। এদের একজন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তিনি অভিযানের ব্যাপারে পর্তুগীজ আদালতকে রাজি করাতে চেয়েও ব্যর্থ হন। তারপরে চলে যান স্পেন এবং রানি ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ডের সাথে দেখা করেন। তাঁরা দু'জনেই নিকট প্রাচ্যে পৌছার রাস্তা খুঁজে বের করার প্রতিযোগিতায় সামিল হতে আগ্রহী ছিলেন। তারা কলম্বাসকে জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেন। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে কলম্বাস পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করেন। অক্টোবরের শুরুতে জমিন দেখতে পেয়ে তিনি নোঙর করেন এবং ক'জন সহকর্মীকে নিয়ে নেমে আসেন ডাঙায়। তীরে হাঁটু গেড়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানান ঈশ্বরের প্রতি। তিনি ভেবেছিলেন চীন কিংবা ইস্ট ইন্ডিজে পৌছে গেছেন। কিন্তু কলম্বাস মাত্র একটি দ্বীপের দেখা পেয়েছিলেন পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এটি বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ।

কয়েক বছরের মধ্যে আবিষ্কারের নেশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরীর সহায়তায় জন ও সেবাস্টিয়ান ক্যাবট ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিস্টল থেকে বেরিয়ে পড়েন চীনে পৌছুবার জন্যে উত্তর পশ্চিমে একটি প্যাসেজ খুঁজে বের করতে। তবে আবিষ্কার করে বসেন নিউ ফাউন্ডল্যান্ড। ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচি নোঙর করেন দক্ষিণ আমেরিকায় এবং গোটা মহাদেশের নাম করা হয় তাঁর নামে। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক পেড্রো কাবরাল আবিষ্কার করেন ব্রাজিল; ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে, আরেক্ পর্তুগীজ, ফার্ডিনান্ড ম্যাগেল্লান কেপ হর্ন হয়ে, সারা পৃথিবী ঘুরে ফিরে আসেন পর্তুগালে। তবে ফিলিপাইনে স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে মেরে ফেলেছিল।

এসব আবিষ্কার এবং তার পরের নানা আবিষ্কার পূর্ব পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির জন্যে শুধু গুরুত্বপূর্ণই ছিল না, এ ছিল মানুষের নতুন শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয়। আবিষ্কারগুলো নতুন একটি পৃথিবীকেই শুধু উন্মোচন করেনি, বিজ্ঞান ও চিন্তা ধারার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল মানুষের সামনে। কোথাও কোথাও পশ্চিম ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় পুবের মানুষের ওপরে। পশ্চিমা জাতি গোটা বিশ্বকে পদানত করে রেখেছিল তাদের নৌ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে। অটোমানরা ইউরোপ ও এশিয়ার বিরাট অংশের মালিক হলেও তারা বিরাট ধরনের পরাজয়ের শিকার হন ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে লেপান্টোর যুদ্ধে—আর এ লড়াই হয়েছিল সমুদ্রে।

# কুবলাই খান পরবর্তী চীন

কুবলাই খানের পরে, চীনের সম্রাট হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন ছেলে তিমুর খান। তিমুর ছিলেন আগ্রাসী মনোভাবের সামরিক মানুষ, ইনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের চেয়ে রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণা চীনা অভিবাসীদের ৯০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে সৃষ্ট বার্মা রাজ্যে তিনি হামলা চালান। বার্মায় এই অভিবাসীরা একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। রাজারা রাজ্য শাসন করতেন। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আনোয়ার্থা, তিনি একাদশ শতকের মাঝামাঝিতে শাসন করেছেন। আনোয়ার্থা পাগানে চমৎকার একটি নগরী নির্মাণ করেন আর তিমুর খান ওটাই লুঠ করার জন্যে এগিয়ে যান।



*চীনা সেনাপতি চু ইউয়েন চাং, মিং বংশের প্রতিষ্ঠাতা, ১৬৭৮ এ পিকিং দখল করে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।*

রাজধানী ধ্বংস হয়ে গেলে বার্মিজরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সৃষ্টি হয় কিছু সামন্ত জমিদারের যারা নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাটি করত। আঠের শতকের আগে বার্মা সুশৃঙ্খল রাজ্যে পরিণত হতে পারে নি।

চীনারা কখনোই চেঙ্গিস খান কিংবা তাঁর বংশধরদেরকে স্বাগত জানায়নি। যদিও পরবর্তীতে মোঙ্গল সম্রাটরা চীনে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন, তবু

দক্ষিণের মানুষ প্রকৃত চীনা শাসকদের প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় আকুল ছিল। এ অঞ্চলে কুবলাই খানের এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন চুই উয়েন-চ্যাং নামে এক চীনা সেনাপতি। তিনি ১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দে দখল করেন পিকিং। চীনে মোঙ্গল বংশের অবসান ঘটে এবং মিং নামে নতুন চীনা রাজবংশের সূচনা হয়। ইউয়েন চ্যাংকে তার সহযোগীরা চীনা সম্রাট বলে ঘোষণা দেয়। তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন হুং-উ, বহু পুরানো চীনা সম্রাটদের পারিবারিক নাম ছিল উ।

এই নতুন বংশটি বাইরের জগৎ থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ধারণা করা হয় পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নানা দেশের ঈর্ষারও পাত্র হয়ে উঠেছিল চীন। তার দিকে অনেকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। চীন বহু শতক ধরে তার সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও হামলা সয়ে। মিং সম্রাটরা চাননি এ সংস্কৃতির ক্ষয় হোক। হুংউ নিজে যতটা পেরেছেন মোঙ্গলদের অস্তিত্ব ও প্রভাব মুছে দিয়েছেন দেশ থেকে।

তৃতীয় মিং সম্রাট ইউং-লো (১৪০৩-২৪), পিকিংকে পুনর্গঠন করেন। তিনি চীনা ইতিহাসকে ধরে রাখেন বিশাল এক এনসাইক্লোপেডিয়ায়, নাম ইউং লো তা তিয়েন। এ বইটি এগার হাজার ভল্যুমের বাঁধাই করা হলুদ সিল্ক দিয়ে। প্রায় ৩৭০,০০০,০০০ অক্ষর গোটা বইতে (চীনা পিক্টোগ্রাফ) ছিল।

ইউং-লো বিচ্ছিন্ন মনোভাবের চীনা সম্রাটদের থেকে খানিকটা আলাদা ছিলেন। কারণ তিনি মঙ্গোলিয়া আক্রমণ করেন এবং শ্রীলংকা দক্ষিণ ভারত ও মালয়ের সমদ্র উপকূলে নৌ অভিযান চালাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে সরকার থেকে সমর্থন না পাবার কারণে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয় তাকে।

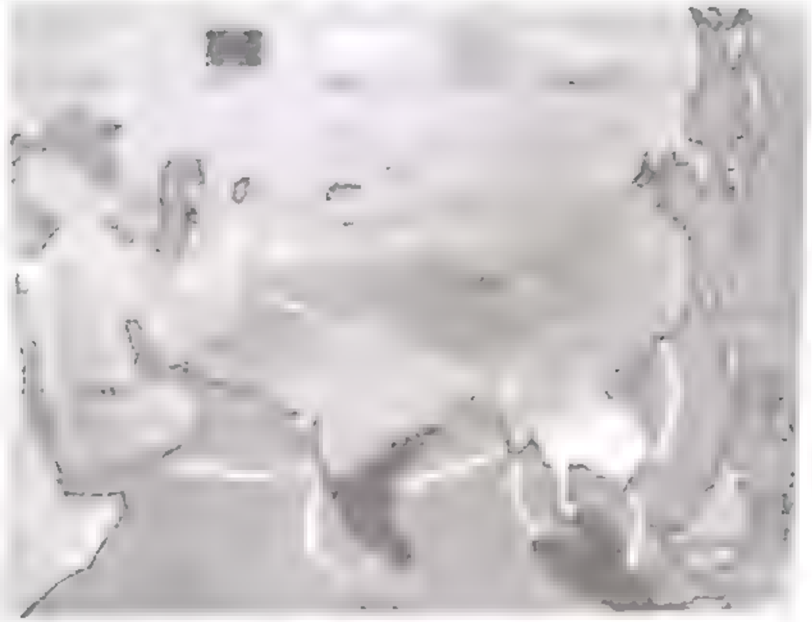
মিং ডাইনাস্টি বিভিন্ন কারণে ছিল উল্লেখ করার মত। কারণ সাংস্কৃতিক দিকে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল এ বংশ। তৈজসপত্র ও চীনা মাটির বাসনকোসনে চমৎকার সব ডিজাইন করা হতো। বর্তমান সময়ে বিশ্বের যে কোন স্থানে মিং ডাইনাস্টির কোন জিনিস পাওয়া গেলে তা বিক্রি করা হয় সর্বোচ্চ দামে।

চীনা প্রভুত্বের অধীনে অঞ্চলগুলো মিং ডাইনাস্টির সময় নানা যোগাযোগ করে। মিং সম্রাটরা সুংদের মত বেশির ভাগ শক্তি ব্যয় করেছেন নিজেদের সভ্যতার উৎকর্ষের জন্যে।

# দূর প্রাচ্য : ৯০০-১৩০০

চীনা সভ্যতা যখন ট্যাং ডাইনাস্টির সময় নতুন উন্নয়নের ধারা উপভোগ করছিল, ওই সময় প্রচুর চীনা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষিণ-পুব এশিয়া, কোরিয়া ও জাপানে গ্রহণ করা হয়। এই জাতিগুলো ক্রমে ভেঙে গিয়ে চীনাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিতে খানিকটা পরিবর্তন করে নিজেদের রুচির সাথে তাল মিলিয়ে।

৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইন্দো-চীন ভেঙ্গে যায়। তখন ক্ষমতায় ছিল খেমাররা। এরা গোটা পেনিনসূলা জুড়ে ভিন্ন একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তবে তাতে ভারতীয় চীনা সংস্কৃতির খানিকটা মিশেল ছিল। তারা চমৎকার সব মন্দির নির্মাণ করে এবং একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করে যা শতাব্দীকাল ধরে টিকে ছিল। প্রাকৃতিক অসংখ্য হ্রদ তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে শস্য ফলাতে সাহায্য করেছে, এতে ইন্দোচীনাদের সমৃদ্ধি ঘটেছে। সুরিয়াভারমান নামে এক রাজা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের বেশিরভাগ সময় রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি আংকরে চমৎকার একটি মন্দির নির্মাণ করেন।



*১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে দূর প্রাচ্যের মানচিত্র।*

চেঙ্গিস খান ইন্দোচীন পর্যন্ত অগ্রসর না হলেও যে ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়েছিলেন তার ধাক্কাতেই খেমের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। খেমেরদের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিয়াম।

জাপানীরাও চীনাদের মত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এবং চীনা সংস্কৃতিকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দেশটি শত শত বছর ধরে সামরিক অভিযানের জাঁতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়েছে। সামরিক নেতারা একের পর এক শাসন করে গেছেন জাপানী দ্বীপপুঞ্জ। এই নেতারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর, কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর দিতেন না।

কুবলাই খান জাপানে হামলা চালিয়েছেন। তবে দেশটি জয় করতে পারেননি। এদেশে বারবার হামলা করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি কুবলাই খানের উত্তরাধিকাররা। তাই জাপান ছেড়ে তারা চলে যায়। একা থাকতে পছন্দ করত জাপানীরা। তাই তারা যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিল বহুশত বছর তার কোন

পরিবর্তন হয়নি আর উনিশ শতকের আগে জাপানীরা পৃথিবীর বুকে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ সময়ে আরো যারা নিজেদের সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটাতে শুরু করে তাদের মধ্যে ছিল ইন্দোনেশিয়া। এরা সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এবং সেলেবেস দখল করেছিল। খ্রিস্টাব্দ শুরুর প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়ায় দক্ষিণ ভারতীয়রা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। তারা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মকে সঙ্গে নিয়ে আসে। দুই ধর্ম বিশ্বাসেই উজ্জীবিত হয় ইন্দোনেশীয়রা। পরবর্তীতে দ্বীপগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন পারস্য উপসাগর ও ভারতীয় উপকূল থেকে আসা মুসলিম আরবরা। তারা ইন্দোনেশিয়ায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

# ইংল্যান্ডের উন্নতি

১০৬৬ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংসে বিজয়ের পরে উইলিয়াম দ্যা কনকারার ইংল্যান্ডে হামলা চালান এবং দেশটি নিজের শাসনে নিয়ে আসেন। তারপর নিজস্ব পদ্ধতিতে সামন্ততন্ত্র শুরু করে দেশকে ভাগ করে ফেলেন। কিছু অংশ নিজের জন্যে রেখে কিছুটা চার্চকে দান করেন এবং বাকিটা তার সহযোগীদের হাতে তুলে দেন। নিজস্ব সম্পদ সহ সকলের সম্পদের নির্ধারণ করতে তিনি ডুমসডে সার্ভে ব্যবস্থা চালু করেন। এতে দেশের প্রতিটি রাজ্যের কি কি জিনিস আছে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়, জমিদারদের কটি গরু-ছাগলের পাল রয়েছে কিংবা একর প্রতি কত শস্য জন্মে তার হিসেব করা হতো।

১০৮৭ খ্রীস্টাব্দে, উইলিয়ামের মৃত্যুর পরে অ্যাংলো স্যাক্সন ইংল্যান্ডকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেন নরম্যান শাসকরা। উইলিয়ামের দুই ছেলে উইলিয়াম দ্বিতীয় (১০৮৭-১১০০) এবং হেনরী প্রথম, দু'জনেই ছিলেন কঠোর, যোগ্য ও পিতার কার্য ব্যবস্থা চালু করার জন্যে প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও। পণ্ডিত ও আইনজীবী হেনরী একজন স্যাক্সন রাজকুমারীকে বিয়ে করে অভিজাত পারিষদদের জন্যে উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

হেনরী প্রথমের মৃত্যু ছিল ভয়ংকর এক গৃহযুদ্ধ শুরু হবার ইঙ্গিত। তিনি সিংহাসনের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন মেয়ে মাটিলডাকে। কিন্তু ব্যারনরা তাকে গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তারা হেনরীর ভাতিজা স্টিফেনকে নির্বাচিত করেন। ফলে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলে এবং দেশটি দুঃখ দুর্দশার মাঝে পতিত হয়। অবশেষে, ১১৫৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলিংফোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী স্টিফেন তার জীবদ্দশায় সিংহাসন নিজের দখলে রাখার শর্তে রাজি হন এবং এরপরে ক্ষমতা মাটিলডার ছেলে হেনরী প্লানটাজেনেটের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানান।

হেনরী দ্বিতীয় (১১৫৪-৮৯) পৈতৃক সূত্রে প্রচুর জায়গাজমি পেয়েছিলেন। এলেনর অভ একুইটেনকে বিয়ে করে আরো বেশি ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। লাল দেড়ে, ধূসর চোখের এই মানুষটি প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন। সময়ের অপচয় যাতে না হয় এজন্যে নাকি ঘোড়ার পিঠে বসে খাবার খেয়ে নিতেন। চট্ করে রেগে যাবার অভ্যাস থাকলেও সর্বদা ন্যায় বিচারের পথে থাকতেন। তার রাজত্বকালকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যারনদের প্রাসাদ ভেঙে দিয়ে নিজের জন্যে প্রাসাদ নির্মাণ ও ব্যারনদের রোষ থেকে জনগণকে রক্ষা করার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা; সাম্রাজ্যকে পুনর্বিন্যাস দ্বারা শক্তিশালী করা এবং

নতুন ভূমি দখল– ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে এক ঝটিকা আক্রমণে তিনি আয়ারল্যান্ড জয় করেন; লিগাল সিস্টেমের সংস্কার এর জন্যে ছিল জুরী ও ভ্রাম্যমান বিচারকদের ট্রায়াল; এবং চার্চের সঙ্গে বিবাদ। এই বিবাদের কারণে ক্যান্টারবারির বিশপ টমাস বেকেট খুন হয়ে যান। ইনি একদা হেনরীর বন্ধু থাকলেও পরবর্তীতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন।

হেনরী মারা যান ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে। সিংহাসনে বসেন তার ছেলে রিচার্ড। ইনি তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের বিখ্যাত নেতা। সামরিক বিজয়ের জন্যে রিচার্ড প্রথম (১১৮৯-৯৯) ইংল্যান্ডের সম্পত্তির বেশিরভাগ ব্যয় করে ফেলেন ধর্মযুদ্ধে। তবে এ ধর্মযুদ্ধ সফল হয়নি তিনি জেরুজালেম দখলে ব্যর্থ হলে। ফিরতি পথে নিজেই ধরা পড়েন এবং বিশাল মুক্তিপণ চুকিয়ে ছাড়া পান।

রিচার্ডের পরে ক্ষমতায় বসেন তার ভাই জন (১১৯৯-১২১৬), তিনি দক্ষ ও জনপ্রিয় হলেও ভয়ানক আলসে স্বভাবের ছিলেন। ১২১৫ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন ব্যারন জনকে চাপ দেন ম্যাগনাকার্টা নামে একটি ডকুমেন্টে সই করার জন্যে। এ চার্টারে মানুষের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও আসলে এটা ব্যারনদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার একটি লাইসেন্স ছাড়া কিছু ছিল না।



*হেনরী দ্বিতীয় প্রথম প্লান্টাজেনেন্ট ও ইলেনের অব আকুইটেন। এদের বিয়ের মাধ্যমে ফ্রান্সের বিরাট এলাকা পেয়ে যায় ইংল্যাণ্ড।*

জন গৃহযুদ্ধে মারা যান এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র হেনরী তৃতীয় (১২১৬-৭২)।

হেনরীর লম্বা শাসনকাল নানা দুর্বিপাকের মাঝ দিয়ে চলেছে। হেনরীর পরে ক্ষমতায় আসেন তার ছেলে এডোয়ার্ড প্রথম (১২৭২-১৩০৭)। এই লম্বা, সুদর্শন মানুষটি তার দাদা হেনরী দ্বিতীয়র মত আইন প্রণেতা ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ আইলকে একত্রিত করে একটি রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলস আক্রমণে সফলতা লাভ করলেও স্কটদেরকে তিনি পরাজিত

করতে ব্যর্থ হন। যদিও এদের একজন নেতা উইলিয়াম ওয়ালেসকে বন্দী করে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। (উল্লেখ্য, এই উইলিয়াম ওয়ালেস-এর বীরত্বপূর্ণ জীবন কাহিনী নিয়ে হলিউডে 'ব্রেভ হার্ট' নামে সিনেমা বানিয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা মেল গিবসন।)

এডোয়ার্ড দ্বিতীয়র (১৩০৭-২৭) রাজত্বকালে ইংরেজরা স্কটদের কাছে পরাজিত হয় ১৩১৪ খ্রীস্টাব্দে, ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে, রবার্ট-ব্রুসের নেতৃত্বে। এডোয়ার্ড বার্কলি প্রাসাদে নিহত হন, সিংহাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ছেলে এডোয়ার্ড তৃতীয়র (১৩২৭-৭৭) কাঁধে।

দেশ শাসনের প্রথমার্ধে এডোয়ার্ড তৃতীয়র সাথে কিংবদন্তীর রাজা আর্থারের অনেকাংশে মিল ছিল– তিনি ছিলেন সুদর্শন, সাহসী, বিনয়ী, এবং অনুপ্রেরণা দাতা নেতা। ফ্রান্সের সিংহাসনে তার দাবি আছে (বংশগত দাবি), এ যুক্তিতে তিনি একটি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধ শত বছরের যুদ্ধ নামে পরিচিত। কারণ যুদ্ধ চলেছে ১৩৩৭ থেকে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে স্লুসে ফরাসী নৌবহর ও ১৩৪৬-এ ক্রোইসিতে ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করেন এডোয়ার্ড। তবে তার চমৎকার শাসন যুগের অবসান ঘটে ব্ল্যাক ডেথ বা কালো মৃত্যুর আবির্ভাবে। ১৩৪৯-৫০ খ্রীস্টাব্দে ভয়াবহ এ প্লেগ রোগে দেশের তিনভাগ ইংরেজ প্রাণ হারায়। বিপদ কেটে যাবার পরে গোটা সামাজিক কাঠামোকে আবার ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার ক্রীতদাস ও কৃষকের মৃত্যুতে শ্রমিকদের দারুণ অভাব দেখা দেয়। তবে এডোয়ার্ড অবশিষ্ট শ্রমিকদেরকে কাজ করতে বাধ্য করেন। প্লেগ পরবর্তী ইংল্যান্ডে দুর্দশার ছায়া পড়ে। রাজার বড় ছেলে ব্ল্যাক প্রিন্স যখন ফ্রান্সে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত ওই সময় ইংল্যান্ডের সরকার এডোয়ার্ডের রক্ষিতার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল। ১৩৭৭ খ্রীস্টাব্দে এডোয়ার্ডের মৃত্যু হলে কেউ তার জন্যে শোকও করেনি।

এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পরে তার বালক নাতি রিচার্ড দ্বিতীয় সিংহাসনে বসেন। ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'কৃষক বিদ্রোহ' নামে একটি আন্দোলন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক নেতারা সামন্ত প্রথা ও ক্রীতদাস প্রথার অবসান চাইছিলেন। বালক রিচার্ড নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করতে পারেন নি। যৌবনে তিনি তার উপদেষ্টামণ্ডলীকে বাদ দিয়ে স্বৈরশাসকের মত দেশ শাসন করতে থাকেন। শতাব্দীর শেষ ভাগে তার কাজিন ডিউক অব ল্যাংকেস্টার হেনরী প্ল্যান্টাজিনেট তাকে সিংহাসন থেকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে হেনরী চতুর্থ (১৩৯৯-১৪১৩) নামে নিজেই দেশ শাসন শুরু করেন।

হেনরী শিল্পকলার একজন সমঝদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যেও তার উৎসাহ ছিল প্রচুর, তবে লোলার্ড নামে নতুন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। লোলার্ডরা ছিলেন যাজক জন উইক্লিফের আনুসারী। উইক্লিফ ইংল্যান্ডের অলস আর ভোগী স্বভাবের বিশপ আর যাজকদের দুচক্ষে

দেখতে পারতেন না, তিনি নাজারেথের যীশুর মত সরল জীবন যাপন করার পক্ষপাতি ছিলেন।

হেনরীর ছেলে হেনরী পঞ্চম (১৪১৩-২২) তরুণ এডোয়ার্ড তৃতীয়র মতই সাহসী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দেয়ার দাবি নতুনভাবে পেশ করেন এবং ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে আগিন কোর্টে তার বাহিনীর চেয়ে পাঁচগুণ বড় ফরাসী সৈন্যদেরকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। 'ট্রিটি অব ট্রয়' অনুসারে তাকে ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তারপর তিনি চার্লসের মেয়েকে বিয়ে করলে তাদের ছেলে স্বাভাবিকভাবেই দুটি সিংহাসনের দাবীদার হয়ে ওঠে। ১৪২২ খ্রীস্টাব্দে জ্বরে ভুগে হেনরী মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার এতিম ছেলের বয়স মাত্র কয়েক মাস।



*হাউজ অব ইয়র্ক ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রিচার্ড দ্বিতীয় ১৪৮৫ তে বসওয়ার্থের যুদ্ধে নিহত হলে*

হেনরী ষষ্ঠ একজন ভাল ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। বই পড়তে ভালবাসতেন, ধর্মের প্রতি ছিলেন অনুগত প্রাণ এবং দালান কোঠা নির্মাণের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৪৪১ খ্রীস্টাব্দে ক্যামব্রিজে তিনি ইটন কলেজ ও কিংস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্যাথেড্রাল ও পাবলিক বিল্ডিংগুলোর প্রচুর উন্নয়ন ঘটান। তবে তিনি দুর্বল চিত্তের লোক ছিলেন বলে তার ওপর তার স্ত্রী মার্গারেট ও তার বিবেকবর্জিত বোফর্ট আত্মীয় গোষ্ঠী ছড়ি ঘোড়াতেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন।

হেনরী ষষ্ঠের চাচা ডিউক অব বেডফোর্ড ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তবে ১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দে তার মৃত্যুর পরে ইংরেজরা ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়। তারা শুধু ক্যালাইস আর গিসনেস নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল। দেশের ভেতরে দুশ্চরিত্র আত্মীয় স্বজন সরকারের এমন সর্বনাশ করে ছেড়েছিল যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভয়ানক গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধের নাম 'ওঅরস অব দ্যা রোজেস।' এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এডোয়ার্ড তৃতীয়র পরিবার পরিজনদের মাঝে, হাউস অব ইয়র্কের প্রতীক ছিল সাদা গোলাপ আর হাউজ অব ল্যাংকাস্টারের প্রতীক ছিল লাল গোলাপ।

১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে ইয়র্কিস্টরা টোটনে বিজয় মিছিল করে। তাদের জন্যে বিজয় ছিনিয়ে আনেন বিখ্যাত ইংরেজ সৈনিক কূটনীতিক রিচার্ড নেভিল, আর্ল অব ওয়ারউইক, রাজার এক কাজিন এবং দেশের সেরা ভূস্বামী। রিচার্ড নেভিল ছিলেন অকুতোভয় ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। কাজ ভালবাসতেন তিনি, বিশেষ করে সরকারি কাজ। তাই প্রিন্স এডোয়ার্ড অব ইয়র্কের যখন রাজা এডোয়ার্ড চতুর্থ নামে অভিষেক হয়, তিনি আনন্দে ওয়ারউইকের কাছে সমস্ত দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন।

কিছুদিন দেশে শাসন ভালভাবেই চলেছে, তবে হেনরী ষষ্ঠ ১৪৬৪ খ্রীস্টাব্দে এডোয়ার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ১৪৭১ খ্রীস্টাব্দে এডোয়ার্ড চতুর্থ ও ওয়ারউইক বার্নেটে যুদ্ধ করেন এবং বিখ্যাত নেতাটি নিহত হন। হেনরী টাওয়ারে ফিরে আসার প্রায় সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

এডোয়ার্ড পরবর্তী বার বছর নির্ঝঞ্ঝাটে শাসন চালিয়েছেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলাকে উৎসাহ প্রদান করেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় উইলিয়াম ক্যাক্সটন ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে ওয়েস্ট মিনিস্টারে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে রাজা মারা গেলে তার ছোট ছেলে এডোয়ার্ড পঞ্চম সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। সিংহাসনে বসেন তার চাচা, রিচার্ড অব গ্লুচেস্টার।

এই সাহসী, যোগ্য মানুষটি ওয়ারউইকের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং ওয়ারউইকের সাথে তার বেশ কিছু মিলও ছিল। তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালিয়েছেন। তিনি ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন এবং প্রথমবারের মত ইংল্যান্ডের আইন লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। তিনি কলেজ অব হেরাল্ডস প্রতিষ্ঠা করেছেন, সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তার পূর্ববর্তী শাসকদের চেয়ে অনেক ভাল রাজ্য চালিয়েছেন।

তবে ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা এডোয়ার্ড তৃতীয়য় প্রপৌত্র হেনরী টিউডরের হাতে বসওয়ার্থের যুদ্ধে নিহত হন। হেনরী টিউডর হেনরী সপ্তম নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময়ে ওঅরস অব দা রোজেস এর সমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে ইংল্যান্ডে মধ্যযুগেরও অবসান হয়, কারণ হেনরী তার বিচক্ষণতা ও দূর দৃষ্টির সাহায্যে যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তাকে আধুনিক ইংরেজ ইতিহাস বলা চলে।

# কেলটিক শক্তির অবনতি

১০৬৬ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম অব নরম্যান্ডি ইংল্যান্ড জয় করলে ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডে কেলটিক স্বাধীনতার অবসান ঘটে, যদিও স্কটল্যান্ডে এ ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটতে সময় লেগেছিল আরো অনেক দিন। উইলিয়াম ইংল্যান্ড দখল করার পরপরই তার কয়েকজন ব্যারনকে পাঠিয়ে দেন ওয়েলসে হামলা করার জন্যে। অল্প দিনের মধ্যে নরম্যানরা ওয়েলস রাজ্যের বিশাল একটি অঞ্চল দখল করে ফেলে এবং পেস্টো থেকে পেমব্রুক পর্যন্ত ওয়েলস মার্চেস নামে এক ভারি দুর্ভেদ্য পাথুরের দুর্গ গড়ে তোলে যেগুলোকে জয় করার সাধ্য ওয়েলসের কারো ছিল না।



*রক অব ক্যাসেল, একটি রোমান চার্চ, ১২ শতকের*

ওয়েলস

১১৩৫ খ্রীস্টাব্দে হেনরী প্রথমের মৃত্যুর পরে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে ওয়েলসরা (welsh) ওয়েন গুইনেডের (প্রিন্স গ্রুফিডের পুত্র) নেতৃত্বে কার্ডির্গান, কারমারথেন ও গ্ল্যামোরগান থেকে উৎখাত করে নরম্যানদেরকে। ১১৫২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ওয়েন প্রিন্স অব ওয়েলস হিসেবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তার সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচুর চর্চা করা হয়েছে। ওয়েন মারা যান ১১৭০ খ্রীস্টাব্দে, সিংহাসনে বসেন তার নাতি ললুইলিন ফর (ললুইলিন দ্য গ্রেট-১১৯৪-১২৪০)। ইনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা। ওয়েলস এর যা প্রয়োজন ছিল-একতা ও জাতীয় গৌরব তাই তিনি উপহার দেন। ললুইলিনের সময় ইংরেজদেরকে দেশেই ঢুকতে দেয়া হয়নি।

১২৪০ খ্রীস্টাব্দে ললুইলিনের মৃত্যুর পরে তার কনিষ্ঠ পুত্র ডেভিড ক্ষমতায় আসেন। এর সময়ে মার্চারের কিছু অংশ ইংরেজদের দখলে চলে যায়। ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে ডেভিডের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন তার ভাতিজা ললুইলিন।

এই লম্বা, সুদর্শন মানুষটি তার দাদার মত শাসন কর্ম পরিচালনায় ছিলেন বদ্ধ পরিকর। একটি দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার মত সাহস, সামরিক দক্ষতা, ধূর্ততা, ধৈর্য্য ইত্যাদি কোন কিছুরই তার অভাব ছিল না। ১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের এডোয়ার্ড প্রথম সপ্তম ধর্মযুদ্ধ থেকে দেশে ফিরে ললুইলিনের কাছে রাজ্যাভিষেক দাবি করলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে ইংরেজরা জিতে গেলে ললুইলিন শান্তি আলোচনায় বসতে রাজি হন।

কয়েক বছর পরে ললুইলিন শেষ চেষ্টা করেন ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে। কিন্তু পরাজিত হয়ে স্নোডোনিয়ার পাহাড়ে পালিয়ে যান। সেখান থেকে অগ্রসর হন দক্ষিণে এবং ব্রেকনদের সহায়তায় দল গড়ে তোলেন। কিন্তু ১২৮২ খ্রীস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় তাকে এক ইংরেজ সৈন্য হত্যা করে। এডোয়ার্ড ওয়েলসের ক্ষমতা দখল করেন, ইংল্যান্ডের সাথে দেশটিকে যুক্ত করে ইংরেজ আইন অনুসারে ওয়েলস শাসন করতে থাকেন।

একশো কুড়ি বছর ওয়েলসকে বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হয়েছিল। তারপর, পনের শতকের শুরুর দিকে, ললুইলিনের এক বংশধর, ওয়েন গ্লুইনডর বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। তিনি উত্তর ওয়েলস থেকে হেনরী চতুর্থর বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে ম্যাকিনলেথে সংসদ স্থাপন করেন। এরপরে ওয়েন ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে যান এবং ওয়েলস আবার ইংরেজদের পদানত হয়ে পড়ে।

### আয়ারল্যান্ড

ওয়েলসরাই একমাত্র কেলটিক জনগণ নয় যাদেরকে নরম্যানদের হামলার শিকার হতে হয়েছে। অন্ধকার যুগে, পশ্চিম ইউরোপের সবচে' সংস্কৃতি মনোভাবের আইরিশ জনগণকেও ইংরেজদের ঝাপটা সইতে হয়েছে।

১০১৪ খ্রিস্টাব্দে মহান ব্রায়ান বোরুর মৃত্যুর পরে আয়ারল্যান্ডে নানা বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়, রাজ্যগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব এবং অন্তত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। উইলিয়াম দ্য কনকারার যেবার ইংল্যান্ড দখল করেছেন, ওই সময় ব্রায়ানের নাতি টুরলুঘ ও ব্রায়েন (১০৬৪-৮৬) আয়ারল্যান্ডের চূড়ান্ত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, এ অবস্থান তিনি ধরে রেখেছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তারপর আবার অরাজকতা শুরু হয়ে যায়। ১১২১ খ্রীস্টাব্দে কানাটের রাজা টুরলুঘ ও' কনর তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে নিজেকে আয়ারল্যান্ডের রাজা হিসেবে ঘোষণা করে বসেন।

টুরলুঘ তেজস্বী শাসক ছিলেন। নিজের রাজত্বকালে প্রচুর সংস্কার সাধন করেছেন, তিনি দরবারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তারা আয়ারল্যান্ডের অতীতের নায়ক কুচুলেইন, রোরি এবং ব্রায়ান বোরুকে নিয়ে গান বাঁধতেন।

টুরলুঘের পরে ১১৫৬ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন তার ছেলে রডরিক, আয়ারল্যান্ডের রাজা হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্যে তাকে দশ বছর লড়াই করতে হয়েছে।

১১৭১ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের হেনরী দ্বিতীয় আয়ারল্যান্ডে হামলা চালিয়ে দ্রুত দক্ষিণপুব থেকে ডাবলিন পর্যন্ত দখল করে নেন। নিজেকে তিনি লর্ড অব আয়ারল্যান্ড হিসেবে ঘোষণা দেন যদিও রডরিক রাজা হিসেবে সিংহাসনে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন।

আয়ারল্যান্ড জয় করা এক কথা আর একে ধরে রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পরবর্তী সাতশ পঞ্চাশ বছরে আইরিশরা ইংরেজদের অতিষ্ঠ করে রেখেছিলেন। ১১৭১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস জুড়ে শুধু ইংল্যান্ডের সাথে যুদ্ধের কাহিনীই বিধৃত।

হেনরী চলে যাবার পরে ইংরেজ ব্যারনরা ওয়েলসে মার্চেসের মত ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারা উৎকৃষ্ট ও উর্বর ভূমি এবং সেরা শহরগুলো দখল করে নেন। তের শতকে এই উপনিবেশকারীদের কেউ কেউ গেইলিক পরিবারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ডাবলিনে নিজেদের সংসদ স্থাপন করেন নোবল্ পাদ্রী ও নাইটদেরকে নিয়ে। এই উপনিবেশকারীদেরকে বলা হতো অ্যাংলো আইরিশ।

অ্যাংলো আইরিশদেরকে গেইলিক আইরিশরা ঘৃণা করতেন তাদের নিষ্ঠুরতার জন্যে, তাদের কোন সংস্কৃতির বালাই ছিল না বলে উপহাস করতেন। আর অপছন্দ করতেন তারা সামন্তবাদী কাঠামোর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন বলে।

হেনরী সপ্তমের সময় ইংল্যান্ড নিজেদের অবস্থান সংহত করার সময় এবং ক্ষমতা পেয়েছিল। আইরিশরা সুসংগঠিত থাকলে ইংরেজদেরকে চিরতরে দূর করে দিতে পারত, কিন্তু ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে হেনরী সপ্তম স্যার এডোয়ার্ড পয়নিংকে আয়ারল্যান্ডে প্রেরণ করলে সে সুযোগ তারা হারিয়ে ফেলে। এবং বর্তমান শতকের আগে তারা আর সুযোগ পায়নি।

১৮০০ শতকে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন দ্বারা আইরিশ পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় ওয়েস্টমিনস্টারে ইংলিশ হাউজ অব লর্ডস অ্যান্ড কমন্সে আইরিশদেরকে আসন দেয়া হয়। আইরিশদেরকে সাহায্য করার জন্যে কাজটা করা হলেও বাস্তবে শুধু প্রোটেস্টান্ট ও অ্যাংলো আইরিশরা উপকৃত হয়েছেন। উনিশ শতকের পুরো সময়টাই ইংরেজরা আইরিশদেরকে চাপের মুখে রেখেছে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধে গেলে কিছু আইরিশ দেশপ্রেমিক ডাবলিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। হস্তাখানেক বিশাল এক শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেও শেষতক তারা পরাজয় বরণ করেন। এর ফলে শুধু বিদ্রোহীরা নন, অনেক নিরীহ মানুষকেও কোর্ট মার্শাল শেষে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে মহান দেশ প্রেমিক নেতা মাইকেল কলিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য আইরিশরা একত্রিত হয়ে ইংরেজ পুলিশ ও নিরাপত্তা দলকে এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেয় যে তারা আয়ারল্যান্ডকে আরো স্বাধীনতা দেয়ার চুক্তি করতে বাধ্য হয়। আয়ারল্যান্ড মুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শুধু আলস্টারের দু'টি প্রদেশ বাদে। এগুলোতে যুক্তরাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ব শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। পঁচিশ বছর পরে আয়ারল্যান্ড ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি রিপাবলিকে পরিণত হয় এবং এখনো তা-ই আছে।

১৬

### স্কটল্যান্ড

স্কচরা অবশ্য তুলনামূলক ভাল অবস্থায় ছিল। ম্যাকবেথ (১০৪০-৫৭) ছিলেন স্কটল্যান্ডের সেরা রাজাদের একজন। তিনি রাজপথে দস্যুতা দমন করেন, বিরুদ্ধপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেন, উৎসাহিত করে তোলেন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চার্চের পেছনে প্রচুর পয়সা ঢেলেছেন। রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছিল বলে তিনি ১০৫০ খ্রীস্টাব্দে রোমে তীর্থযাত্রা করতে পেরেছেন।



*স্যার উইলিয়াম ওয়ালেস, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্কটদের নেতা*

১০৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যান্ডে ইংরেজরা হামলা চালিয়ে বসে। নেতৃত্বে ছিলেন ডানকানের ছেলে ম্যালকম। লুমফানানে ম্যাকবেথ পরাজিত ও নিহত হন।

পরবর্তী রাজা ছিলেন ডেভিড প্রথম (১১২৪-৫৩)। তিনি দেশে নরম্যান ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা চালু করেন, আইন পুনর্গঠন করেন এবং কেলসো, মেলরোজ, জেডবার্গ ও ড্রাইবার্গে মঠ স্থাপন করেন। 'তিনি সবার সেরা' একথা তার সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা লিখে গেছেন।

ডেভিডের ছেলে উইলিয়াম দ্যা লায়ন, সাহসী এ নেতা ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড আক্রমণ করেন তবে ধরা পড়ার পরে তাকে পাঠানো হয় হেনরী দ্বিতীয়র কাছে। সেখানে বহুদিন কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি।

উইলিয়ামের ছেলে আলেকজান্ডার দ্বিতীয় পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের বিদ্রোহ সাফল্যের সাথে দমন করেছেন এবং তার ছেলে আলেকজাণ্ডার তৃতীয় (১২৪৯-৮৬) ১২৬৩ খ্রীস্টাব্দে লার্গাসের যুদ্ধে নরওয়েজিয়ানদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এরপরে তিনি নরওয়েজীয়ানদের ভূখণ্ড হেব্রিডস দখল করে স্কটল্যান্ডের সাথে তা যুক্ত করেন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান আলেকজান্ডার, তার উত্তরসুরি ছিলেন মার্গারেট। মাত্র তিন বছর বয়স। মার্গারেট কিছু দিনের মধ্যে মারা গেলে স্কটল্যান্ড জুড়ে লুটপাট শুরু করে দেন বিভিন্ন দাবিদাররা এবং সিংহাসনের দাবি করতে থাকেন তারা, স্কটিশ পারিষদরা এ পরিস্থিতির অবসানের জন্যে ইংল্যান্ডের এডোয়ার্ড প্রথমকে আমন্ত্রণ জানান একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্যে। এডোয়ার্ড রাজি হন এ শর্তে যে তাকে স্কটল্যান্ডে ওভার লর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। গৃহযুদ্ধ এড়াতে পারিষদবর্গ এ শর্তে রাজি হন এবং ডেভিড প্রথমের প্র-প্র-প্র-পৌত্র জন বালিওলকে রাজা হিসেবে মেনে নেন।

বালিওল বোকার মত ইংল্যান্ডে হামলা চালিয়ে বসেন এবং ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে ডানবারের যুদ্ধে পরাজিত হন। ক্রুদ্ধ এডোয়ার্ড নিজের জন্যে সিংহাসন দাবি করে স্কটল্যান্ড দখলের জন্যে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। ইংরেজ শাসনামলে উইলিয়াম ওয়ালেস নামে এক ওয়েলশ বংশোদ্ভূত নাইটের অধীনে স্কটরা আক্রমণ করে ইংরেজদেরকে। ওয়ালেস শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। তার বিচার হয়। এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সিংহাসনের আরেক দাবিদার ছিলেন ডেভিড প্রথমের পৌত্র রবার্ট ব্রুস। ব্রুস রবার্ট প্রথম নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩২৯ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে স্কটল্যান্ড শাসন করে গেছেন। তার ছেলে ডেভিড দ্বিতীয় (১৩২৯-৭১) ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে ডেভিলসক্রসের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে ধরা পড়েন এবং এগার বছর জেল খাটেন। তার পরে ক্ষমতায় আসেন যথাক্রমে রবার্ট দ্বিতীয় ও রবার্ট তৃতীয়। এরপরে রবার্টের উত্তরাধিকার জেমসকে ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ নাবিকরা বন্দী করে তার ফ্রান্স যাত্রার সময়। তখন জেমসের বয়স মাত্র এগার। আঠের বছর তাকে ইংল্যান্ডে রাখা হয়, তার জায়গায় চৌদ্দ বছর দেশ শাসন করেছেন ডিউক অব আলবানি। মহান ডিউকের মৃত্যুর পরে দেশ জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

১৪২৪ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের হেনরী ষষ্ঠ জেমসকে মুক্তি দেন। জেমস বাড়ি ফিরে আসেন সংবর্ধিত হয়ে। জনগণের সর্ব সম্মতি ক্রমে তিনি সরকারি দায়িত্ব হাতে তুলে নেন এবং আলবানির মৃত্যুর পরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ভার্সিটিকে বর্ধিত করেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষজনের সাথে শত্রুতা বাধানোর কারণে ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে পার্থে, স্যার রবার্ট গ্রাহামের হাতে নিহত হন।

জেমস দ্বিতীয় (১৪৩৭-৬০) মাত্র দু'বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন, তবে বাবার মতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে জেমস ইংরেজদের হাত থেকে রক্সবার্গের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেন। একদিন সকালে তিনি কামান দেখতে বেরিয়েছিলেন। কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল প্রাচীরে, হঠাৎ একটা গোলা এসে আঘাত করে জেমসকে। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান তিনি। তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসেন ছেলে তৃতীয় জেমস, তবে বাবার মত রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা তার একেবারেই ছিল না। কতগুলো অপদার্থ উপদেষ্টা ও সঙ্গী সাথী তাকে ঘিরে থাকে, ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর পরে তাই কেউ তার জন্যে শোক করেনি। জাতি জেমস চতুর্থ ভালভাবে শাসন করবেন এ আশায় ছিল।

জেমস চতুর্থ সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি স্কটল্যান্ডকে আধুনিক যুগে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এডিনবার্গকে স্কটল্যান্ডের রাজধানী বানিয়েছেন।

শিল্প-সংস্কৃতি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুর পৃষ্ঠপোষক জেমস ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্লোডেন ফিল্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হন গোটা স্কটল্যান্ডকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে। তার উত্তরাধিকারী ছিল আঠের মাস বয়সী পুত্র সন্তান জেমস পঞ্চম। কুড়ি বছর স্কটদের ক্ষতি করে দেশ শাসন করেছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্টুয়ার্ট পরিবার। জেমস সংখ্যাগুরুর সমর্থন নিয়ে সরকারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তিনি ভালভাবেই দেশ চালাচ্ছিলেন। তবে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে সলওয়ে মসের কাছে তিনি পরাজিত হন এবং কিছুদিন পরে মারা যান।

জেমসের উত্তরাধিকার ছিলেন কন্যা সন্তান মেরী, তার বয়স ছিল মাত্র এক হপ্তা। তার শাসনামল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল চরম বিপর্যয়ের। তার ফরাসী মা স্কটল্যান্ডকে ফরাসীদের অধীনে নিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তারা মওকা পেয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে মেরী ফ্রান্সের রাজার ছেলেকে বিয়ে করেন। এক বছর বাদে মেরীর স্বামী রাজা হলে তিনি ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের রানী বনে যান। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। আর ওই সময় প্রোটেস্টান্টরা স্কটল্যান্ডে বিদ্রোহ

করছিল। কিন্তু মেরী তার ধর্ম ত্যাগ করেন নি। ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি স্কটল্যাণ্ডে চলে আসেন দেশ শাসন করার জন্যে।

দেশে আসা মাত্র প্রোটেস্টান্টদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় মেরীকে। ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে তাকে স্কটল্যান্ড থেকে বের করে দেয়া হয় এবং মেরী ইংল্যান্ডের এলিজাবেথের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এলিজাবেথ মেরীকে আঠের বছর অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ সময় মেরী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে বহুবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছেন। এলিজাবেথ এক পর্যায়ে ধৈর্য্য হারিয়ে মেরীকে বিচারকদের হাতে তুলে দেন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় (১৫৮৭)।

১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে মেরীকে স্কটল্যান্ড থেকে বিতাড়িত করার সময় সিংহাসনের ভার দেয়া হয় তার শিশু পুত্র জেমস ষষ্ঠকে। মা'র মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জেমস ষষ্ঠ পারিষদ বর্গ নিয়ে দেশ চালিয়েছেন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের রাজা বনে যান।

পরবর্তী একশ চল্লিশ বছর স্কটিশ ইতিহাসের সাথে ইংরেজরা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গৃহযুদ্ধে কিছু স্কট পার্লামেন্টকে সমর্থন দিয়েছে, অন্যেরা রাজা চার্লস প্রথমের পক্ষ নিয়েছে। এবং চার্লস নিহত হবার পরে অলিভার ক্রমওয়েলের সাথে এক যুদ্ধে তারাও পরাজিত হয়। জেমস দ্বিতীয়কে (১৬৮৫-৮৮) যখন ইংল্যান্ড থেকে বহিষ্কার করা হয়, অনেক স্কটই নতুন রাজা উইলিয়াম তৃতীয়র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন অনুসারে একদল ইংরেজ ও স্কটিশ নোব্‌ল্ (পরিষদ) দেশের একাত্মতার ব্যাপারে রাজি হন। স্কটল্যান্ড তার আইন, তার চার্চ ও শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরে পেলেও হারিয়ে ফেলে স্বাধীনতা।

# অ্যাজটেক ও ইনকা

**অ্যাজটেক**

**অ্যাজটেকরা ছিল ভবঘুরে জাতি। যুদ্ধবাজ, কঠিন স্বভাবের এই মানুষগুলো উত্তর মেক্সিকোর বন ও মালভূমিতে ঘুরে বেড়াত। টলটেক ও মায়াদের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে থাকা এ প্রজাতিটি এদের সভ্যতায় অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উন্নতি সাধনও করে। যেমন অ্যাজটেকরা লোহা গলানোর কৌশল শিখে ফেলেছিল, সোনা-রূপার মত নরম ধাতু নিয়ে কাজ করতে পারত। তবে এ কাজে স্পেনিয়ার্ডদের মত অতটা দক্ষ তারা ছিল না। স্পেনিয়ার্ডরা পরে তাদের দেশ দখল করে।**



*মন্টেজুমা, অ্যাজটেকদের শাসক, হেরনান করটেজকে স্বাগত জানালেও করটেজ সম্রাটকে বন্দী করেন।*

**মধ্য মেক্সিকোর প্রকাণ্ড উপত্যকায় প্রবেশ করে অ্যাজটেকরা তাদের পূর্বসূরীদের অনেক কিছুই গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে পঞ্জিকা, বৃষ্টি ও সূর্যদেবতার পূজা এবং নরবলি। ধাতুর ব্যবহার জানলেও অ্যাজটেকরা পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাত আর বর্ম হতো মোটা সুতোর প্লেটের। তারা চমৎকার তৈজস পত্র বানাতে পারত, নির্মাণ করেছে বড় বড় দালান কোঠা।**

মধ্য আমেরিকার প্রতিটি সভ্যতার সঙ্গেই ধর্মীয় বিশ্বাস নিবিড়ভাবে জড়িত। তবে অ্যাজটেকেরা ছিল সবচে' বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে একটি মন্দিরের উদ্দেশে অ্যাজটেকেরা কুড়ি হাজার মানুষকে বলি দেয় দেবতাকে খুশি করার জন্য।

ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে অ্যাজটেকদেরকে শাসন করতেন মন্টেজুমা দ্বিতীয় নামে এক সম্রাট, তার রাজধানী ছিল টেনোচিটিট্লানে। এই বিশাল নগরীর ঘর বাড়ির সোনা বাধানো ছাদ সূর্যের আলোয় চকমক করত, শত মাইল দূর থেকে দেখা যেত। এসব বাড়িতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস করত। অত্যন্ত ধনী এ নগরী থেকে মন্টেজমা শক্তিশালী একটি সরকারের মাধ্যমে গোটা মেক্সিকো শাসন করতেন।

১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেজুমা খবর পান টাবাসকোতে একদল বিদেশী এসেছে, তারা অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে, চার ঠ্যাঙা দানবের (ঘোড়া) পিঠে চড়ে তারা এসেছে, হাতে ভয়াল দর্শন কিছু বস্তু যা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয় (মাস্কেট)। এরা এসেছিল সোনা-রূপার খোঁজে।তাদের নেতা হেরনান করটেজ, মধ্যবয়স্ক এক অ্যাডভেঞ্চারার, বাড়ি স্পেনে। এ লোক কিউবায় কিছুদিন ছিলেন। সেখানে ব্যবসায়ীদের মুখে অ্যাজটেকদের বিপুল ধন সম্পদের কথা জানতে পারেন।

করটেজ মেইন ল্যান্ডে অবস্থানকালে লক্ষ করেন স্থানীয়দের বেশিরভাগই অ্যাজটেক শাসনে বিক্ষুব্ধ। তিনি দ্রুত ঐ সুযোগ কাজে লাগান। স্থানীয়দের নিয়ে সোজা ঢুকে পড়েন রাজধানীতে।

মন্টেজুমা বিশ্বাস করতেন করটেজ আর কেউ নন স্বয়ং দেবতা কুয়েটজালকোটল যিনি দূর দেশ থেকে এসেছেন। তাই তিনি স্পেনিয়ার্ডটিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হন। করটেজকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। কিন্তু করটেজ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন। সম্রাটকে তিনি বন্দী করেন। তারপর অ্যাজটেক সিংহাসন ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে মন্দির, প্রাসাদ, ও দালানকোঠায় নির্বিচারে লুন্ঠন চালান। সোনা ও রূপার তৈরি সমস্ত কিছু গলিয়ে ফেলে তিন দিনের মধ্যে সংগ্রহ করেন দুই মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের মুল্যবান ধাতু।

কিছু অ্যাজটেক এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে মন্টেজুমা তাদেরকে সংহত করার চেষ্টা করেন। তখন এরা মন্টেজুমাকে হত্যা করে তার জায়গায় তার ভাতিজা কাহুটেমককে বসিয়ে দেয়। রাজধানী উদ্ধার করার জন্যে স্পেনিয়ার্ডদের সাথে অ্যাজটেকদের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছিল, শেষতক তারা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। অ্যাজটেক সভ্যতার দ্রুত মৃত্যু ঘটে এবং সেখানে জাঁকিয়ে বসে স্প্যানিশ সরকার। তবে স্প্যানিশ বিজয়ের কারণে অ্যাজটেকেরা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়নি, আজও মেক্সিকোর এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সরাসরি অ্যাজটেক

বংশোদ্ভূত। এবং এ নিয়ে তারা গর্বও করে। কাহুটেমক তাদের হিরো তবে করটেজকে নিয়ে কেউ ভাল কথা বলে না।

## ইনকা

ইনকারা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সভ্যতা। তাদের আগমন পেরুর দক্ষিণ অংশ থেকে, আন্দেজ পর্বতের দক্ষিণ ভাগ থেকে। পঞ্চদশ শতকে তারা বিভিন্ন দক্ষিণ আমেরিকান উপজাতিকে একত্রিত করে গড়ে তোলে একটি সাম্রাজ্য। ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে ইকুয়েডর থেকে দক্ষিণ চিলি এবং বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনার কিয়দংশ নিয়ে। ইনকারা অত্যন্ত দক্ষ কারিগর ছিল। তারা চমৎকার সব রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে, কিছু রাস্তা ছিল খুবই লম্বা, তিন হাজার মাইল দীর্ঘ। তারা পাহাড়ের মধ্যে গুহা কেটে সেখানে পাইপ লাগিয়ে সেচের জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। তারা আন্দেজের উপত্যকায় বড় বড় সেতু নির্মাণ করেছে গ্রানিট পাথরের প্রকাণ্ড চাঁই দিয়ে। এসব চাঁইয়ের ওজন কয়েক টন করে হলেও তা তারা ঠিকঠাক মত বসিয়েছে। ফলে শতশত বছর তাদের তৈরী প্রাচীর ও পিলার টিকে থেকেছে, ভয়ানক ভূমিকম্পেও কিছু হয়নি।

ইনকারা সুন্দর সুন্দর মনুমেন্ট, মন্দির ও প্রাসাদও নির্মাণ করেছে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি তৈরির ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট যত্নবান ছিল। দুটি প্রধান ইনকা শহর ছিল কুজকো ও মাচুপিচ্চু। রাজধানী কুজকোর অবস্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১১০০০ ফুট ওপরে, আন্দেজের ঠিক হৃৎপিণ্ডে। আর মাচুপিচ্চু ৮৮০০ ফুট ওপরে, পাহাড়ে। কুজকো শহর ঘেরা ছিল ১৫০০ ফুট লম্বা, ঘন দেয়াল দিয়ে। এর রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয় ঝাঁঝরির আদলে।

ইনকা সাম্রাজ্য স্থানীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হতো। পঞ্চাশ লাখ মানুষ অধ্যুষিত এ সাম্রাজ্যকে দশ হাজার নাগরিকের একেকটি সেকশনে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সেকশনের নেতৃত্ব দিতেন একজন নোব্‌ল্‌ বা অভিজাত। দূতের মারফত স্থানীয় প্রশাসকদের মাঝে যোগাযোগ ছিল। প্রতিটি সেকশনের নেতা দায়বদ্ধ থাকতেন ইনকা বা শাসকের কাছে। রাজ্যে শ্রেণী কাঠামো গড়ে উঠেছিল অভিজাত, ব্যবসায়ী, কারিগর ও রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে। সরকার বস্ত্র, তৈজস ও গহনা তৈরির জন্যে কারখানা নির্মাণ করেন। প্রয়োজনে খাদ্য মজুত রাখার জন্যে প্রচুর গুদাম বানানো হয়। সাধারণত মানুষজন মিতব্যয়ী জীবন যাপন করত। তারা স্বল্প স্বাধীনতা ভোগ করত। নিজেদের কোন সহায় সম্পত্তি ছিল না। লিখন কৌশল ইনকাদের কাছে অজানা ছিল বলে তারা কুইপু নামে রঙিন সুতোয় গুটলি দিয়ে সরকারি কার্যক্রমের রেকর্ড রাখত।

ইনকা এবং তার পারিষদবর্গ অত্যন্ত দামী পোষাক পরতেন, তাতে সোনা-রূপার গহনার কারুকাজ থাকত। আর সাধারণ লোকেরা পরত সাধারণ পোষাক। পোশাক দেখে বোঝা যেত কে কোন্ পদে আসীন। সবচে' উঁচু পদধারী পরিষদ কানে উজ্জ্বল রিং পরতেন।

ইনকারা তাদের পূর্বসুরীদের কাছ থেকে ধাতু বিশেষ করে সোনার ব্যবহার শিখেছিল। তারা হাতুড়ি বানাতে জানাত, পারত রং ঝালাই করতে। তাদের প্রচুর পরিমাণে সোনার ব্যবহারের কথা শুনেই স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখে।

মেক্সিকোর মত পেরুতেও একইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল স্পেনিয়ার্ডরা। ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে ইনকা সম্রাট আতাহুয়ানপা খবর পান স্পেনিয়ার্ডদের একটি ছোট দল নিয়ে তার দেশে হাজির হয়েছে ফ্রান্সিসকো পিজারো নামে এক লোক। সম্রাট তাদেরকে স্বাগত জানালেও তারা সম্রাটকে দ্রুত বন্দী করে ফেলে।

সম্রাট বন্দী হবার প্রায় সাথে সাথে ইনকা সরকার ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। আতাহুয়ানপা পিজারোকে এক ঘর ভর্তি সোনা ও রূপা দিতে চেয়েছিলেন নিজের মুক্তির বিনিময়ে। পিজারোও প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু সোনা পাবার পরে সে সম্রাটকে হত্যা করে। তারপর কুজকোতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেয় শহর। ইনকা পারিষদরা খুন হয়ে যান এবং পতন ঘটে ইনকা সাম্রাজ্যের।

### আমেরিকার অন্যান্য মানুষ

অ্যাজটেক ইনকারা ধ্বংস হয়ে যাবার পরে শুধু কিছু আদিবাসী বেঁচে ছিল আমেরিকায়। এরা অনগ্রসর মানুষ, শত শত বছর আগে বেরিং প্রণালী থেকে আসা লোকদের বংশধর। এরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভিক্ত থাকলেও এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও এদের সাধারণ পরিচয় ইন্ডিয়ান বলে।

বিশাল সমভূমি যা বর্তমানে আমেরিকা ও কানাডা নামে পরিচিত সেখানে এই ইন্ডিয়ানদের বাস ছিল। এরা ভুট্টার চাষ করত এবং উপজাতিদের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। তারা কিছু পাথরের দালানকোঠাও নির্মাণ করেছিল। এর মধ্যে ৩৫ ফুট উঁচু একটি দালান সম্প্রতি মিসিসিপি নদীর তীরে আবিষ্কার হয়েছে। এই ইন্ডিয়ানরা মেক্সিকোতে অনুপ্রবেশকারী স্প্যানিশদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিল। তারা স্পেনিয়ার্ডদের ঘোড়া চুরি করে ঘোড়ায় চড়তে শেখে এবং স্পেনিয়ার্ডদের চেয়েও দক্ষ অশ্বারোহী হয়ে ওঠে। এসব ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ছিল চেইয়েন, পনি, সিওক্স ও কোমাঞ্চি।

ইউরোপীয়রা উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন শুরু করলে তাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের সংঘর্ষ বেধে যায়। জমি লোভী ইউরোপীয়রা মাস্কেট বন্দুক এবং

রিভলভারের সাহায্যে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করতে আসা ইন্ডিয়ানদেরকে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে দেয়, তাদের গোষ্ঠী ভেঙে দিয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের স্থিতিস্থাপকতা ছিল সুদৃঢ়। তারা রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরি করে এনে তা চালানো শিখে যায়।

এই ইন্ডিয়ান উপজাতিদের অনেকেই ছিল অগ্রসর। যেমন চেরোকিরা মিসিসিপির দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের অনেকটাই নিজেদের দখলে রেখেছিল। কিন্তু ইউরোপীয়রা তাদের কাছ থেকে ওই অঞ্চল কেড়ে নেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে চেরোকিদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তারা আবার আমেরিকায় একত্রিত হয়েছে। ইন্ডিয়ানরা, কানাডা, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার সংখ্যালঘু হিসেবে এখনো বেঁচে বর্তে আছে। এসব দেশের উন্নয়নে ইন্ডিয়ানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

# অটোমান সাম্রাজ্যের বিশালতা ও অবসান

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পরে অটোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বর্তমান রুমানিয়া থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত। এ সাম্রাজ্যের শাসকরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন, ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সুলতান প্রথম সেলিম সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটানোর জন্যে প্রস্তুতি নেন। সংক্ষিপ্ত অভিযানে তার দখলে চলে আসে সিরিয়া ও মিশর। তার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন সকল সুলতানদের সেরা, সুলায়মান প্রথম (১৫২০-৬৬)।

সুলায়মান অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারেই পছন্দ করতেন না। যদিও তার সামরিক ক্যারিয়ার ছিল বেশ সফল। তিনি সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন এবং দানিউব পার হয়ে জয় করেন হাঙ্গেরী, ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে দখল করে নেন বেলগ্রেড এবং ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে মোহকজেতে অ্যাস্ট্রো-হাঙ্গেরী দলকে ধ্বংস করে দেন। দু বছর পরে বুদাপেস্টের পতন ঘটে, ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনা অবরোধ করেন তিনি। উত্তর আফ্রিকায় তিউনিশ দখল করে স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান উপকূলের শহর জয় করেন। একবার রোমের জন্যেও হুমকি হয়ে উঠেছিলেন। শীঘ্রই তার নৌ বহর গোটা ভূমধ্যসাগর শাসন করতে থাকে।



*কামাল আতাতুর্ক, আধুনিক তুর্কের প্রতিষ্ঠাতা*

পশ্চিম ইউরোপ এই মহান শাসককে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সুলায়মান ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে পারস্য জয় করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার সাম্রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায় জিব্রাল্টার থেকে টাইগ্রিস পর্যন্ত।

সুলায়মানের পরে ক্ষমতায় আসেন সেলিম দ্বিতীয় (১৬৬৬-৭৪)। ইনি সারাক্ষণ মদের নেশায় ডুবে থাকতেন। তিনি শাসনকার্যের ভার তুলে দিয়েছিলেন প্রধান উজির মহম্মদ সকোলির হাতে। ইনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বিচক্ষণ এক ব্যক্তি। সুলায়মানের রাজত্বের শেষ দশ বছরে নিজের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন সকোলি। এই বিখ্যাত মানুষটি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে একে একে হামলা চালান ভেনিস, স্পেন ও সাইপ্রাসে। ইউরোপীয়রা তার আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে বাধ্য হয় অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লীগ বা দল গড়ে তুলতে। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসে, করিন্থের কাছে লেপান্টোতে লীগের নৌবহর অস্ট্রিয়ার ডন জনের (ইনি স্পেনের ফিলিপ দ্বিতীয়র অবৈধ সৎ ভাই) নেতৃত্বে অটোমানদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। অবশ্য পরবর্তীতে শান্তিচুক্তি অনুযায়ী অটোমানরা সাইপ্রাস সহ আরো অনেক কিছু পেলেও সমুদ্র-শক্তি হিসেবে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

ষোড়শ শতকের শেষ দিকেও অটোমানরা শৌর্যবীর্যে বলীয়ান ছিল, তাদেরকে ধ্বংস করার মত ক্ষমতা ইউরোপের কারো ছিল না। কিন্তু পরবর্তী শতকের শুরুতে অটোমান সাম্রাজ্যে বীর নেতৃত্বের অভাব দেখা দিতে থাকে, সুলতানরা বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেন, প্রাদেশিক অভিজাতরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করে যে যার এলাকা নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসন শুরু করেন।

১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে একজন প্রধান উজির, মহম্মদ কপরুলু ক্ষমতা দখল করে সুলতানদের নতুন বংশের পত্তন করেন। তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা সীমিত করে ফেলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তার ছেলে আহমেদ (১৬৬১-৭৬) পিতার মত যোগ্য ও কর্মকুশলী ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, জমি অধিকরণের পদ্ধতি পুনর্গঠিত করেন এবং বেশ কিছু সামরিক অভিযানও চালিয়েছেন। তার একটি সাফল্য হলো ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে ক্রিট দখল।

সতের শতকের শেষদিকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়ে যায়। সুলতানের দরবারে বিদ্রোহ ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, উজিররা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলছিলেন। সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছিল অশনি সংকেত, দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার নানা চেষ্টা করেও তা ব্যর্থ হয়। প্রদেশগুলো একসাথে তুর্কীদেরকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে এবং বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তুর্কীরা ওদিকে কৃষ্ণ সাগর, পূর্ব ভূমধ্যসাগর এমনকি বলকান দেশের কর্তৃত্ব নিয়েও রাশানদের সঙ্গে একটানা লড়াই করে

যাচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) অটোমান সাম্রাজ্য মধ্য ইউরোপীয় শক্তি জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় এবং জার্মানীদের সাহায্যে দার্দেনেলেসে ব্রিটিশ হামলা ঠেকিয়ে দেয়। তবে নিকট প্রাচ্যে আরবরা ব্রিটিশদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অটোমানদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং যুদ্ধের শেষ বছরে ভেঙে পড়ে সাম্রাজ্য।

বিজয়ী মিত্রশক্তি যুদ্ধের পরে তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে চাইলেও বাধার মুখে তা পারেনি। তুর্কী সেনাপতি মুস্তফা কামালের, যিনি সাহসের সাথে দার্দেনেলেসে লড়াই করেছেন, নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। তিনি একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আংকারায় প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর আধুনিক তুরস্ক গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সালতানাতের অবলুপ্তি ঘটানো হয় এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। কামাল আতাতুর্ক নাম নিয়ে সর্বাধিনায়ক হিসেবে ১৯৩৮ সালে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশ শাসন করে গেছেন। তিনি রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করেন, পশ্চিমা পোশাক, পরিচ্ছদ, ফ্যাশন, আচরণ ইত্যাদির সাথে দেশের মানুষকে পরিচিত করে তোলেন, পরিবহন খাতে আনেন। বিপ্লব তিনি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, ইসলামিকের বদলে টার্কিশ বা তুর্কী হিসেবে পরিচয় দিতে তুরস্কের মানুষ গর্ববোধ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তুরস্ক নিরপেক্ষ থেকেছে, তবে যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের সাথে ব্রিটেন ও পশ্চিমের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। এ বন্ধুত্বের কারণ রাশিয়াকে ভয় পেত তুরস্ক।

### মিশর

অটোমান সাম্রাজ্য এগিয়ে চলছিল তার নিয়তির দিকে। মিশর আলাদা হয়ে যায় এবং একের পর এক স্বৈরশাসক দেশটিকে শাসন করতে থাকে। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশরে হামলা চালান। তিনি ভারতে ব্রিটিশদের ল্যান্ডরুট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে মিশর চলে যায় তুরস্কের দখলে। তিন বছর বাদে সুলতান মহম্মদ আলিকে (১৮০৫-৪৯) সরকার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। এই মানুষটি মিশরীয়দের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, নৌ বাহিনী গঠন ও সেনাবাহিনীর উন্নতি সাধন করেছেন। অর্থনীতির সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হয়। তারপর তিনি সুদানে হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন খার্তুম নগরী।

পরবর্তী সরকার প্রধান ছিলেন মহম্মদ সাইদ (১৮৫৪-৬৩)। ইনি সুয়েজ খাল খননে ফরাসী সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে তাকে সিংহাসনচ্যুত করা হলে

6 দেশটির কপালে দুঃখ দুর্দশা নেমে আসে দুর্বল উত্তরাধিকারের কারণে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনারা মিশরে ঢুকে পড়ে। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লর্ড ক্রোমার দেশটি শাসন করেছেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে মিশরকে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশরা সুয়েজ খাল ছাড়া একে একে মিশরের অন্যান্য সকল অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল গামাল নাসের ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ব্রিটিশদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং সুয়েজখালকে জাতীয়করণ করেন। নাসের ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে মারা যান, ক্ষমতায় আসেন আনোয়ার সাদাত। ইনি ইসরায়েল আরব দ্বন্দ্ব মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন হোসনি মুবারক।

62



*সুয়েজ খাল কাটা হয় এই ফরাসী ভদ্রলোকের পর্যবেক্ষণে। এর নাম ফার্দিনান্ড ডি লেসেপস।*

### মরক্কো

মরক্কো অটোমান সাম্রাজ্য থেকে সরে গিয়ে মধ্যযুগীয় অবস্থায় প্রবেশ করে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স দেশটি দখলের পাঁয়তারা করেছিল, তবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে স্পেনের সঙ্গে। ১৯৫৬ তে দুটি দেশই মরক্কোর ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং গঠিত হয় নতুন একটি জাতি।

### তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়া উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অটোমানদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যায় এবং ১৮৮১ নাগাদ তিউনিসিয়া ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৫৬ তে তিউনিসিয়াকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেয়া হয়।

### সুদান

ক্রীতদাস সরবরাহের রাজ্য হিসেবে সুদান জয়ে আকৃষ্ট করেছিল মোহাম্মদ আলীকে। মাহদি নামে এক ধর্মোন্মাদ নেতার অধীনে সুদানীরা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ব্রিটিশরা জেনারেল চার্লস 'চাইনিজ' গর্ডনকে পাঠিয়েছিল বিদ্রোহ দমন করতে। তিনি ১৮৮৫ তে খার্তুমে নিহত হন। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অ্যাংলো-মিশরীয় বাহিনী নিয়ে লর্ড কিচেনার খার্তুমে অগ্রসর হন এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে দমন করেন বিদ্রোহ। সুদান পরিণত হয় অ্যাংলো– মিশরীয় যুগ্মশাসিত রাজ্যে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সে স্বায়ত্তশাসন পায়। বর্তমানে এটি একটি প্রজাতন্ত্র।

### সিরিয়া

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সিরিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে থেকেছে। ১৯২০-এ, দু'বছর লড়াইয়ের পরে দেশটি ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়, তবে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

### ইরাক

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে অবস্থিত ইরাক ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী প্রদেশ ছিল। তারপরে পরিণত হয় ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমির ফয়সালকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন হয় ইরাক তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা দেশটি দখল করে তাকে জার্মান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। যুদ্ধ শেষে আবার স্বাধীনতা লাভ করে ইরাক তৎকালীন বাদশা দ্বিতীয় ফয়সালের অধীনে। ইনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। ফয়সাল ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন এবং দেশটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

# পারস্যের জীবন-ধারণ

পারস্য একসময় ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিশাল এক সাম্রাজ্য। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে এ সাম্রাজ্য ডুবে যায় অরাজকতার মাঝে। স্থানীয় জমিদাররা প্রজাদেরকে স্বৈরশাসকের মত শাসন করতে থাকেন এবং দেশের একাত্মতার জন্যে তারা কিছুই করেননি। পারস্য বারবার আরব, সেলজুক, চেঙ্গিস খান, মোগল ও তৈমুর লংদের হামলার শিকার হয়েছে। ষোড়শ শতকে আরো মঙ্গল এদেশে ঢুকে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠা করে নতুন শাসক গোষ্ঠী, সাফাবিদ।

প্রথম সাফাবিদ রাজা ছিলেন ইসমাইল (১৫০০-২৪), নিজেকে তিনি শাহ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধে রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে একটি রাজ্যে পরিণত করেন। মোহম্মদ এর বংশধর ইসমাইল অত্যন্ত কর্কশভাবে দেশ শাসন করেছেন। তিনি মুসলিম ছাড়া অন্য সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।



*লোহিত সাগরের তীরের জেদ্দার একটি তেল শোধনাগার*

১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে অটোমান সাম্রাজ্যের সেলিম প্রথম পারস্য আক্রমণ করেন এবং বিশাল এলাকা দখল করেন। ইসমাইলের ছেলে তাহমাশপকে সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট বাগদাদ থেকে ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দে তাড়িয়ে দেন। পারস্যকে পরিণত করা হয় ক্ষুদ্র রাজ্যে। তবু পারস্যের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ঘটছিল এবং ফারসী শিক্ষা, কলা ও সাহিত্যের জাগরণ হচ্ছিল।

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে, ইসমাইল প্রথমের এক বংশধর আব্বাস প্রথম ক্ষমতা দখল করে নিজেকে শাহ হিসেবে ঘোষণা দেন। এই প্রতিভাবান, কঠিন শাসকটি অটোমান বাহিনীকে বিতাড়িত করে নতুন পারস্য রাজ্য স্থাপন করেন। এ রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে তিনি সেনা বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন এবং ট্রেনিং দেয়ার জন্যে

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদেরকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেনাবাহিনীকে কামানও সরবরাহ করেছিলেন।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আব্বাসের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন শৌখিন, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী স্বভাবের। তারা দেশের কল্যাণের জন্যে কিছুই করেননি। ফলে দেশটি তুর্কী, রাশান, আফগান ও মঙ্গোলদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে আফগানরা নিজেদের পছন্দে শাহ মাহমুদকে সিংহাসনে বসায়। তাকে বিতাড়িত করে সিংহাসনে বসেন মধ্য এশিয়ার এক সর্দার নাদির শাহ। ইনি ভারতেও হামলা চালিয়েছেন। নাদির শাহর নানা ভাল ভাল পরিকল্পনা ছিল সরকারের জন্যে। কিন্তু কোনটাই কাজে লাগাবার সুযোগ পাননি। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে তার মৃত্যুর পরে পারস্যের আবার অবনতি হতে শুরু করে এবং দেশটি সম্পূর্ণভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এর পরে পারস্য আর তেমন উন্নতি করতে পারেনি।.

উনিশ শতকে দেশটিতে ব্রিটেন ও রাশিয়া খনিজ সম্পদ, তেল ও বস্ত্রের জন্য লুটপাট চালায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পারস্য আবার স্বাধীনতার স্বাদ পায় এবং এক সেনা প্রধান, রেজা খান, দেশটির আধুনিকায়ন করেন। তিনি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে এ দেশের শাহ হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। তিনি রাস্তাঘাট, রেল, শহর ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন পশ্চিমাদের সাহায্যে। তিনি নতুন একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন ও সরকারকে পুনর্গঠিত করেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তার ছেলে মহম্মদ পেহলভি ক্ষমতায় আসেন এবং পারস্য শাসন করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে দেশটির নামকরণ করা হয় ইরান। পেহলভি ইরানকে আধুনিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি সামাজিক পুনর্গঠন করলেও তার গোপন পুলিশী ব্যবস্থার দরুন দারুণভাবে সমালোচিত হন। একটি ইসলামী বিপ্লবের মুখে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী।

# স্পেন ও পর্তুগাল

আটত্রিশ অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি দক্ষিণে স্পেনের গ্রানাডা দেড় শতক নিজেদের অধীনে রেখেছিল। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাস্টিলের আলফানগো একাদশের হাতে সালাদোতে পরাজিত হয় তারা। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে আরগনের ফার্দিনান্দ মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করেন।

ফার্দিনান্দ ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাষ্টিলের ইসাবেলাকে বিয়ে করে গ্রানাডা ছাড়া বাকি স্পেনকে একত্রিত করেছেন। ষোড়শ শতকের সময়টা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় স্পেন চমৎকার একটি রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। রোমান ক্যাথোলিসিজমের অধীনে এ দেশের লোকেরা একত্রিত হয়, এর সৈন্যরা ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে স্পেনের বিপুল ধনরত্নের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেক দেশই বারবার স্পেনীয় বাণিজ্য জাহাজগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে। তবু স্পেন বেশির ভাগ সময় ইউরোপের নেতা দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে থেকেছে। চার্লস পঞ্চমের রাজত্বকাল (১৫০০-১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিল সবচেয়ে সফল সময়।

চার্লসের ছেলে ফিলিপ দ্বিতীয়র সময় তার সৎভাই, অস্ট্রিয়ার ডন জনের নৌ বহর ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে লেপান্টোতে অটোমান নৌবহর ধ্বংস করে ফেলে। মূলত তখন থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান হতে থাকে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপ পর্তুগালকে নিজের রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এভাবে একে একে দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, দূর প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। ইতিহাসের অন্যতম সেরা লেখক, অমর কাহিনী ডন কুইক্সোট-এর রচয়িতা মিগুয়েল সার্ভান্তেস লেপান্টোতে লড়াই করেছিলেন। ফিলিপসের সময়ে নানা যুদ্ধ জয় হলেও এ সময় থেকেই স্প্যানিশ শক্তি খর্ব হতে থাকে। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার ছিল কারণ ইউরোপীয় ইতিহাসে স্পেনের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

ফিলিপ একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। পরিশ্রমী, অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল এবং কঠোর কর্তব্যপরায়ণ এই মানুষটি তার সাম্রাজ্য চালাবার চেষ্টা করেছেন প্রতিনিধিদেরকে দিয়ে। তবে তার সবচেয়ে কঠিন সময় গেছে নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে। এটা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সতেরটি আলাদা রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান ছিল। এদের কেউ কেউ প্রোটেস্টান্ট রাজ্য হিসেবে থাকতে চাইলে ফিলিপ তার বিরোধিতা করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ডিউক অব আলভাকে পাঠিয়ে দেন ভাইসরয় হিসেবে, বিশাল এক সেনাবাহিনীসহ। গোটা এলাকা শাসন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল আলভাকে। কিন্তু কর আরোপ করতে গিয়ে তিনি জনগণের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

উত্তরের প্রোটেস্টান্ট অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর শাসনকর্তা ছিলেন অরেঞ্জের প্রিন্স উইলিয়াম। ইনি নেদারল্যাণ্ডস থেকে স্পেনের কর্তৃত্ব তুলে দেয়ার জন্যে সারাটা জীবন উৎসর্গ করেন। ফিলিপ উইলিয়ামের মাথা কেটে আনার জন্যে উচ্চমূল্য ধার্য করেছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন উইলিয়াম। তখন উত্তরের রাজ্যগুলো, যাদেরকে বলা হতো ডাচ, ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তবে স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সাময়িক স্বস্তি অনুভব করে। উইলিয়ামের ছেলে, মরিস অব অরেঞ্জ ছিলেন বাপ কা বেটা। তিনি ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে টার্নহুটে সম্মুখ সমরে একটি বিরাট স্প্যানিশ বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপরে ডাচরা নিজেদেরকে জাতি হিসেবে গড়ে তোলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে, বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিজে।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে , ফিলিপ দ্বিতীয় মারা যান। ওই সময় নিজের রাজ্যের অনেকখানিই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের পেছনে তার প্রচুর অর্থ খরচ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও ইউরোপের সবচেয়ে ধনবান ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন তিনি। সতের শতকের দিকে অবশ্য স্পেনকে ষোড়শ শতকের মত অত ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ স্বাধীন হয়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাজকন্যা, ব্রাগাঞ্জার ক্যাথেরিনের সাথে ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস দ্বিতীয়র বিয়ে হলে দুদেশের সাথে চমৎকার মৈত্রী গড়ে ওঠে।



*মিগুয়েল ডি সার্ভান্তেস সাভেদ্রা (১৫৪৭-১৬১৬), স্পেনের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক, ডন কুইক্সোটের রচয়িতা*

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্পেনের দশা ছিল খুবই শোচনীয়। উপনিবেশগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠছিল। স্প্যানিশ অর্থনীতি ছিল ভুল ত্রুটিতে পূর্ণ, সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছিল না।

আঠার শতকের পুরো সময়টাই স্পেনের কেটেছে বাজে একটা পরিস্থিতির মাঝে। কারণ ফ্রান্স তাকে শাসন করত। নেপোলিয়ান তার ভাইকে স্প্যানিশ সিংহাসনে বসিয়ে দেন। তবে স্পেন বেশিদিন মুখ বুজে থাকে নি। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে

বিপুল এক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্যে পাঠানো জেনারেল দুপোঁ বেইলেনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এটা ছিল নেপোলিয়ানের প্রথম পরাজয়। প্রমাণিত হয় তিনি অপরাজেয় নন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে স্পেনীয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসে ইংরেজরা। ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে দুটি জাতি একত্রে ফরাসীদেরকে পেনিনসূলা থেকে বের করে দেয়।

নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধের পরে স্প্যানিশ সেনাবাহিনীতে একটি বিদ্রোহের সূচনা হয়। নেতারা দেশের জন্যে আরো উদার ও নতুন সংবিধান দাবি করেছিলেন। রাজা প্রথমে এ দাবি মেনে নিলেও কিছুদিনের মধ্যে নিজের শক্তি সংহত করে নেন। তবে উদার ধ্যান ধারণা ততদিনে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ওখানে স্বাধীনতা আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল।



*ফিলিপ দ্বিতীয়, স্পেনের রাজা*

এ আন্দোলনে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন একজন ভেনেজুয়েলান, সিমন বলিভার। ইনি মাদ্রিদে লেখাপড়া করেছেন এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ঘুরে বেরিয়েছেন। বলিভার ভেনেজুয়েলায় স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্পেনীয়দেরকে ভেনেজুয়েলা ও নিউ গ্রেনাডা থেকে বের করে দিয়ে কলম্বিয়া নামে নতুন একটি দেশ গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর বাদে তিনি ইকুয়েডর ও পেরু থেকে স্পেনিয়ার্ডদেরকে উৎখাত করে নতুন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পেরুর দক্ষিণ অংশ তার নামে নামকরণ করা হয় রিপাবলিক অব বলিভিয়া।

বলিভারের লক্ষ্য ছিল গোটা দক্ষিণ আমেরিকাকে একত্র করে গড়ে তুলবেন ফেডারেশন অব রিপাবলিক। তবে এ ধারণাটি তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। ১৮২৯-এ ভেনেজুয়েলা কলম্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতা বলিভার মারা যান।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত স্পেনে ছিল উৎপীড়ক শাসকদের শাসন। বহুবার বিদ্রোহ সূচিত হয়েছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলফানসো

ত্রয়োদশকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে একটি উদারপন্থী কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। পাঁচ বছর এ সরকার স্পেনকে আধুনিক করার চেষ্টা করেছে, তবে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা। তাদের নেতা জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ডানপন্থী সরকার গঠন করেন। তিনি ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন একনায়ক হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্পেন জার্মানী ও ইটালির সাথে মৈত্রী করলেও সরাসরি যুদ্ধ করেনি। স্বৈর শাসক ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পরে জুয়ান কার্লোস দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে পর্তুগাল নীরবে নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে যাচ্ছিল। সে আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য ও ভারতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল দ্বিতীয় বিপ্লবের মুখে গদিচ্যুত হন। একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা খুব একটা কাজে আসে নি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থমন্ত্রী ডঃ অ্যান্টোনিও ডি অলিভিয়েরা সালাজার পর্তুগালের একনায়ক হয়ে বসেন এবং ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে, স্ট্রোকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তারপর পর্তুগালে বিপ্লব হয়েছে এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র।

পর্তুগালের উপনিবেশ পর্তুগীজ গায়ানা (বর্তমানে গায়ানা বিসাউ) ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে, মোজাম্বিক স্বাধীন হয় ১৯৭৫-এর জুনে ও অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতার মুখ দেখে ১৯৭৫-এর নভেম্বরে।

# ফ্রান্সের বিশালতা

ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে ধর্ম নিয়ে গৃহযুদ্ধ। এ জাতি ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হতে পারত। কিন্তু সে ভূমিকা দখল করে স্পেন। ওই সময়টা ফ্রান্সের জন্যে ছিল খুবই নিরানন্দের কাল।

পনের শতকের শেষদিকে চার্লস অষ্টম ইটালি জয়ের স্বপ্ন দেখতেন এবং ১৪৯৪ তে তিনি পেনিনসূলায় হামলা চালান, দখল করে নেন ফ্লোরেন্স, পিসা ও রোম। কিন্তু এ ঘটনা ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তিগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে, অস্ট্রিয়া ও স্পেনের নেতৃত্বে তারা চার্লসকে বাধ্য করেন ইটালি ছেড়ে চলে যেতে।

তার উত্তরসূরি লুই দ্বাদশও ইটালি জয়ের চেষ্টা করেছিলেন, তবে সামান্য সাফল্য অর্জন করেন। অবশ্য তার চাচাত ভাই ফ্রান্সিস প্রথম হ্যানিবালের মত আল্পস পাড়ি দিয়ে বেশ কিছু বিজয় অর্জন করেন এবং পোপকে বাধ্য করেন ফ্রান্সে তাদের নিজস্ব বিশপ ও পাদ্রি নিয়োগ দিতে।



*১৫৭২, ২৪ আগস্ট, সেন্ট বার্থোলোমিউ ডেতে রাজার আদেশে হাজার হাজার ফরাসী প্রোটেস্টান্ট নিহত হয়।*

১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে হলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট চার্লস পঞ্চমের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রিফরমেশনের সময়টাতে এটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে জার্মান রাজ্যগুলো কোন পক্ষ নেবে তা নিজেরাই ঠিক করে নেয়। ফ্রান্সিস প্রথম রোমান ক্যাথলিক হয়েও প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিশ্বাসীদের পক্ষ নেন এবং এদের সঙ্গে সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ফ্রান্স ইটালির পাভিয়াতে পরাজিত হয়।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ক্যাথলিসিজমের সমর্থকদের ধর্ম বিশ্বাসের বিভাজনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভ্যাসিতে ক্যাথলিকরা শত শত প্রোটেষ্টান্টকে কচু কাটা করে এবং দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই চলে ত্রিশ বছর ধরে। গৃহযুদ্ধ এমনই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ফরাসীদের মান সম্মান দারুণভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং জাতীয় উন্নতি প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সের প্রোটেষ্টান্টরা, যাদেরকে বলা হতো হিউগনট, এদেরকে নেতৃত্ব দিতেন অ্যাডমিরাল কলিগনি। তার সাথে রাজা চালর্স নবমের ভাল সম্পর্ক ছিল। তারা একটি চুক্তিতে পৌছাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজার মা ক্যাথেরিন ডি মেডিসি এ চুক্তি করতে ভয় পাচ্ছিলেন ভেবে যে ফ্রান্সের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তার প্রভাব প্রতিপত্তির ধ্বংস ডেকে আনবে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে, 'সেন্ট বার্থোলেমিউ ডে'তে প্যারিসে মীটিং-এ আসা হাজার হাজার প্রোটেষ্টান্টকে রানি মা হত্যার নির্দেশ দেন। রাজা এর বিন্দু বিসর্গ জানতেন না। এই ভয়াবহ গণহত্যায় আট হাজারের বেশি প্রোটেষ্টান্টের মৃত্যুতে গোটা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। হতভাগ্যদের মধ্যে অ্যাডমিরাল কলিগনিও ছিলেন।

এটা ছিল ভয়ানক একটা ভুল। কারণ এ গণহত্যা ফ্রান্সকে তার সকল মিত্রদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হিউগনটদেরকে তখন সমর্থন যোগাচ্ছিলেন নাভারের রাজা হেনরী। ইনি ফরাসী রাজার কাজিন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসে দুই পক্ষকে একত্রিত করার চেষ্টা চালান। ধর্মীয় শান্তি আনার পক্ষে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি পুরো ইউরোপে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ফিরিয়ে আনেন, অবসান ঘটে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের। প্রোটেষ্টান্টরা তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে যায়, সরকারী চাকরি, সেনাবাহিনী এমনকি আদালতেও তাদের কাজ জুটে যায়। এরপরে রাজা তার অত্যন্ত দক্ষ প্রধানমন্ত্রী সাল্লির সাহায্যে ফ্রান্সকে পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেন।

এক পাগল সন্ন্যাসী ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে হেনরীকে। তার ছেলে লুই ত্রয়োদশ সিংহাসনে বসেন। লুই'র আমলে ফরাসীরা ভালই ছিল। কারণ কার্ডিনাল আরমন্দ জঁা দু প্লেসিস ডি রিচলু নামে ইতিহাসের অতি বিখ্যাত একজন মানুষ ছিলেন রানির উপদেষ্টা। এ মানুষটি ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী কূটনীতিকে পরিণত হন। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল: যে কোন মূল্যে ফ্রান্সকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। তার ইচ্ছা শক্তি ছিল অসম্ভব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ এবং সম্ভবতঃ দেশের সবচেয়ে উর্বর মস্তিস্কের অধিকারীও ছিলেন তিনি।

রিচলু ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৬৪২-এ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন। তাঁর ঘরোয়া নীতি ছিল

প্রোটেস্টান্টদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও। আর বিদেশ নীতি ছিল ইউরোপে ফ্রান্সকে চূড়ান্ত শক্তিতে পরিণত করা। তিনি ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন স্প্যানিশ শক্তি ধ্বংস করার জন্যে। তিনি উত্তর আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ যোগাতেন।

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর সময় রিচলু তার ছাত্র ও অত্যন্ত যোগ্য উত্তরসূরি কার্ডিনাল মাজারিনকে রেখে যান। এর জন্ম ইটালিতে। ইনিও রানির (লুই ত্রয়োদশের স্ত্রী) পরামর্শদাতা ছিলেন। লুই মারা যান ১৬৪৩-এ, রেখে যান শিশু উত্তরাধিকার লুই চতুর্দশকে। মাজারিনই মূলতঃ ফ্রান্সকে শাসন করেছেন পরবর্তী দেড় যুগ। এ সময় তার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি সমস্ত ষড়যন্ত্র দৃঢ়হাতে নস্যাৎ করে দেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাজারিন ইউরোপে ফরাসী প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

এরপরে সিংহাসনে বসেন তরুণ চতুর্দশ লুই। তাকে সবাই 'সূর্য রাজা' বলে সম্বোধন করত। তিনি শৌর্য-বীর্যে একজন রাজার মতই ছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তাঁর সময়ে আমেরিকা ও ভারতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, পুনর্গঠিত হয় নৌ বাহিনী, রাস্তাঘাট, খনন করা হয় খাল, তৈরী হয় শিল্প কারখানা। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় ফ্রান্সকে যুদ্ধে জড়িয়ে এবং প্রোটেস্টান্টদেরকে নির্যাতন করে সমস্ত ভাল কাজে তিনি কালিমা লেপন করেন।

অনেকেই ফ্রান্স ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে পালিয়ে যায় জার্মানী, ব্রিটেন ও নিউ ওয়ার্ল্ডে। এসব দেশ পায় দক্ষ কারিগর যা হারাতে হয়েছিল ফ্রান্সকে।

দুটি বিরাট যুদ্ধ ফ্রান্সকে প্রায় খোঁড়া করে দিয়েছিল। এর একটি ছিল ইংল্যাণ্ডের সাথে (১৬৮৯-১৬৯৮ এতে শেষতক যুদ্ধবিরতি হয়।)

অপরটি স্প্যানিশ সাকসেশন ওঅর (১৭০২-৩)। এ যুদ্ধে ইংরেজ ডিউক অব মার্লবোরা বিজয় লাভ করেন।

লুই মারা যান ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে, উত্তরাধিকার, রেখে যান প্রপৌত্র লুই পঞ্চদশকে (১৭১৫-৭৪)। তিনি ছিলেন বালকমাত্র। প্রায় এক দশক ফ্রান্স ইউরোপকে সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর সেই ফ্রান্সেরই অবনতি হতে চলছিল বিদ্রোহের কারণে।

লুই'র সময় ব্যয় হয়েছে সাম্রাজ্যকে ধরে রেখে দেশকে সম্পদশালী করে তোলার কাজে। ইউরোপ ও ফ্রান্স অধ্যুষিত আমেরিকা, ভারত এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের উপনিবেশগুলোতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। রাজার এ দিকে নজর ছিল না। তিনি অন্যের হাতে সরকার চালানোর দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজে আমোদ প্রমোদে

থাকতেন ব্যস্ত। সরকার কানাডা ও ভারতে গভর্নর ও স্থানীয় কমান্ডার বসিয়ে ভুল করেছিল। এর ফলে তাৎক্ষনিক কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার উপায় ছিল না, প্যারিস থেকে কবে অনুমতি আসবে সে অপেক্ষায় থাকতে হতো। কেন্দ্রীয় সরকারও এসব অঞ্চলে টাকা বা সৈন্য পাঠিয়ে কোন সাহায্য করতে পারছিল না। ফলে এরা সাত বছরের যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্যে ফ্রান্স থেকে জয়লাভ করে।

দেশের অর্থনীতির অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গিয়েছিল প্যারিসের অ্যারিষ্টোক্রাটদের হাতে। এরা ছিলেন সামন্ত প্রভুদের মত। মধ্যযুগীয় কায়দায় কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। কৃষকরা ছিল খুবই গরীব, তাদের চাষাবাদের পদ্ধতি ছিল মান্ধাতা আমলের, মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনীতিকদের শক্তির ব্যাপারে ক্রমে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ভলতেয়ার, রুশো ও মন্টেসকুর মত দার্শনিকদের লেখা পড়ে নতুন সমাজ গঠনের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় দেড়শ বছর পরে ফরাসী পার্লামেন্ট বসে। ফরাসী জনগণের মাথায় তখন আমেরিকান সরকার ও তার স্বাধীনতার কথা খেলা করছিল। ফলে একটি বিপ্লব অনিবার্যতায় রূপ নেয়।

প্যারিসে রুটির জন্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৪ জুলাই ক্রুদ্ধ জনতা রাজকীয় অত্যাচারের প্রতীক, পাথরের বাস্তিল দুর্গে হামলা চালিয়ে বসে। ওই সময় মাত্র চারজন অপরাধী ছিল দুর্গে। অ্যাসেম্বলিতে ভোটের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো হয় এবং ঘোষিত হয় মানবাধিকার।

রাজা ভীত হয়ে এই বিপ্লব পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সীমান্তের কাছে ধরা পড়ে যান। তাকে প্যারিসে ফিরিয়ে এনে তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়।

রাজার বউ, মেরী অ্যান্টোনেট, এক অষ্ট্রিয়ান রাজকুমারী ও সম্রাটের বোন, অনেক আগেই প্রজাদের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। অস্ট্রিয়া রাজা লুইকে উদ্ধারের জন্য ফ্রান্সে হামলা চালালে অ্যাসেম্বলি সম্রাটত্বের অবসান ঘোষণা করে রাজাকে আদালতের হাতে তুলে দেয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার কয়েক মাস বাদে রানিকে।

বিপ্লব ভালভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। মধ্যপন্থীরা প্রথমে সরকার চালাবার চেষ্টা করে, তবে নেতৃস্থানীয় দল জ্যাকোবিনরা তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এরপরে বিভক্ত হয়ে যায় জ্যাকোবিনরা। এদিকে সীমান্তে ইউরোপীয় শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল ফ্রান্সকে। এরা রাজার মৃত্যুতে ভীত হয়ে উঠেছিল। তবে সীমান্ত থেকে সমস্ত শক্তি বিতাড়িত করে ফরাসীরা অন্যদেশেও হামলা চালিয়ে বসে এক তরুণ সেনাপতির নেতৃত্বে, তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

বিপ্লব ফ্রান্সের মধ্যবিত্তদেরকে চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইয়ে দেয় শহরে এবং কৃষকরা এর সুবিধে ভোগ করতে থাকে গ্রামে। এ বিপ্লব আইনের চোখে সবাই সমান বলেও প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং আর্টিলারী বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। অফিসার পদে দ্রুত একের পর পর এক পদোন্নতি ঘটছিল তার। তার নেতৃত্বে প্রথম অভিযান ছিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তিনি ইটালিতে ফ্রান্সকে শাসক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, অসাধারণ প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল তার এবং দারুণ দারুণ সব পরিকল্পনা আঁটতে দক্ষ।

নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সকে একত্রিত করে কেন্দ্র থেকে শাসন করবেন এবং সমাজে সমতা নিয়ে আসবেন। তিনি সকল প্রকার শ্রেণী বৈষম্য দূর করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেপোলিয়ন ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী। আর এটাই তাকে শেষতক ধ্বংস করে।



*জেনারেল চার্লস দ্য গল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭০-এ মৃত্যুবরণ করেন জন।*

তিনি ফ্রান্স ও ইউরোপে প্রচুর ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এলেও দীর্ঘ পনের বছরের যুদ্ধের মদতদাতাও ছিলেন। এ যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইউরোপকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। মিশরীয়দেরকে পিরামিডের যুদ্ধে পরাজিত করলেও নীল নদের যুদ্ধে তার নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন ইংরেজ অ্যাডমিরাল নেলসন, মিশরে কারারুদ্ধ করে রাখা হয় নেপোলিয়নকে। এখানে থাকতে তিনি শুনতে পান ডাইরেকটরি নিয়ে ফ্রান্সের জনগণ ক্ষুব্ধ। তখন নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসেন। এরপরে তিনি প্রথম তিন কনসালের প্রথম জন নির্বাচিত হন, পরে একমাত্র কনসাল। তার বিরুদ্ধে যে সব ইউরোপীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছিল সবাইকে তিনি পরাজিত করেন এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ফ্রান্স হয়ে ওঠে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে পুনর্গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি স্থানীয় সরকারের সংস্কার করেন। সহজবোধ্য করে তোলেন আইন-কানুন এবং রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন রোমান ক্যাথলিজম। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন নেপোলিয়ন।

অন্যান্য দেশে করদ রাজা বহাল করেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাকে ঠেকাতে চাইলেও পারে নি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্টারলিজে তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন।

হামলা চালিয়েও ব্রিটেনকে পরাভূত করতে পারেন নি বলে নেপোলিয়ন ব্রিটিশদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা করেন। তিনি সকল ইউরোপীয় বন্দর ব্রিটিশদের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ বাজারে ইউরোপীয় মালামাল কেনা বেচা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। তবে এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। এর ফলে করদ রাজ্যগুলো অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর পর্তুগাল তার বন্দর বন্ধ করতে রাজি না হলে নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে দেশটি দখল করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। ১৮০৮ এ তিনি স্প্যানিশ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সেখানে নিজের ভাইকে অধিষ্ঠিত করেন। স্প্যানিশরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে ও বেইলেনে একদল ফরাসী সৈন্যকে পরাজিত করে।

রাশিয়ারও নেপোলিয়নের ঘোষিত কন্টিনেন্টাল সিস্টেম পছন্দ হয় নি। তারাও নেপোলিয়ানের সাথে যেতে রাজি হয়নি। নেপোলিয়ান তখন (১৮১২) যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে বিশাল দেশটিতে ঢুকে পড়েন। বোরোডিনে জার তার কাছে পরাজিত হন। কিন্তু মস্কো পৌঁছে নেপোলিয়ান দেখেন শহর খালি ও দালান কোঠায় আগুন জ্বলছে। সবাইকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নেপোলিয়ান আর শূন্য নগরীতে থেকে লাভ নেই ভেবে ফ্রান্সের পথ ধরেন। ততদিনে রাশিয়ার বিখ্যাত ও ভয়ঙ্কর শীত নেমে গেছে। রাশিয়ান গেরিলারা চোরা গোপ্তা হামলা চালিয়ে বিপর্যস্ত করে ফেলে ফরাসী বাহিনীকে। জ্বালানী ও খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়, সেই সাথে ঠাণ্ডা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাটে চলাচলও ছিল দারুণ বিপজ্জনক। হাজার হাজার সৈন্য অকাতরে মরতে থাকে। নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে ফিরে আসেন, ছয়লক্ষ সৈন্যের মাত্র ত্রিশ হাজার অবশিষ্ট ছিল।

এই বিপর্যয় ছিল সাধারণ বিদ্রোহের ইঙ্গিত। ডিউক অব ওয়েলিংটন এর সাহায্যে স্প্যানিশরা ফরাসীদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়। লাইপজিগে নেপোলিয়ন রাশিয়ান, অষ্ট্রিয়ান ও প্রুশিয়ান যৌথ বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং জীবনে প্রথমবার পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেন রক্তক্ষয়ী এক মহা সংঘর্ষে। তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়ে এলবা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। তবে তার জীবনের শেষ পরাজয় আসে ওয়াটারলুর যুদ্ধে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। ডিউক অব ওয়েলিংটন এ যুদ্ধে পরাজিত করেন মহাবীর নেপোলিয়ানকে। নেপোলিয়ান ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেয়া হয়

আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সেখানে নির্বাসনে, একাকী কাটিয়ে দিতে হয়েছে নেপোলিয়ানকে জীবনের শেষ দিনগুলো। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ওই দ্বীপেই মৃত্যু ঘটে ইতিহাসের এই মহানায়কের।

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পরে কংগ্রেস অব ভিয়েনা সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রান্সের সীমান্তকে ১৭৯২'র মত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। লুই সপ্তদশকে (ইনি লুই চতুর্দশের ভাই) আবার সিংহাসনে বসানো হয়। ইনি আগেও একবার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং ব্যর্থতার গ্লানি সইতে হয়েছে। ১৮২৪-এ তার ছোট ভাই চার্লস দশম সিংহাসনে বসেন। তিনিও বড় ভাইয়ের মত বিদ্রোহের ফলে প্রাপ্ত অবদানগুলোকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলে তাকেও গদি থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। তার কাজিন, গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী লুই ফিলিপ ক্ষমতায় বসেন এবং আঠার বছর রাজ্য শাসন করেন। তার সময়ে ফ্রান্সের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। রেলপথ নির্মাণ করা হয়, টেলিগ্রাফ পদ্ধতির সাথে দেশবাসী পরিচিত হয়। খনন করা হয় খাল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, বিশেষ করে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করা হয় বেশি।

ভয়ানক এক বিদ্রোহের শিকার হয়ে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন লুই। কয়েক মাস অরাজক অবস্থা চলার পরে নেপোলিয়ানের ভাতিজা লুই নেপোলিয়ানকে সেকেন্ড রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট বানানো হয়। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষটি অফিসকে বিশেষ পাত্তা দিতেন না। তিনি বিরোধদলীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা দেন এবং নতুন সংবিধান জারী করেন। চাচার সাথে তার কোনভাবেই তুলনা করা যায় না, বরং তার শাসনামলের বেশিরভাগ সময় ছিল অসন্তোষের কাল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার সাথে যুদ্ধে তিনি হেরে গিয়ে বন্দী হন। তৃতীয় রিপাবলিক ঘোষণা করা হয় এবং লুইকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ফ্রান্স ক্রমে তার রাজ্য বিস্তৃত করে চলছিল, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফ্রান্সকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। কুড়ি বছর বাদে, ১৯৪০-এর বসন্তে জার্মানরা ফ্রান্স আক্রমণ করে। তাদের প্রচণ্ড হামলার মুখে ফ্রান্স দাঁড়াতেই পারে নি। কারণ তার সেনাপতিরা হয় ছিল অদক্ষ নয়তো বিশ্বাসঘাতক। স্টাফ অফিসাররা নিজেদের দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করত। হামলার কয়েক হপ্তার মধ্যে গর্বিত এই জাতিটি হিটলারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

যুদ্ধের পরে ফ্রান্স বেশির দিনের জন্যে সরকার ধরে রাখতে পারে নি। অবশেষে হতাশার মাঝখানে আবির্ভাব ঘটে জেনারেল চার্লস দ্য গলের, ইনি হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং পরাজয় বরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একেই দেশবাসী ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর ক্ষমতায় আসেন জর্জ পম্পেদু। ১৯৭৪-এ পম্পেদু মারা গেলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন সমাজবাদী মিতেরাঁ ১৯৮১ তে। বর্তমানে দেশটি শাসন করছেন জাঁ শিরাক।

# জার্মানীর উত্থান

আমরা দেখেছি মধ্যযুগে জার্মান শাসকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের পূর্ব অংশে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। মাঝে মাঝেই কোন কোন শাসক চেষ্টা করেছেন মধ্য ইউরোপের দেশগুলোকে একত্রিত করতে। তবে তের শতকের শেষ দিকে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ পরিবারের কাঁধে। তারপর জার্মানীর ছিল কতগুলো বিচ্ছিন্ন রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র যেগুলো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রজা ছিল।

ষোড়শ শতকে যখন মানুষ পোপের কর্তৃত্ব নিয়ে সমালোচনায় মুখর ওই সময় এক জার্মান সন্ন্যাসী, মার্টিন লুথার রিফরমেশন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে অর্থডক্স চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টান্ট বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। রিফরমেশনের ব্যাপারে জার্মান যুবরাজদের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি ছিল , তারা এর পক্ষে ও বিপক্ষে কম বেশি দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। হলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট চার্লস নতুন ধর্মমত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে বিশাল এক সাম্রাজ্য তাকে শাসন করতে হচ্ছিল বলে তিনি চাননি ধর্ম নিয়ে কোন ঝামেলার সৃষ্টি হোক। তাই ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে পীস অব অগাসবার্গ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় জার্মান যুবরাজকে লুথেরাজিম এবং ক্যাথোলিসজম এর মাঝ থেকে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। তবে এটা স্থায়ী সমাধান ছিল না। কারণ ইউরোপে নতুন আরেকটি ধর্ম, কালভিনিজম-এর আবির্ভাব ঘটতে চলছিল। অগাসবার্গ চুক্তির পরে জার্মানী প্রোটেস্টান্ট উত্তর ও ক্যাথলিক দক্ষিণে ভাগ হয়ে যায়।

এরপর কিছুদিন জার্মানীতে শান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে, জার্মান রেনেসাঁ শীর্ষে উঠে যায়, বিশেষ করে স্থাপত্য ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনে।

কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষ দিকে আবার ঝামেলা শুরু হয়ে যায় যখন প্রোটেস্টান্ট রাষ্ট্রগুলো বিভক্ত হয়ে যেতে থাকে। তাদের কেউ ছিল লুথেরান, কেউ বা কালভিনিষ্ট। এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলো। তারা প্রোটেষ্টান্টদেরকে প্ররোচিত করতে থাকে বিভিন্ন রাজ্যে। বোহেমিয়ার চার্চ ভেঙে ফেলা হয় এবং প্রজাদেরকে বের করে দেয়া হয়। এর ফলে প্রাগসহ নানা জায়গায় দাঙ্গা বেধে যায়। সম্রাটের প্রতিনিধিরা প্রাগে এসে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে গেলে তাদেরকে সম্মেলন কক্ষের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে 'ডিফেনেসট্রেশন অব প্রাগ' নামে পরিচিত। এর শুরু ১৬১৮

খ্রীষ্টাব্দে। এ ঘটনা ত্রিশ বছরের যুদ্ধের জন্যে দায়ী যাতে প্রায় গোটা ইউরোপ জড়িয়ে পড়েছিল। তবে মূল লড়াইটা হয়েছে জার্মানীর মাটিতে এবং এটা জার্মানদের ওপর খুব বাজে প্রভাব রেখেছে।

বোহেমিয়ার রাজা ফ্রেডেরিককে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে, প্রাগের কাছে হোয়াইট মাউন্টেনের যুদ্ধে পরাজিত করেন সম্রাটের সেনাপতি কাউন্ট টিলি এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। নেতৃস্থানীয় প্রোটেস্টান্ট নোবলরা গ্রেফতার হন এবং তাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয। বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তাদের জমিজমা। সম্রাটের বাহিনী তারপর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। উত্তরের জার্মান রাজ্যগুলোকে সাহায্য করছিলেন ডেনমার্কের রাজা। সম্রাট-বাহিনী বিখ্যাত কুশলী উদ্যোক্তা কাউন্ট আলবেখট ভন ওয়ালেনস্টিনের নেতৃত্বে জার্মান ও ডেনিশদের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করে। কাউন্ট ক্ষমতা দখল করতে পারেন এই ভয়ে সম্রাট দ্রুত তাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে আনেন। তবে সুইডেনের রাজা গুস্তভাস অ্যাডোলফাস ব্রিটেনফেল্ডে সম্রাটের বাহিনীকে পরাজিত করলে প্রোটেষ্টান্টরা তাদের সমস্ত ক্ষতির মাশুল পেয়ে যাচ্ছিল দেখে সম্রাট আবার কাউন্টের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর লুটজেনে কাউন্ট ও গুস্তাভাসের সঙ্গে দিনভর লড়াই চলে। যুদ্ধে সুইডিশ রাজা জয়ী হলেও বিজয়ের আনন্দ ভোগ করতে পারেন নি। কারণ ওই সময়েই তিনি খুন হয়ে যান। কাউন্টকেও কিছুদিন পরে হত্যা করা হয়, সম্ভবত সম্রাটের ঈর্ষার বলি হয়ে।



*জার্মান সম্রাট উইলিয়াম দ্বিতীয় ওরফে কাইজার, ব্রিটেনের কুইন ভিক্টোরিয়ার পৌত্র।*

যুদ্ধের অবশেষে সমাপ্তি ঘটে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ফলাফল ছিল অচল একটি অবস্থার সৃষ্টি। যেসব রাষ্ট্র ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে লড়াই করে যাচ্ছিল তারা ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিই বিশ্বাসী থেকে যায়, তবে প্রোটেষ্টান্টরাও স্বীকৃতি

পেয়ে যায়। দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানীর বাসিন্দারা ছিল ক্যাথলিক ধর্মানুসারী, উত্তর ও পুব প্রোটেষ্টান্ট। তবে এ বিভক্তির মধ্যে লড়াই সকলকেই প্রভাবিত করে। যুদ্ধের কারণে জনসংখ্যা নেমে আসে দুই তৃতীয়াংশে, অনেক এলাকার মানুষ আবার অনাহারে ধুঁকছিল।

ধ্বংসাবশেষ থেকে যে কটি জার্মান রাজ্য উঠে এসেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ব্রান্ডেনবার্গ। এর শাসনকর্তা ফ্রেডেরিক উইলিয়াম (১৬২০-৮৮) প্রুশিয়া রাষ্ট্রের জন্ম দেন। এ দেশ ব্রান্ডেনবার্গের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফ্রেডেরিকের ইচ্ছে ছিল প্রুশিয়াকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবেন যাতে অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলোর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন। তিনি শিল্প কারখানা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন এবং খাল খনন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু করেন।

তার উত্তরসূরি, ফ্রেডেরিক প্রথম, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রুশিয়ার রাজা হন। তার সময় জার্মান মিলিটারিজমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর অর্থ কোন দেশ সামরিকভাবে শাসিত হওয়া। আর সামরিক বাহিনী খুব আগ্রাসী মনোভাবের হয়ে থাকে। ফ্রেডেরিকের ছেলে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম প্রথম (১৭১৭-৪০) তার রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন সেনাবাহিনীর শ্রী বৃদ্ধির কাজে। তিনি একটি রেজিমেন্ট গঠন করেন যেখানে ছয় ফুটের নিচে কোন সৈন্য ছিল না। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৩৮,০০০ আর ১৭৪০ নাগাদ সংখ্যাটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় চুরাশি হাজারে। এরা সকলেই ছিল সুশৃঙ্খল, সাহসী ও দক্ষ।

ফ্রেডেরিক উইলিয়াম প্রথমের পরে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে ফ্রেডেরিক দ্বিতীয় যাকে সবাই ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট নামে চিনত। ইনি ইউরোপের সেরা সামরিক নেতাদের একজন। এই স্মরণীয় মানুষটি তার রাজত্ব শুরু করেন সিলেসিয়া দখলের মাধ্যমে। সাত বছরের যুদ্ধে প্রুশিয়া ও ব্রিটেন ফ্রান্সে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল অষ্ট্রিয়া দখলের পাঁয়তারা নিয়ে। ফ্রেডেরিক দুটি যুদ্ধে (বোসবাস ও লুথেন, ১৭৫৭) ফরাসীদেরকে পরাজিত করলেও পরে অষ্ট্রিয়ান ও রাশানদের কাছে কুনার্সডর্ফে নিজেই পরাজিত হন। বার্লিন দখল করে বিজয়ী শাসক।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর সময় প্রুশিয়া ইউরোপের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দেশে পরিণত হয়েছিল। তবে ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের ছেলে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম দ্বিতীয়র (১৭৮৬-৯৭) সময় প্রুশিয়ার শক্তি হ্রাস পেতে থাকে অক্ষম শাসকের কারণে। নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যান্ডের যুদ্ধে প্রুশিয়ানদেরকে পরাজিত করে দেশটিকে দু টুকরো করে ফেলেন। পশ্চিম অংশের রূপান্তর ঘটে ওয়েস্টফালিয়া রাজ্যে, পূর্ব অংশ পোল্যান্ডের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পরে (এ পতন ঘটাতে সাহায্য করেছে প্রাশয়া সহ অন্যান্য জার্মান রাজ্য) জার্মানদের সঙ্গে অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করা হতে থাকে। জার্মানীর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ছিল শুধু যুদ্ধের। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে শুরু হওয়া বিদ্রোহ জার্মান রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রুশিয়ায় অত্যন্ত কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ার সিংহাসনে বসেন নতুন এক রাজা-উইলিয়াম প্রথম। ইনি প্রুশিয়ার অধীনে সকল জার্মান রাজ্যকে একত্রিত দেখতে চেয়েছিলেন। আর এ কাজে তিনি নিয়োগ করেন বিখ্যাত তিনজন মানুষকে। এরা হলেন কাউন্ট আল ব্রোট ভন রুন (১৮০৩–৭৯), যুদ্ধ মন্ত্রী যিনি প্রুশিয়ান বাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন; কাউন্ট হেলমুথ ভন মলটক (১৮০০–৯১), চিফ অব দ্যা প্রুশিয়ান জেনারেল স্টাফ যিনি ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্যে আধুনিকভাবে সেনা সংগঠিত করেন। এই তিনজনের মধ্যে সর্বসেরা কাউন্ট অটো ভন বিসমার্ক (১৮১৫–৯৮), রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

লম্বা, প্রকাণ্ড মাথার অধিকারী, অহংকারী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অত্যন্ত চতুর স্বভাবের মানুষ ছিলেন বিসমার্ক। শুধু প্রুশিয়া নয়, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউরোপও শাসন করেছেন। তিনি জার্মান পার্লামেন্টকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তারই মদতে প্রুশিয়া ১৮৬৪ তে ডেনমার্কে হামলা করে বসে। আর ১৮৬৬ তে অস্ট্রিয়া এবং ১৮৭০ এ ফ্রান্সে আক্রমণ চালায়। প্রতিটি অভিযানই সফল হয়েছিল।

বিসমার্ক প্রুশিয়ার অধীনে জার্মান রাজ্যগুলোও একত্রিত করেন যার স্বপ্ন দেখে এসেছিলেন রাজারা গত দেড়শ বছর ধরে। প্রুশিয়া সবগুলো রাজ্যের নেতা ছিল। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সকে জার্মান রাজ্যগুলোকে আক্রমণে প্ররোচিত করেন যাতে প্রুশিয়া এর মধ্যে নাক গলাতে পারে এবং তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে জার্মানিক কনফেডারেশনের মাথা হয়ে উঠতে পারে।

ফ্রান্সে প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হয় এবং ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান তৃতীয় ধৃত হন। প্রুশিয়ার উইলিয়াম প্রথমকে ভার্সাইর গ্রেট হল এ জার্মানীর সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একত্রিত জার্মান শিল্প কারখানা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদিতে দারুণ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে নিজের জায়গা করে নেয়। আফ্রিকা ও দূর প্রাচ্যে সে উপনিবেশ স্থাপন করে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নতুন এক সম্রাট, উইলিয়াম দ্বিতীয় সিংহাসনে বসেন। তবে তাকে সবাই কাইজার (সিজার থেকে এসেছে এ নাম) নামে সম্বোধন করত। এই বদমেজাজী, উদ্ধত এবং নির্বোধ মানুষটি শুরুতেই রাজ্যের প্রধান মানুষগুলোর

সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে বিসমার্কের সঙ্গে। একে তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাজ থেকে অব্যাহতি দেন। তারপর নিজেই দেশ শাসনে মনস্থির করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, এর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনও ছিল, এদেরকে নানা ভাবে উত্যক্ত করছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন অষ্ট্রিয়া সিরিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কাইজার অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিতে এর মধ্যে নাক গলান বেলজিয়াম আক্রমণ করে। তিনদিন বাদে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধ চার বছর চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মানীর ধ্বংস ডেকে এনেছিল আর কাইজারকে চলে যেতে হয়েছিল নির্বাসনে।



*ক্যাপ হাতে অ্যাডলফ হিটলার, ১৯৩৭-এ নুরেমবার্গে।*

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর ওপর চাপিয়ে দেয়া কঠিন সব শর্ত এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলে।

অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী দরিদ্র এক চিত্রকর, অ্যাডলফ হিটলার, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্পোরাল হিসেবে ট্রেঞ্চে লড়াই করেছেন, তার নেতৃত্বে জার্মানীরা অনুভব করতে থাকে তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। হিটলারের

চৌম্বকীয় সম্মোহনকারী ব্যক্তিত্ব জার্মানদেরকে পরিণত করে আগ্রাসী ও সংগ্রামশীল জাতিতে। তিনি নতুন রাস্তাঘাট, দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণে বেকার তরুণদের কাজে লাগিয়েছেন। একই সাথে হিটলার ভঙ্গুর জার্মান সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সুদক্ষ সামরিক যন্ত্রে পরিণত করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করেন। অষ্ট্রিয়া দখল করা হয়। মাস কয়েক বাদে তিনি দখল করেন চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হামলা চালান পোল্যাণ্ডে। আর প্রায় তার পরপরই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বার বছরের শাসনামলে (১৯৩৩-৪৫) ফুয়েরার (নেতা) হিসেবে হিটলার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ভয়ঙ্কর সব কৌশল অবলম্বন করেন। ১৯৩৩ থেকে ৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানরা অনেক মার খেয়েছে। হিটলার তার প্রতিপক্ষকে মেরে তুলো ধুনো করে জেলে ঢুকিয়ে দেন, কেউ কেউ খুনও হয়ে যায়। ক্যাথোলিক ও প্রোটেষ্টান্টদেরকে নাকাল করা হয়। তবে হিটলারের সবচেয়ে আক্রোশ ছিল ইহুদিদের প্রতি। তার বিশ্বাস ছিল ইহুদিদের কারণেই ১৯১৮ তে জার্মানরা হেরেছে। তাই তিনি নির্দয়ভাবে ইহুদি নিধন যজ্ঞ শুরু করেন। হাজার হাজার ইহুদি কোন চিহ্ন মাত্র না রেখে হারিয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে, কোন বিচারের বালাই ছিল না। যখন খুশি ইহুদিদের ধরে জেলে পুরে দেয়া হতো।

১৯৪১ নাগাদ হিটলারের বাহিনী ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল দখল করে ফেলে, এরপর হিটলার গোটা ইউরোপ জুড়ে অকাতরে ইহুদি হত্যা শুরু করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধ শেষের বছরে ষাট লাখ ইহুদিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে এরচে' বড় অপরাধ আর নেই।

যুদ্ধের পরে জার্মানীর যে সব যুদ্ধবাজ নেতা বেঁচে ছিলেন তাদের বিচার করা হয় ন্যুরেমবার্গের আদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। বেশিরভাগকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। শুধু মার্শাল গোয়েরিং ছাড়া সকল যুদ্ধ নেতাই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী করেছেন হিটলারকে।

জার্মানদের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছিল রাশিয়া। রাশিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমর্থন জানায়। এরা সবাই মিলে জার্মানীকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলে। পূর্ব জার্মানী বেছে নিয়েছিল কমুনিজমের রাস্তা, পশ্চিম জার্মানী গণতন্ত্র। তবে বেশি উন্নতি ঘটে পশ্চিম জার্মানীর। হিটলারের তৈরি দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীর কোন অস্তিত্বই ছিল না যুদ্ধের পরে। তবে জার্মানীকে বিভক্ত করে রাখা বার্লিন ওয়াল-এর পতন ঘটে ১৯৮৯ তে। এরপর দুই জার্মানী আবার এক হয়ে যায়। বর্তমানে ইউরোপের সেরা নেতৃস্থানীয় শক্তির মধ্যে জার্মানী অন্যতম।

# হল্যাণ্ডের সাগর শক্তি

ডাচরা জন্মগতসূত্রে প্রাচীন জার্মানদের অংশ, তাদের ভাষাও ছিল জার্মানদের মত। তারা কয়েক শতক দখল করে রেখেছিল ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে ডাচরা হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ, কষ্টসহিষ্ণু ও দেশপ্রেমিক। সাগর তীরের বাসিন্দা বলে সাগরের সমস্ত ভয়কে তারা করেছিল জয়।

এক সময় হল্যাণ্ড ছিল স্বশাসিত, ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি দেশ। বর্তমানের বেলজিয়ামও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোল শতকে রাজ্যগুলো বিশাল হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়। এ সাম্রাজ্য ১৫১৯ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন চালর্স পঞ্চম। ডাচদের জীবনে কি ঘটেছিল তা আমরা বাহান্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।



*হল্যাণ্ডের নৌ বহর*

স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে বিপুল জয় লাভ করার পরে ডাচরা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যায় এবং নিজেদেরকে নৌ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে থাকে। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই তারা দুঃসাহসী নাবিক হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এর ফলে পুব থেকে প্রচুর পরিমাণে পণ্য ইউরোপে রপ্তানী হচ্ছিল। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোও, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে উঠলে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বেধে যেত। ইংল্যাণ্ডের

সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৌযুদ্ধে মোড় নেয়। দু'পক্ষই বিভিন্ন সময় যুদ্ধে জিতেছে। ইংল্যাণ্ডের চার্লস দ্বিতীয়র (১৬৬০–৮৫) সময়ে ডাচ অ্যাডমিরাল ভ্যান ট্রম্প কেন্টের মেডওয়ে নদীতে অনেকগুলো ইংরেজ জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সতের শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়ে ওঠা ডাচরা আমস্টারডাম, রটার ডাম ও হেগ শহরকে সুন্দর করে সাজাতে থাকে। এ সময়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রেমব্রাণ্ডটের আবির্ভাব ঘটে। ডাচ বিজ্ঞানীরাও কোন অংশ কম ছিলেন না। এদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন লেডেন, ভ্যান লিউয়েন হুক ও হিউজেনস।

নেপোলিয়নের সময় হল্যাণ্ড ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ। তবে ওয়্যাটারলু'র যুদ্ধের পরে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম একত্রিত হয়ে যৌথ রাজ্যে পরিণত হয়। এতে কোন লাভ হয়নি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেশটি আলাদা সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। ইষ্ট ইণ্ডিজ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ডাচরা তাদের উপনিবেশের সংখ্যা বাড়াচ্ছিল এবং একই সাথে বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে হল্যাণ্ড বিরাট ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বলা হয় হল্যাণ্ডের প্রতিটি নাগরিকের ঘরে প্রাচ্যের কিংবা দক্ষিণ আমেরিকান অলংকার পেইন্টিং ভাস্কর্য কিংবা আসবাব দেখা যেতই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হল্যাণ্ড নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেশটিকে জার্মানরা দ্রুত দখল করে নেয় এবং প্রায় পাঁচ বছর অত্যাচারে জর্জরিত করে ফেলে। এদিকে প্রাচ্যের ডাচ উপনিবেশগুলো জাপানীরা দখল করে নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় শাসন করছিল। যুদ্ধ শেষ হলে ডাচরা তাদের উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয় এবং আগের মত নিজেদের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে মনোনিবেশ করে।

# অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হোলি রোমান এম্পায়ার শাসন করে এসেছেন হাপসবুর্গ পরিবার। এরা ছিলেন জার্মান ভাষাভাষী কাউন্ট, তাদের শাসনাধীনে যেসব অঞ্চল ছিল সেগুলো হলো অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া এবং বলকান রাজ্যের কিয়দংশ।

অষ্ট্রিয়ার হাপসবুর্গ শাসনকর্তাদের বেশির ভাগ ছিলেন হোলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট। এর মানে হলো অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলো ছিল তাদের পদানত। সকল অঞ্চলই ছিল চার্লস পঞ্চমের বিশাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহাকজে সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিশিয়েন্ট এর অধীনে অটোমান তুর্কীদের হাতে চার্লসের সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ওই যুদ্ধে হাঙ্গেরীর রাজা মারা যান। তারপর অষ্ট্রিয়ার রাজা একই সাথে হাঙ্গেরীর রাজা হয়ে বসেন।



*অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের মানচিত্র, ১৮১৫*

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ দ্বিতীয় সম্রাট হন এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সকল জার্মানদেরকে একত্রিত করে অখণ্ড একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। কিন্তু তার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ত্রিশ বছরের যুদ্ধে (১৬১৮-৪৮) শুরুতে অষ্ট্রিয়ারই লাভ হয়েছে। এতে অষ্ট্রিয়া ক্যাথোলিসিজমের পক্ষে এবং সুইডেন ও ফ্রান্স প্রোটেষ্টানটিজমের পক্ষে লড়াই করে। যুদ্ধ শেষে জার্মান রাজ্যের বাইরে কিছু এলাকা পেয়ে যায় অষ্ট্রিয়া এবং অষ্ট্রিয়ান নেতারা এসব অঞ্চলের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন।

সাংস্কৃতিক দিকে তেমন একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি অষ্ট্রিয়া। তবে সামরিক দিক থেকে সাফল্য এসেছে। পোলিশ রাজা জন সোবিস্কি অষ্ট্রিয়ান ও পোলিশ দল নিয়ে ভিয়েনাকে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সমস্ত হাঙ্গেরী খালি করে ফেলেন এবং দেশটি অষ্ট্রিয়ার অংশ হয়ে যায়।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সম্রাট চার্লস সপ্তম তার একমাত্র কন্যা মারিয়া থেরেসার হাতে পুরো হাপসবুর্গ সাম্রাজ্য তুলে দিতে মনস্থ করেছিলেন। সম্রাটের পদবী যেত তার স্বামী প্রিন্স ফ্রান্সিস অব লোবেনের কাছে।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মারা যাবার কিছুদিন বাদেই প্রুশিয়ার ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট সিলেসিয়া দখল করে বসেন। ফ্রান্স প্রুশিয়ার সাথে যোগ দেয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। এ যুদ্ধের নাম অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। ব্রিটেন মারিয়া থেরেসার পক্ষ নেয় এবং ফ্রান্সের সাথে ডেটিনজেন ও ফন্টেনয়ে লড়াই করে। মারিয়াকে বেশ কয়েকবার পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ ভোগ করতে হয়েছে। তখন এই সুন্দরী, সাহসী রানিটি হাঙ্গেরীর মানুষের কাছে সাহায্য চাইবার জন্যে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে বুদাপেস্টে পৌছেন। হাঙ্গেরীর মানুষ রানির আবেদনে সাড়া দেয় এবং সংক্ষিপ্ত অভিযানে ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে অষ্ট্রিয়া থেকে।

সাত বছরের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩) ফ্রান্স যোগ দিয়েছিল অষ্ট্রিয়ার সাথে, ব্রিটেন সমর্থন জানিয়েছে প্রুশিয়াকে। এ যুদ্ধ ফ্রান্সের জন্যে ভাল ফল বয়ে না আনলেও মারিয়া থেরেসা তার রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ভার ঠিকই হাতে তুলে নিতে পেরেছিলেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মারিয়ার মৃত্যু হলে এই দেশপ্রেমী মহিয়সী নারীর জন্যে গোটা ইউরোপ শোকে আকুল হয়েছে।

মারিয়া থেরেসার ছেলে জোসেফ দ্বিতীয় সিংহাসনে বসেন নানা ঝঞ্ঝাটের মাঝে। অষ্ট্রিয়া তখন কয়েকটি রাজ্য নিয়ে একটি দেশ। এর মধ্যে কয়েকটি রাজ্য আবার পরস্পরের প্রতি তীব্র শত্রুভাবাপন্ন। যেমন একটি ছিল নেদারল্যাণ্ডস, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝখানের একটি দেশ। এদেশের অধিবাসীরা রোমান ক্যাথলিক। আবার বোহেমিয়ার মানুষ ছিল প্রোটেষ্টান্ট। অনেক রাজ্যের ভাষা[illegible]লে আলাদা। তাই জোসেফ যখন তার রাজ্যের সবার প্রতি ধর্ম নিরপেক্ষতা দেখা[illegible] গিয়েছিলেন ওই সময় তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তাকে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কারণ অন্যান্য দেশ ফরাসী রাজা লুই চতুর্দশ ও তার অষ্ট্রিয়ান স্ত্রী, মারিয়া থেরেসার মেয়ে মেরী অ্যান্টিওনেটের গদিচ্যুতির বিরোধিতা করেছিল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ নেপোলিয়ন যৌথ অষ্ট্রিয়ান ও প্রুশিয়ান বাহিনীকে রিভোলিতে পরাজিত করেন এবং অনেকগুলো অস্ট্রিয়ান অঞ্চল তার দখলে চলে আসে।

নেপোলিয়নের হাতে কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি অষ্ট্রিয়াকে। তবে তার পরাজয়ের পরে অস্ট্রিয়াই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার কংগ্রেসে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন বিখ্যাত কূটনীতিক প্রিন্স ম্যাটারনিচ। ইনি ১৮২১ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ছিলেন। তবে ১৮৪৮-এ ভিয়েনার বিদ্রোহে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং একটি কন্সটিউটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়।

একই সময় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে অস্ট্রিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে। হাঙ্গেরীতে এর নেতৃত্বে ছিলেন কোসাথ, ইটালিতে মাসিগনি।

১৮৬০–৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালিয়ান স্টেটগুলো হারিয়ে যেতে থাকে, ১৮৬৭ তে সম্রাট হাঙ্গেরিয়ানদের জন্যে 'হোম রুল' করতে বাধ্য হন। শতাব্দীর বাকি সময়ে বিজ্ঞান ও শিল্প কারখানার উন্নতি ঘটার পাশাপাশি সাংবিধানিক পরিবর্তনও ঘটে চলছিল একের পর এক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অস্ট্রিয়ার মাহাত্ম্য ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় সাম্রাজ্যের পতন ঘটার কারণে। হাঙ্গেরী পরিণত হয় প্রতিনিধি রাজ্যে, পোল্যান্ডের রূপান্তর ঘটে রিপাবলিকে, চেকোশ্লোভাকিয়াও তাই, যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। অস্ট্রিয়া ছোটখাট রিপাবলিকে পরিণত হয়, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি যুক্ত হয় জার্মানীর সঙ্গে। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী জার্মান ফুয়েরার হিটলার এ কাজটি করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং এখনো তা আছে। হাঙ্গেরী ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা পায় এবং জোলটান টিলডিকে তাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। তবে পরের বছরই টিলডি কম্যুনিষ্টদের দ্বারা উৎখাত হন এবং ১৯৪৯-এ সোভিয়েত আদলের সংবিধানের জন্যে ভোট দেয়া হয়। ১৯৫৬ তে হাঙ্গেরিয়ানরা প্রচণ্ডভাবে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে এবং রাশানদের সাহায্যে সরকারের পতন ঘটায়।

# জাতিতে পরিণত হলো ইটালি

পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের বহু বছর পরেও ইটালি বিভিন্ন শক্তির মাঝে পড়ে বিভাজিত হয়েছে। মধ্যযুগের শেষ নাগাদ (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) এ দেশ বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল যা কখনো স্থানীয় ধনী পরিবারগুলো শাসন করত অথবা বিদেশী শক্তি। শতাব্দী কাল ধরে বিভাজন হওয়া সত্ত্বেও ইটালিয়ানরা সব সময়ই একজন শাসক ও সরকারের অধীনে একত্রিত হতে চেয়েছে। পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয়র ছেলে সিজার বর্গিয়া, ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে এরকম ঐক্য আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। রিফরমেশনের পরে (ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে পোপ-বিরোধী খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিপ্লব) পোপদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলে ইটালির ভৌগোলিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও স্থাপত্যকলায় এ দেশ ছিল বিশেষ একটি নাম।



*ইটালির তিন প্রধান নেতা। বাম থেকে ডানে কাউন্ট কামিল্লো কাভুর, জিউসেপ্পি মাজ্জিনি ও গ্যারিবল্ডি*

জন্মসূত্রে কর্সিকান নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পেনিনসূলা একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। ওয়াটারলু'র যুদ্ধের পরে অস্ট্রিয়া ইটালির বৃহৎ সংখ্যক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ শুরু করে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালিতে একের পর এক বিদ্রোহ সূচিত হয় ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতই। তবে বিদ্রোহগুলো সফল হয়নি এবং অষ্ট্রিয়ায় কঠোরভাবে দমন করা হয় বিদ্রোহ। এক ইটালিয়ান রাজা, সার্ডিনিয়ার ভিক্টর ইমানুয়েল, (সাহসী ও উদার একজন মানুষ) যিনি পিডমন্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন, জনগণকে গণতান্ত্রিক সরকার উপহার দেন। বিপ্লবের বছর (১৮৪৮) এর পরে তার প্রধান মন্ত্রী ও খাঁটি দেশপ্রেমিক কাউন্ট ক্যামিল্লো কাভুর নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা ব্যয় করেন ইটালিয়ান রাজ্যগুলো দিয়ে একটি জাতি গঠন করার কাজে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, তার মৃত্যুর সময়ে এ স্বপ্ন প্রায় সফল হতে চলছিল।

কাভুর নেপোলিয়ান তৃতীয়র সমর্থনে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। ফ্রান্স ম্যাজেন্টা ও সলফেরিনোতে দুটি লড়াইয়ে জয় লাভ করে। পিডমন্ট পারমা ও লম্বার্ডির নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায়। একই সময়ে কেন্দ্রীয় ইটালিয়ান রাজ্যগুলো একত্রিত হতে রাজি হয়ে যায় এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল তুরিনে প্রথম ইটালিয়ান পার্লামেন্ট খুলতে সমর্থ হন।

তবে পাপাল রাজ্যগুলো এ ঐক্যের বিরুদ্ধে ছিল এবং বুরবন পরিবারের একটি শাখা দ্বারা শাসিত সিসিলি ও নেপলসও এর বিরোধিতা করেছে।



*বেনিটো মুসোলিনি, ইটালির ডিক্টেটর।*

ওই সময়, মাজেন্টায় লড়াইতে অভিজ্ঞতা পুষ্ট একটি সেনাবাহিনী গিউসেপ্পি গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে সিসিলিতে হামলা চালিয়ে বসে এবং বুরবনদেরকে বাধ্য করে ইটালিয়ান ঐক্য মেনে নিতে। গ্যারিবল্ডি প্রায় হাজার খানেক লোক জোগাড় করে একটি বাহিনী গঠন করেন। এদেরকে উজ্জ্বল লাল শার্ট পরিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে সমুদ্র পথে, দক্ষিণে সিসিলি অভিমুখে যাত্রা করেন। আশ্চর্য সহজভাবে গ্যারিবল্ডি গোটা দ্বীপ দখল করে নেন। তারপর মেইন ল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জয় করেন নেপলস ও বুরবনদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে এ সাফল্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন কাভুর। তাঁর মাঝখানে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল পাপাল রাষ্ট্র ও গ্যারিবল্ডি। শেষেরজনকে আক্রমণ করলে তার লাভ কি হবে? কাভুর তখন গ্যারিবল্ডি পাপাল রাজ্যে পৌছুবার আগেই ও অঞ্চলে হামলা করে বসেন। ক্যাস্টেলফিডারডোতে সেনাবাহিনী পোপের বাহিনীকে

পরাজিত করে। তারপর নেপলসে রওনা হয় গ্যারবাল্ডির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করার জন্যে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান কাভুর, ততদিনে ইটালির বেশীর ভাগ অংশে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, শুধু ভেনিস আর ভ্যাটিকান রাজ্য ইউনিয়নের বাইরে থেকে গেছে। রোমকে ফরাসী সৈন্যরা নিরাপত্তার জন্যে ঘিরে রেখেছিল। পাঁচ বছর বাদে, কনিগ্রাজে অষ্ট্রিয়া প্রুশিয়ানদের হাতে পরাজিত হলে ভেনিস স্বাধীন হয়ে যায় এবং তক্ষুণি ইটালিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেয়ার জন্যে নির্বাচিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম দখল করা হয় যখন ফরাসী সৈন্যরা ফ্রাঙ্কো- প্রুশিয়ান যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিল।

সঙ্গত কারণেই নতুন ইটালির রাজধানী স্থাপন করা হয় রোমে। এরপর ইটালি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের দিকে নজর দেয়। আধুনিক নৌ বহর গড়ে তোলা হয় এবং আফ্রিকায় শুরু হয়ে যায় নতুন সাম্রাজ্য গঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালি ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে।

যুদ্ধের পরে ইটালি কম্যুনিষ্ট সরকারের হুমকির সম্মুখীন হয়। সাংবাদিক ও বিপ্লবী বেনিটো মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট পার্টি গঠন করেন। এ পার্টি একটি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে যায়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিজমের উত্থানে ভীত রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল তৃতীয় মুসোলিনীকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পরে অবশ্য রাজা ও জনগণ উভয়েই এ জন্যে আফসোস করেছেন।

মুসোলিনী একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ করেন, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সরকার পুরোপুরি তার বশংবদ হয়ে পড়ে। তিনি জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করতে থাকেন। সামরিক শৌর্য প্রমাণ করতে তিনি আবিসিনিয়ায় হামলা চালালেও বিশ্ববাসী ব্যাপারটিকে মোটেই ভাল চোখে দেখে নি। ১৯৩৬ এ মুসোলিনী হিটলারের সাথে একটি চুক্তি করেন। ১৯৩৯-এ তিনি আলবানিয়া দখল করেন এবং ১৯৪০ এর জুনে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অক্টোবরে গ্রীসে হামলা চালান। তবে জার্মান মিত্ররা তাকে সাহায্য না করলে ইটালিয়ান বাহিনীর সর্বনাশ হয়ে যেত।

উত্তর আফ্রিকায় ইটালিয়ান ও জার্মান বাহিনী ব্রিটিশ, কমনওয়েলথ ও মার্কিন বাহিনীর যৌথ হামলায় পরাজিত হয়, ইটালির মেইনল্যাণ্ডেও হামলা হয়েছিল এবং কিছু অংশ মিত্র পক্ষের দখলে চলে গিয়েছিল দ্রুত। রাজা তখন মুসোলিনীকে বরখাস্ত করে নতুন সরকার গঠন করেন এবং মিত্রপক্ষের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। জার্মানরা এরপরে ইটালির যে অংশ মিত্রপক্ষ দখল করতে পারে নি সেখানে মুসোলিনীকে বসায়। তবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গোটা ইটালি মিত্রপক্ষের হাতে চলে আসে।

মুসোলিনীকে একদল গেরিলা তার গোপন আস্তানা থেকে ধরে ফেলে এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। তবে এরপরে ইটালি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং শিল্প কারখানায় সমৃদ্ধ ইটালিকে ইউরোপের শিল্প শক্তিতে পরিণত করে।

# ১৭১৪ থেকে ব্রিটেন

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন দ্বারা স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের সাথে যুক্ত হবার পর থেকে দেশটি ব্রিটেন নামে পরিচিত। ব্রিটেন অস্ট্রিয়ান সাকসেশন ওঅর এ অংশ নিয়ে তেমন সাফল্য না পেলেও সেভেন ইয়ার্স ওঅরে (১৭৫৬-৬৩) অভালই সফলতা লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জিতে রবার্ট ক্লাইভ জয় করে নেন বেঙ্গল বা বাংলা, ১৭৫৯-এ কুইবেকে ফরাসীদেরকে পরাজিত করে কানাডা দখল করেন জেমস উলফ। এডোয়ার্ড হক সমুদ্রে ফরাসী নৌ বহর ধ্বংস করে গোটা আটলান্টিক ব্রিটিশ নৌ বহরের জন্যে মুক্ত করে দেন। পৃথিবীর অপর অংশেও ব্রিটিশ বাহু জয় লাভ করে চলছিল।



*ক্যাপ্টেন নেলসন*

সেভেন ইয়ার্স ওঅর-এর অল্পকাল পরে আমেরিকায় ব্রিটিশদের স্থাপিত উপনিবেশগুলো রাজনৈতিক অধিকার পাবার জন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং শেষতক স্বাধীন হয়ে যায়। ব্রিটিশ নৌ বহর ফরাসীদেরকে একের পর এক পরাজিত করে চলছিল এবং শতক শেষের দিকে ইতিহাসের সেরা নৌ সেনাপতি হোরাশিও নেলসন তার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে আসেন। ১৭৯৮তে তিনি নীল নদের আবুকির বে-তে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করে দিলে ভারতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন নেপোলিয়ন তা ভেস্তে যায়। ১৮০১ এ নেলসন কোপেনহেগেনে আরেকটি নৌবহর ধ্বংস করেন এবং ১৮০৫-এ ট্রাফালগারে ফরাসী ও স্প্যানিশ যৌথ নৌবহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এর ফলে নেপোলিয়ন আর ব্রিটেন আক্রমণ করতে পারেন নি। এক হস্ত বিশিষ্ট, একটি মাত্র চক্ষুর অধিকারী অ্যাডমিরাল নেলসন তার অধীনস্তদের কাছে ছিলেন দেবতার মত। কারণ তার মত সাহসী মানুষ কেউ ছিলেন না। তবে এই মানুষটি তার শেষ বিজয়ের দিন খুন হয়ে যান। নেপোলিয়ন সাগরে সুবিধে করতে না পারলেও জমিনে ইউরোপ তার প্রবল পরাক্রম ঠিকই টের পাচ্ছিল। অবশেষে, ডিউক অব ওয়েলিংটন তাকে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের জুনে, বেলজিয়ামের ওয়াটারলু'র যুদ্ধে পরাজিত করেন।

ব্রিটেনে ১৭১৪ র পরে শিল্প-কারখানায় বেশ উন্নতি ঘটেছিল। ১৭৬৯-এ জেমস্ ওয়াট স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করে ফ্যাক্টরি মেশিনারিতে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন। ড: এড়োয়ার্ড জেনার স্মল পক্সের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিনেশন অবিষ্কার করেন। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সব দিকেই সমৃদ্ধির জোয়ার বইতে থাকে। তবে শিল্পোন্নয়ন বেকারত্বও সৃষ্টি করছিল। কারণ মানুষের চেয়ে মেশিন বেশি কাজ করত। বড় বড় শহরে শ্রমিকদের কাজ থাকলেও বেতন ছিল খুবই কম। পরিবার পরিজন নিয়ে কম বেতনে সংসার চালানো ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। জমিদার আর কারখানার মালিকরা সমস্ত ফায়দা লুটত এবং শ্রমিকদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। ধনী আর গরীবের মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলছিল। শুধু জমির মালিকরাই ভোটাধিকার পেত। আর এরকম অরাজক পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ ঘটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এবং ভোটাধিকার নিয়ে শ্রমিকরা তাই করেছে।



*কুইন ভিক্টোরিয়া, ৬৪ বছর রাজ্য শাসন করেছেন, সঙ্গে দুই নাতি নাতনী, প্রিন্সেস মার্গারেট ও প্রিন্স আর্থার (১৮৮৫)*

উনিশ শতকে ব্রিটিশ সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানীয় সরকার নতুন শক্তি সংগ্রহ করে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। অপরাধ আইন এর সংস্কার করা হয়, মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেয়া হয়, জনসমক্ষে ফাঁসির শাস্তিও রদ করা হয়, দেনার দায়েও কাউকে আর জেলে যেতে হতো না।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোসেফ লেস্টার অ্যান্টিসেপটিক ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সার্জারীর ক্ষেত্রে রীতিমত নাড়া দেন। চার্লস ডারউইন তার বিখ্যাত

বিবর্তন বাদ তত্ত্বে জানান মানুষের আদি পূর্ব পুরুষ ছিল বানর। মাইকেল ফ্যারাডে ইলেকট্রিক মোটর আবিষ্কার করেন। যাতায়াত ও কন্সট্রাকশনে জর্জ স্টিফেন প্রথম স্টীম রেলওয়ে ইঞ্জিন চালু করেন। সাহিত্য ও চিত্রকলাতেও প্রচুর সমৃদ্ধি ঘটে।

এ সময়ে ব্রিটেন শুধু প্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬) জড়িয়ে পড়েছিল। এ সময়ে রাজ্য শাসন করেছেন উইলিয়াম চতুর্থর ভাতিঝি কুইন ভিক্টোরিয়া (১৮৩৭-১৯০১)। তিনি সমাজে নতুন ধরনের আচার বা প্রথার প্রণয়ন করেন এবং রাজ পরিবারের সম্মান পুনরুদ্ধার করেন। তার ছেলে, জনপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় প্রিন্স অব ওয়েলস ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এডোয়ার্ড সপ্তম হিসেবে অভিসিক্ত হন। তার সময়ে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার ছেলে জর্জ পঞ্চম (১৯১০-৩৬) হাউজ অব লর্ডস সংস্কার করেছেন। তিনি ১৯১৪তে জার্মানীর বিরুদ্ধে জাতিকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন যদিও তিনি কাইজারের চাচাত ভাই ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করলেও দেশটি অর্থনৈতিকভাবে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য চাকুরীচ্যুত হয়ে সাধারণদের মত কাজ খুঁজতে বেরোয়। কিন্তু ব্রিটেনে চাকরি তখন ছিল সোনার হরিণ। গোটা পৃথিবীতেই ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শুধু ব্রিটেনেই বেকারের সংখ্যা ছিল কুড়ি লাখেরও বেশি।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে হিটলার জার্মানীর ক্ষমতায় এসে ইউরোপে রাজ্য বিস্তারের মতলব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের ফার্স্ট লর্ড অব দা অ্যাডমিরালটি উইনস্টন চার্চিল জাতিকে হিটলারের মতলব সম্পর্কে সাবধান করে দেন, কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। ১৯৩৮-এ যখন জার্মান একনায়কটি অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে বসেন তখন সবার টনক নড়ে। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ১৯৩৯-এ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নয় মাস বাদে হিটলার পশ্চিম ইউরোপের দিকে ধেয়ে যান। ওই সময় চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বের সবচে' শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েন। এই অসাধারণ মানুষটি, যিনি কূটনীতিক হিসেবে ছিলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, একজন চমৎকার চিত্রকর ও দুর্দান্ত বাগ্মীও ছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সাথে মৈত্রী করে চার্চিল জার্মানী, ইটালি ও জাপানের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেন।

ইউরোপে যুদ্ধ শেষে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসে লেবার গভর্নমেন্ট। তারপর অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ১৯৭৩-এ ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক কম্যুনিটিতে যোগ দেয় ইউরোপের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে। আর এটাই ছিল উইনস্টন চার্চিলের স্বপ্নপূরণ।

# মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম

স্প্যানিশরা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অ্যাজটেক এবং ইনকা সভ্যতাকে ধ্বংস করার পরে একটি সাম্রাজ্য গঠন করে এবং আমেরিকান খনি থেকে মূল্যবান খনিজ তুলে জাহাজযোগে তা ইউরোপে পাঠাতে শুরু করে। অন্যান্য পশ্চিমা ইউরোপীয় জাতিগুলো নিউ ওয়ার্ল্ডে উপনিবেশ স্থাপনে এগিয়ে আসে। এসব দেশের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্স (পর্তুগাল আগেই ব্রাজিলে উপনিবেশ বসিয়েছে) ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ড ভার্জিনিয়ায় ছোট উপনিবেশ স্থাপন করে আর হল্যান্ড নিউ আমস্টার্ডামে, পরবর্তীতে নিউইয়র্ক)। এসব জায়গায় সোনা না পাওয়া গেলেও মহাদেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে যে পরিমাণে সুতা ও তামাক উৎপাদিত হতো তা দিয়েই ওইসব দেশ প্রচুর কামিয়েছে। এসব সুতা ও তামাকের খামারে আগেকার উপনিবেশকারীরা স্থানীয় ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়োগ করত। মাঝে মাঝে নিজেরাও কাজ করত।

প্ল্যান্টেশন বা খামারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে ওখানে কাজ করার মত লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। নতুন লোকের দরকার হয়ে পড়ে। ইউরোপের কিছু ব্যবসায়ী আফ্রিকা থেকে লোক নিয়ে আসে। এরা ছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের স্থানীয় জনগণ। ইউরোপীয় নাবিকরা এদের জোর করে জাহাজে তুলত এবং নির্দয় আচরণ করত। আটলান্টিক পার হয়ে কালো মানুষগুলোকে বিক্রি করে দেয়া হতো শ্বেতাঙ্গ জমিদার ও খামার মালিকদের কাছে। আফ্রিকানরা দীর্ঘ সময়ের জন্যে ক্রীতদাস হিসেবে প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছে।

ফরাসীরা, ইতিমধ্যে যারা কানাডায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, তারা মিসিসিপি নদীর উর্বর উপত্যাকা, পরে যার নামকরণ করা হয় লুইজিয়ান্না, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

১৭৩২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশরা ১৩টি কলোনি গড়ে তোলে। যেসব জায়গায় এসব কলোনি গড়ে তোলা হয় তা ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ার, ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড, কানেক্টিকাট, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ডেলাওয়ার, মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনা ও জর্জিয়া। এসব কলোনির নিজস্ব সরকার ছিল। এসব গভর্নরদের নিয়োগ দিতেন ব্রিটিশ সরকার। কলোনি থেকে কানাডায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্যে রসদ ও সৈন্য পাঠানো ছিল বাধ্যতামূলক। কলোনিতে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য যেমন চা, কাঁচ ইত্যাদির জন্যে কর দিতে হতো।

আমেরিকানদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন সময় বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে কর বসানোর জন্যে। ১৭৭৩ এ চার ওপর কর বসানো হলে কিছু আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে বোস্টন বন্দরে নোঙর করা ইংল্যান্ডগামী চা-র জাহাজে উঠে বসে। তারা সমস্ত চা পানিতে ফেলে দেয়। এ ঘটনা ইতিহাসে 'বোস্টন টি পার্টি' নামে পরিচিত। এ নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে আমেরিকানদের বিরোধ দেখা দেয়। আমেরিকানরা ব্রিটেন থেকে কোন পণ্য আনতে অস্বীকৃতি জানায় যতদিন না বোস্টনের সিভিক রাইটস প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন পর্যন্ত।



*এই তিন [illegible] মানুষ আমেরিকার সংবিধান রচনা করেন (বাম থেকে ডানে) ঃ জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ও টমাস জেফারস।*

আমেরিকানদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভার্জিনিয়ার ভূস্বামী জর্জ ওয়াশিংটন, এর দাদার জন্ম ইংল্যান্ডে। বিট্রিশ কমাণ্ডার জেনারেল হোয়িকে বোস্টন থেকে বের করে নেয়া হয়। আমেরিকানরা স্বাধীনতা ও নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পরিকল্পনা করতে থাকে।

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকানদের মধ্যে ক'জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্যে একত্রে কাজ শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জন অ্যাডামস (১৭৩৫-১৮২২), একজন ম্যাসাচুসেটস আইনজীবী, এবং বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (১৭০৬–১৭৯০), বোস্টনে জন্মগ্রহণকারী কূটনীতিবিদ, লেখক ও বিজ্ঞানী। যিনি কনডাক্টর সহ নানা জিনিস আবিষ্কার করেছেন। আরো ছিলেন টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬), একজন ভার্জিনিয়ান আইনজীবী ও ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্সের প্রধান লেখক। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ার ক'জন নেতার সম্মেলনে ডিক্লারেশন অব ইউনিডপেনডেন্স স্থাপিত হয়। এ

ডকুমেন্টের ওপর ভিত্তি করে এগার বছর পরে আমেরিকার সংবিধান রচনা করা হয়েছে।

১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ জেনারেল জন বার্গয়েন সারাটোগার যুদ্ধে পরাজিত হন। ইনি উত্তরের রাজ্যগুলো থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন। এ যুদ্ধের পরে আমেরিকানরা একের পর এক জয় লাভ করতে থাকে। দু'বছর বাদে ব্রিটিশরা আমেরিকান কলোনিগুলোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং নতুন ইউনাইটেড স্টেস অব আমেরিকা যুক্ত প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে তেরটি রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক নেতার একটি কনভেনশনের আয়োজন করেন এবং আমেরিকান কন্সটিটিউশনের মুসাবিদা মনোনীত করেন। এ সংবিধান গড়ে উঠেছে ফেডারেল পদ্ধতিতে যাতে সদস্য রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকছে। প্রতিটি সদস্য রাজ্যের নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ক্ষমতা রয়েছে। নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী প্রতি চার বছর অন্তর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তিনি সরকারী বিভাগ প্রধানদের নিয়োগকর্তা। কংগ্রেসের রয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। আর কংগ্রেসে আছেন সিনেট (প্রতি ছয় বছর অন্তর জনপ্রিয়তার ভোটে নির্বাচিত দু'জন সদস্য) এবং একটি হাউজ অভ রিপ্রেজেন্টিটিভ (প্রতি দু'বছর অন্তর সকল রাজ্য থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত দু'জন ডেলিগেট)।

প্রাচীন গ্রীসের পরে আমেরিকার সংবিধানকে বলা হয় সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও আলোকিত সংবিধান। ব্রিটিশ সংবিধানের অভিজ্ঞতা থেকেও এ সংবিধান কিছুটা ধার করেছে।

কনভেনশনের ডেলিগেটরা জর্জ ওয়াশিংটনকে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। তিনি ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেন এবং দ্বিতীয়বারের (১৭৯৩-৭) মত আবার নির্বাচিত হন। এই চুপচাপ স্বভাবের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী মানুষটি যুদ্ধের সময় বেশিরভাগ আমেরিকানের মন জয় করে নিয়েছিলেন। সংবিধান রচনায় তার ভূমিকাও ছিল বিরাট। ক্ষমতায় থাকাকালীন ওয়াশিংটনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে তেরটি রাজ্যকে মেল বন্ধনে বাঁধার জন্যে। কারণ রাজ্যগুলোর বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈধতা ছিল।

দ্বিতীয় টার্ম অতিবাহিত হবার পরে ওয়াশিংটন আবার প্রেসিডেন্ট হতে অস্বীকৃতি জানান। তার উত্তরসূরি জন অ্যাডামস ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি একজন দক্ষ কূটনীতিক হওয়া সত্বেও ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে পুনঃ নির্বাচিত হতে পারেন নি। এরপরে আসেন টমাস জেফারসন, সম্ভবতঃ আমেরিকার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম স্টেটসম্যান। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ মানুষটি ভার্জিনিয়ার গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রশাসক হিসেবে ছিলেন দুর্দান্ত। জেফারসন ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে

তিন লাখ পাউন্ডে ফরাসী অঞ্চল লুইজিয়ানা কিনে নেয়ার জন্যে নেপোলিয়নের (তখন কনসাল) সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। জেফারসন প্ল্যান্টেশনের জন্যে ক্রীতদাস আমদানী বন্ধ করে দেন। ১৮০৪-এ তিনি পুনঃ নির্বাচিত হন।

কর্মঠ ও যোগ্য প্রেসিডেন্টদের অধীনে আমেরিকার বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার পঞ্চম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ভার্জিনিয়ান আইনজীবী জেমস মনরো (১৭৫৮-১৮৩১)। ১৮৩১-এ তিনি তার বিখ্যাত মনরো ডকট্রিন পেশ করেন। এর সার কথা ছিল আমেরিকানদের জন্যে আমেরিকা।

১৮২৯-এ সপ্তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দক্ষিণ ক্যারোলিনায় জন্মগ্রহণকারী অ্যান্ড্রু জ্যাকসন (১৭৬৭-১৮৪৫)। তার ছিল বিখ্যাত সামরিক ক্যারিয়ার, ১৮১২-১৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি জাতীয় বীরে পরিণত হন। জ্যাকসনই প্রথম ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন, এর বিপক্ষ দল ছিল রিপাবলিকান। তিনি দ্বিতীয়বারও নির্বাচিত হয়েছেন। তার সময়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমেরিকানদের যুদ্ধ লেগেই ছিল আমেরিকার পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার শুরু করার কারণে।

ব্রিটেনে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করে। উইলিয়াম ইউলবারফোর্সের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল এর পেছনে। তার ক্যাম্পেইন আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় অ্যান্টি স্লেভারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সদস্য ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেয়ার আন্দোলনে নেমে পড়েন। নানা ঘটনা তাদেরকে এ কাজে সাহায্য করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হ্যারিয়েট বীচার স্টৌয়ির উপন্যাস আঙ্কল টমস কেবিন। এ বইতে ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়। আরেকজন ছিলেন ড্রেড স্কট নামে একজন নিগ্রো। এর জন্ম ভার্জিনিয়ায়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আদালতে আর্জি পেশ করেন এই বলে তিনি ইলিনয় নামে যে রাজ্যটিতে বাস করছেন সেখানে ক্রীতদাস প্রথা অনুমোদন করে না। কিন্তু বহু বছর আদালতে লড়াই করার পরেও তিনি হেরে যান। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আদালত বলেন ড্রেড স্কাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন এবং তার কোন অধিকারও নেই। এ ছিল চরম অবিচার। আমেরিকানরা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ করেছে।

এ সময়ে আমেরিকায় যে সব প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এসেছেন তারা সকলেই ছিলেন দুর্বল এবং ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো কোন ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম। ফলে ইউনিয়ন ক্রমে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্রীতদাস প্রথার বিপক্ষে ছিলেন। তাদের শিল্প বা বাণিজ্যে ক্রীতদাসদের প্রয়োজনও হতো না। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়া ছিল উষ্ণতর, তাদের

ক্রীতদাসদের দরকার ছিল মূলতঃ প্ল্যান্টেশনগুলোর জন্যে। দক্ষিণে শিল্পায়ন উত্তরের মত সমৃদ্ধ হতে পারেনি, আর তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর।

দক্ষিণীরা ক্রীতদাসদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে উত্তরাঞ্চলের মানুষ এবং শীঘ্রি এ বিষয় নিয়ে দুপক্ষই বিস্ফোরণ্মুখ হয়ে ওঠে। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রীতদাসদের জন্যে সমবেদনা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ মোটেই সুনজরে দেখত না। তারা হুমকি দেয় ইউনিয়ন থেকে চলে যাবে।

এই বিক্ষুব্ধ সময়ে একজন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি আব্রাহাম লিংকন। কেন্টাকিতে জন্ম নেয়া দৃঢ় চরিত্রের, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এ আইনজীবীটি ক্রীতদাস প্রথার যেমন বিরোধী ছিলেন, তেমনি চাইতেন না ইউনিয়ন ভেঙে যাক। তাকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়।

এ সময় দক্ষিণীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ইউনিয়ন থেকে চলে যাবে। এবং ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম রক্তক্ষয়ী এ গৃহযুদ্ধে সাত লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

ইউনিয়নকে রক্ষার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় লিংকন স্রেফ নিজের চেষ্টায় দক্ষিণীদেরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং তাদের মিত্রসঙ্ঘ ভেঙে দেন। দক্ষিণীরা দৃঢ় সংকল্প ও সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের দুই জেনারেল রবার্ট ই লী ও 'স্টোনওয়াল জ্যাকসন'-এর নেতৃত্বে কয়েকটি লড়াইয়ে জয়লাভও করে। তবে উত্তরের রসদের পরিমাণ ছিল দক্ষিণের চেয়ে অনেক বেশি। শেষে উত্তরেরই জয় হয়। লী ইউনিয়ন জেনারেল ইউলিসিস এস গ্রান্টের কাছে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল, ভার্জিনিয়াতে আত্মসম্পর্ণ করেন।

যুদ্ধটা মূলতঃ হয়েছিল দক্ষিণের মাটিতে এবং এতে দক্ষিণীরা গরিব হয়ে যায়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে লিংকন ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং দক্ষিণের ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুদেরকে ছেড়ে চলে যায়।

বিরুদ্ধপক্ষের আত্মসমর্পণের পাঁচদিন পরে ওয়াশিংটনের একটি থিয়েটারে বসে নাটক দেখার সময় গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হয়ে যান লিংকন। গুপ্তঘাতক ছিল দক্ষিণী অভিনেতা উইলকস বুথ, উত্তরের বিজয়ীদের প্রতি তীব্র প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল সে। এটা দক্ষিণের জন্যে দুঃখজনক ব্যাপারই ছিল। কারণ উত্তরের সঙ্গে সখ্যতা করার সুযোগ তারা হারিয়ে ফেলে।

# বহির্বিশ্বে ব্রিটেনের কর্তৃত্ব

অন্যান্য পশ্চিমা ইউরোপীয় জাতির মত ব্রিটেনও উপনিবেশ বিস্তারের কৌশল গ্রহণ করেছিল। আর বাণিজ্য করার নামে যে সব দেশে ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে ছিল কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত।

**কানাডা**

প্রকাণ্ড এই দেশ, যার বিরাট একটি অংশ স্থায়ীভাবে বরফে ঢাকা থাকে, প্রথম আবিষ্কার করেন জন ও সেবাস্টিয়ান ক্যাবট, এরা ইংল্যান্ডের সপ্তম হেনরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিস্টল থেকে সমুদ্র অভিযানে নেমে পড়েন। তারা নোঙর করেন নিউফাউন্ডল্যান্ডে এবং দখল করে নেন পূর্ব উপকূল। এই সময় কানাডার আকার সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। ১৫৩৫-এ ফরাসী নাবিক জ্যাঁ কার্টিয়ার সেন্ট লরেন্স নদীতে একটি জাহাজ নিয়ে পৌঁছুলেও ওখানে কোন উপনিবেশ নির্মাণ করেন নি।



*জাঁ কার্টিয়ার ১৫৩৬-এ কানাডার সেন্ট লরেন্স নদী আবিষ্কার করেন। এখানে বন্ধুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।*

সতের শতকের প্রথম দিকে আরেক ফরাসী, স্যামুয়েল ডি চ্যাম্পলেন সেন্ট লরেন্সের তীরে কুইবেকে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন এবং আল গোনকুইন ইন্ডিয়ানদের সাথে গড়ে তোলেন বন্ধুত্ব। এই ইন্ডিয়ানরা এক সময় যে অঞ্চল দখল করে থাকত তা বর্তমানে আমেরিকার উত্তর পূর্বাঞ্চল। কিন্তু তাদেরকে ওই এলাকা থেকে বিতাড়িত করে যুদ্ধবাজ ইরোকুইস ও মোহাকরা। চ্যাম্পলেন কুইবেকের নাম দিয়েছিলেন 'নয়া ফ্রান্স'। লুই চতুর্দশের আমলে ওখানে একটি কলোনি স্থাপন করা হয়।

হ্যাডসন বে তে ইংরেজরা পাহারা বসালে ফরাসীদের সাথে তাদের বিবাদ শুরু হয়ে যায়। এ কাজটি করেছিলেন বিখ্যাত অভিযাত্রী হেনরী হাডসন। অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলের অনেকখানি নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে, কুইবেকের কাছে হাইটস অব আব্রাহামে, জেনারেল জেমস উলফ জেনারেল লুই মন্টাকামকে পরাজিত করে ফ্রান্সের কাছ থেকে গোটা কানাডা দখল করে নেন। তবে ব্রিটিশরা কানাডিয়দের কাছে জনপ্রিয়তা পায়নি। একটি কানাডা অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশটিকে দুটি প্রদেশে ভাগ করে ফেলা হয়, অন্টারিও (আপার কানাডা) ও কুইবেক (লোয়ার কানাডা) কুইবেকের অধিবাসীরা ফরাসী ভাষী ছিল এবং তাদের কিছুটা অংশ ছিল স্বায়ত্তশাসিত।

১৮৬৭ তে গঠিত হয় ডোমিনিয়ন অব কানাডা, কিছুদিনের মধ্যে বাকি সকল ডোমিনিয়নে যোগ দেয়। ১৯৩১ থেকে কানাডা স্বাধীন স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল বলে শিল্প ও কৃষিতে প্রভূত উন্নতি করে এবং এ দেশটি এখনো বিশ্বের অভিবাসীদের জন্যে অন্যতম আকর্ষণীয় দেশ।

## অস্ট্রেলিয়া

সতের শতক পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া একেবারে অচেনা একটি মহাদেশ ছিল বিশ্ববাসীর কাছে। মুসলিম আরব নাবিকরা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালালেও অস্ট্রেলিয়ার ধারে কাছেও যায়নি। এদেশে ছিল আদিবাসী এবং এখনো আছে। এদের অনেকেই প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর।

১৬০০ শতকের প্রথম দিকে ডাচ নাবিকরা মহাদেশটির উত্তর দিকে নোঙর করে। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ পুরো উত্তর উপকূল চলে আসে চার্টে। এ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ নেভিগেটর উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার উত্তর উপকূলে পৌঁছেন।

সত্তর বছর পরে ইতিহাস বিখ্যাত নেভিগেটর ক্যাপ্টেন জেমস কুক পূর্ব উপকূলকে সামুদ্রিক মানচিত্রে স্থান দেন। এবং পূর্ব উপকূলের নামকরণ করেন বোটানি বে। কুকের সহকারী জোসেফ ব্যাঙ্কস ওখান থেকে বোটানি বা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অনেক অজানা নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এ আবিষ্কারের পরে এখানে

দ্রুত উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়, ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেন এটি হবে পেনাল কলোনি। মানে ব্রিটেনের অপরাধীদেরকে এখানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হত।

অস্ট্রেলিয়ার জীবনযাত্রা ছিল খুব কঠিন এবং বিস্তার ছিল মন্থরগতির। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এ মহাদেশ পাঁচ লক্ষ ইউরোপীয় অধিবাসীতে ভরে যায় যার নব্বুই ভাগ ছিল ব্রিটিশ। এদের ছ'টি উপনিবেশ ছিল নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও তাসমানিয়ায়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে সোনা পাওয়া গেলে শুরু হয়ে যায় স্বর্ণ অভিযান। স্বর্ণাভিযানকারীদের আগমনের কারণে জনসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যায়। শীঘ্রি একটি সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশদের সহায়তায় গঠিত হয় সরকার। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে দু'টি এলাকা, প্রতিটিতে ছিল স্বায়ত্তশাসিত সরকার, মিলে গড়ে তোলে কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশ।

অস্ট্রেলিয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধেই সাহসের সাথে লড়াই করেছে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দার্দানেলসে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম মরুভূমি ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়।

### নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন এক ডাচ নাবিক টাসমান। তিনি হল্যান্ডের জিল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। জিল্যান্ডের প্রকৃত অধিবাসী ছিল পলিনেশিয়ানরা যারা তের শতকে তাহিতি থেকে ওখানে আসে। এই পলিনেশিয়া নিউজিল্যান্ডে মাওরি নামে পরিচিত ছিল। এরা তখনো ওখানে ছিল এবং ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের সঙ্গে মিশে যায়।

টাসমান উপনিবেশ স্থাপন করেন নি। কুক ওই দ্বীপে যাবার পরে ব্রিটিশরা ওই অঞ্চল সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ানরা ওখানে উনিশ শতকের প্রথম দিকে অভিযান চালায় এবং ১৮৪০-এ ব্রিটিশ সরকার সরাসরি দ্বীপগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

চাষাবাদের জন্যে চমৎকার আবহওয়া নিউজিল্যান্ডের, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মেষ পালনের দেশও এটি। এ দেশের সন্তান আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ। ১৯১৯-এ তিনিই প্রথম অ্যাটম ভেঙে বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেন।

### দক্ষিণ আফ্রিকা

পনের শতকের মাঝামাঝিতে পর্তুগীজ জাহাজীরা দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করে এবং মানচিত্রে একে স্থান দেয়। বার্থোলোমিউ ডিয়াজ উত্তমাশা

অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন ও কিছুদিন পরে কেপ অব গুডহোপের কাছে একটি পর্তুগীজ অবতরণ স্থল নির্মাণ করা হয়। সতের শতক নাগাদ ইউরোপীয়রা এখানে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে। ডাচ অভিবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন জীবন শুরু করে এবং তারা কেপ টাউন স্থাপন করে। পরবর্তী দেড়শ বছরে প্রচুর সংখ্যক ডাচ চলে আসে এ দেশে। এদের বেশিরভাগ পেশায় ছিল কৃষিজীবী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার চমৎকার আবাহাওয়ায় চাষাবাদ করে তারা পয়সাপাতির মুখ দেখে।

১৮২০-এ প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশকারীদের আগমন ঘটে আলগোয়া বেতে (পোর্ট এলিজাবেথ)এবং বেশ দ্রুত তারা এ অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ডাচদের সঙ্গে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে এবং ব্রিটিশরা ডাচ কৃষকদেরকে উৎখাতের চেষ্টা করে। ব্রিটিশদের অবিরাম অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে অবশেষে ১৮৩৬-এ ডাচরা (বোয়ের নামে পরিচিতি) পাহাড়ে চলে যায় নিজেদের পছন্দানুযায়ী একটি প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্যে। এবং তারা যে রাজ্য গড়ে তোলে তার নাম গ্রেট ট্রেক।

নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বোয়েরদের সঙ্গে ওখানে বসবাসকারী আফ্রিকান উপজাতি বান্টুদের সংঘর্ষ হয়। তবে সবচে' ভয়ংকর ছিল জুলুরা। দীর্ঘ সময় ধরে জুলুরা বোয়েরদের জীবন নরক করে রেখেছিল। অবশেষে বোয়েররা ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিনিময়ে ব্রিটিশদেরকে তাদের কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। জুলুদেরকে দমন করা খুব কঠিন কাজ ছিল। তবুও কঠিন কাজটি সম্পন্ন হবার পরে বোয়েররা আশা করেছিল ব্রিটিশরা তাদের অঞ্চল স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি দেখে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রথম বোয়ের যুদ্ধে তারা কিছুটা সাফল্য অর্জনও করে। লণ্ডনে সরকার পরিবর্তন হলে গ্ল্যাডস্টোন বোয়েরদেরকে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। তবে পরে আবার তা ফিরিয়ে নেয়া হয়। এ নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে বোয়েরদের সংঘর্ষ চলতেই থাকে। এবং ১৮৯৯তে দ্বিতীয় বোয়ের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

প্রথম দিকে বোয়েররা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। এক হপ্তার মধ্যে তারা তাদের তিনটি শহরে ব্রিটিশ বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে দেয়। কিন্তু লর্ড রবার্টস ও লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে বোয়েররা পরাজিত হয় ও শান্তিচুক্তি মেনে নেয়। এতে বোয়ের অঞ্চল ব্রিটিশ প্রদেশের সাথে যুক্ত হয়ে যায় ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ইউনিয়ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজ্যে পরিণত হয়।

বৃটেনের বিরুদ্ধে যে বোয়ের নেতারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্যান ক্রিস্টিয়ান স্মুটস ও ক্রিস্টিয়ান ডি ওয়েট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্মুট ব্রিটিশদের

পক্ষে যোগ দেন তবে ওয়েট সমর্থন জানান জার্মানদেরকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকান সৈন্যরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতই সাহসের সাথে লড়াই করে স্মুটসের নেতৃত্বে। তিনি তখন ফিল্ড মার্শাল। ১৯৩৯-এ স্মুটস দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী বনে যান। তবে ১৯৪৮ এর ভোটে তার দল পরাজিত হয় এবং স্মুটস তার আসন হারান। এ সময় ক্ষমতায় থাকা শ্বেতাঙ্গ সরকার পৃথকীকরণ নীতির কথা ঘোষণা করে– অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান জাতির জন্যে আলাদা উন্নয়ন। ১৯৬১তে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ও প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

**ভারত**

চার হাজার বছরের সুসভ্য দেশ ভারত পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হবার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পদানত হয়ে যায়। ফরাসীরা তাদের কর্তৃত্ব হারায় এবং ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ গোটা ভারতবর্ষ সরাসরি শাসন করতে থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ব্রিটিশদের শাসনামলের পুরো সময়টাতেই চলেছে বিদ্রোহ। ১৮৫৭-৮তে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল এর অন্যতম। এ বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক ছিল।



*জওহরলাল নেহরু, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।*

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের কাছে বারবার মার খেয়ে এবং মার দিয়ে বুঝতে পারে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের জাতিগত ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়া যাবে না। ভারতে ব্রিটিশরা একটি সুদক্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছিল যার সাহায্যে গোটা এশিয়ায় তারা আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। এ বাহিনী দুটি বিশ্বযুদ্ধেই ব্রিটেনের পক্ষে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে। ইনি ছিলেন শিক্ষিত এক হিন্দু আইনজীবী। গান্ধীজী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩০ এর দশকে ব্রিটিশরা যখন স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা শুরু করে ওই সময় জার্মান ভীতি এ আলোচনার জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ব্রিটিশরা ভারতীয়দেরকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় তীব্র আন্দোলনের মুখে। ১৯৪৭- এ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে যায়। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিমরা পেয়ে যায় পশ্চিম ভারত ও বাংলা, সৃষ্টি হয় নতুন দেশ পাকিস্তান আর জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে হিন্দুরা পেয়ে যায় বাকি অংশ। দেশ বিভাগের পরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৫তে যুদ্ধ বেধে যায়। তবে এ যুদ্ধ ছিল স্বল্পকালীন ও মীমাংসাহীন।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লে বাঙালিও রুখে দাঁড়ায়। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ নামে বিশ্ব মানচিত্রে গর্বের সাথে স্থান লাভ করে।

# রাশিয়ার গল্প

মধ্য যুগে মাস্কোভি নামে ছোট একটি রাজ্য ক্রমে বর্ধিত হয়ে চলছিল বর্তমানে যা মস্কো নামে পরিচিত। তবে এর উন্নয়নের গতি বাধা পায় চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান ও তৈমুর লং-এর শাসনের কারণে। পনের শতকে মোঘল ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে মাস্কোভির সাথে আরো অঞ্চল যুক্ত করেন।

প্রথম শাসক ছিলেন আইভান তৃতীয় (১৪৬২-১৫০৫), তার স্ত্রী শেষ বাইজানটাইন সম্রাট কন্সটান্টিন নবমের আত্মীয়, ক্রেমলিন নির্মাণ শুরু করেন। বড় বড় টাওয়ার, গম্বুজ, প্রাচীর ও ব্যাটলমেন্ট নিয়ে এ মহানগর গড়ে ওঠে। ক্রেমলিন শতাব্দী কাল ধরে ছিল রাশিয়ার সরকারের অফিস ও ইউরোপীয় এবং পাশ্চাত্য স্থাপত্যের সময়ের সেরা উদাহরণ।



*আইভান চতুর্থ (১৫৩৩-৮৪), রাশিয়ার জার, আইভান দ্য টেরিবল নামে সমধিক পরিচিত, টাটার দুর্গ দখল করেছেন।*

১৫৩৩ এ আইভানের পৌত্র, আইভান চতুর্থকে (১৫৩৩-৮৪), শৈশবেই সিংহাসনে বসানো হয়। বড় হবার পরে তিনি জার (জুলিয়াস সিজারের নাম থেকে এ উপাধি গ্রহণ করা হয়) উপাধি গ্রহণ করেন। আইভান চতুর্থ মাস্কোভি বা রাশিয়াকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন এবং রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন উরাল পর্বত থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। তিনি রাশিয়াকে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত করতে ইংল্যান্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ফ্রান্স ছাড়াও এশিয়া মাইনর ও

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ছাপাখানা বসিয়েছিলেন এবং রাশান ভাষাকে আধুনিক করে তুলেছেন।

তবে মুদ্রার অপর পিঠে আইভান অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের সম্রাট ছিলেন যিনি প্রয়োজনে যে কাউকে কোতল করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তিনি এমনই নির্দয় ছিলেন যে তার নামই হয়ে গিয়েছিল আইভান দ্য টেরিব্‌ল্‌। পশ্চিমা দেশগুলো তার নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করত। তাই তার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইত না। যদিও আইভান রাশিয়াকে জাতীয়তা দিয়েছিলেন এবং দেশটির মধ্যে সাংস্কৃতিক আবহের সঞ্চার করেছিলেন।

তবে রাশিয়ার দুর্ভাগ্য আইভানের উত্তরসুরিরা ছিলেন দুর্বল ও অনগ্রসর। ফলে দীর্ঘ একটা সময় দেশটিতে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। আইভানের অনেক কাজই অসমাপ্ত থেকে যায়।

১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে এক তরুণ রাশান নোব্‌ল্‌, মাইকেল রোমানফ নিজেকে জার হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি বত্রিশ বছর শাসন করেছেন এবং এ সময়ে সরকার ও দেশকে নানাভাবে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

মাইকেলের ছেলে আলেক্সেই (১৬৪৫-৭৬) চার্চকে সহযোগিতা করেন এবং দেশকে আইভান দ্য টেরিবলের সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। ধার্মিক স্বভাবের আলেক্সেই মস্কোর ক্যাথেড্রালে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতেন। ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকার কারণে সরকারি কার্যক্রম ভীষণভাবে ব্যাহত হতো। ফলে রাশিয়ার আবার নড়বড়ে দশা শুরু হয়ে যায়।

১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক পিটার দ্য গ্রেট। এ অদ্ভুত মানুষটির দুটি প্রকৃতি ছিল। কখনো তিনি আইভান দ্য টেরিবলের মত প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ও হিংস্র আবার কখনো একজন আলোকিত মানুষ।

পিটার শিশুকালে সিংহাসনে আরোহণ করলে তার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা রাজকার্য সামাল দিয়েছেন। তবে বড় হবার পরে পিটার নিজেই নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেন (১৬৮৯)। রাশিয়াকে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিটার সমস্যাগুলো বিভিন্নভাবে সমাধান করেছেন। প্রথমেই তিনি নোবলদের ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়েছেন তাদের জমিজমা দখল করে এবং অত্যাচার করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নোব্‌ল্‌রা লম্বা দাড়ি রাখতেন। পিটারের নির্দেশে সবার দাড়ি কেটে ফেলতে হয়েছে। তারপর তিনি দাড়ির ওপর ট্যাক্স বসিয়েছেন। পিটার রাজ প্রহরীদের ক্ষমতাও হ্রাস করেন কারণ তারা নিজেদেরকে প্রাচীন রোমের প্রিটোরিয়ান গার্ডদের মত কেউকেটা ভাবত।

রাশানদেরকে ইউরোপীয় সভ্যতার আঁচলে নিয়ে আসার জন্যে পিটার তাদেরকে ইউরোপীয় পোষাক, আচরণ, নৃত্য বিনোদন ইত্যাদির সাথে পরিচিত

করে তোলেন। তিনি মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি দমন করেন এবং সুশিক্ষার প্রতি নজর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রচুর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পিটার দ্য গ্রেট রাশান বাহিনীকে নিয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি নতুন অঞ্চল দখলে আনেন। বাল্টিকের তীরে, উত্তরে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ নির্মাণ করেছেন। ১৭২৫-এ পিটারের মৃত্যুর পরে রাশিয়া নিজেকে আরো বিস্তৃতি করে চলছিল ইউরোপের সাধারণ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্যে।

পিটার দ্য গ্রেটের অন্যতম উত্তরসুরি ক্যাথেরিন (দ্বিতীয়) দ্য গ্রেট জারিনা ১৭৬২-৭৬)। এই মহিয়সী নারী ছিলেন একজন জার্মান রাজকন্যা, বিয়ে করেন জার পিটার তৃতীয়কে এবং সম্ভবতঃ স্বামীকে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন। তার অধীনে অত্যন্ত চতুর ও ধূর্ত একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রিন্স পটেমকিন ও কাউন্ট অরলফ। রাশিয়া প্রথম (১৭৭২), দ্বিতীয় (১৭৯৩) ও তৃতীয় (১৭৯৫) পার্টিশন চুক্তিতে পোল্যান্ডের বিরাট একটি অংশ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে। অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াইতে ক্যাথেরিন নতুন ভূমি দখল করেন।



*পিটার দ্য গ্রেট। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্যে রাশিয়াকে উৎসাহিত করে তোলেন।*

ক্যাথেরিন সিভিল সার্ভিসকে পুনগঠিত করেছেন, দেশকে ভাগ করে দিয়েছেন গভর্নরশিপের আদলে। অনেক শহরেই স্বায়ত্ত্বশাসনের সুযোগ দেন তিনি। তার দরবার হয়ে উঠেছিল শিক্ষা ও কলা, বিশেষ করে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। তার দরবারে ফরাসী ভাষাও চলত এবং জারিনা নিজে ভলতেয়ার ও ডিডেরোটের সঙ্গে পত্র বিনিময় করতেন।

তবে সামন্তবাদের শিকার প্রজাদের কল্যাণে ক্যাথেরিন কিছুই করেননি। ১৭৭৩-এ বড় ধরনের বিদ্রোহ সূচিত হয় এমিল পুগাচেভের নেতৃত্বে। বলা হয় ইনি জারিনার স্বামী পিটার তৃতীয়র হত্যাকারী। পুগাচেভের দারুণ সামরিক সামর্থ্য ছিল এবং রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করে বিরাট একটি অঞ্চল তিনি দখল করে

নেন। তবে ১৭৭৫-এ তিনি পরাজিত হন এবং তাকে হত্যা করা হয়। ক্যাথেরিন বিদ্রোহী প্রজাদের (কৃষক) সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন।'

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যাথেরিনের মৃত্যুর পরে রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গঠিত মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। তবে ১৮০৫-এ অস্টারলিজে এবং ১৮০৭-এ ফ্রিডল্যান্ডে পরাজয় বরণ করে। টিলসিটে শান্তি স্থাপিত হলেও নেপোলিয়ন জারের সাথে বিবাদ করে তার শক্তিশালী ছয় লাখ গ্রান্ড আর্মি নিয়ে ধাবিত হন রাশিয়ার দিকে। বোরোডিনোতে রাশিয়ানদেরকে পরাজিত করে ঢুকে পড়েন জনশূন্য মস্কোতে। ওই সময় রাশিয়ায় প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলে প্রকৃতির কাছে কাবু হয়ে পড়ে ফরাসী সেনারা। তারা বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে আসে দেশে।

ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরে রাশানরা ফিরে আসে স্বভূমে। জার একনায়কতন্ত্রের মত শাসন করতে থাকেন এবং জমিদার ও কৃষকদের মাঝে দূরত্ব ক্রমে বেড়েই চলে। ১৮৬১তে আলেকজান্ডার দ্বিতীয় সার্ফডোম বা কৃষকগিরি প্রথা বিলুপ্ত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েও ব্যর্থ হন। ১৮৮১তে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন তিনি।



*কার্ল মার্ক্স, জার্মান দার্শনিক, যার মতবাদ অনুসরণ করে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয়।*

সার্ফডোম বিলুপ্ত হলেও তাতে কৃষকদের কোন উপকার হয়নি। কারণ তখন যে জমি তাদেরকে কিনতে হতো তার দাম ছিল অত্যধিক। তখন 'নাইলিজম' নামে একটি মতবাদের জন্ম হয়। এতে সব কিছুতেই অবিশ্বাস করা হতো এবং ছিল সর্বাত্মক ধ্বংসকামী মনোভাব। কিন্তু কে কি করবে কি চাইবে সে ব্যাপারে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না কারো।

নাইলিজম জন্ম দেয় সন্ত্রাসবাদের। জনতার ভিড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে বোমা। কারখানায় লাগাতার শুরু হয়ে যায় ধর্মঘট। জার আলেকজান্ডার তৃতীয় (১৮৮১-৯৪) এবং তাঁর উত্তরসূরি নিকোলাস দ্বিতীয় (১৮৯৪-১৯১৭) দু'জনেই দমন নিপীড়নের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করতে চেয়েছিলেন। তবে নিকোলাস একই সাথে দেশের অবস্থার উন্নতিও কামনা তিনি করতেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন, রাস্তা তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীগুলো ছিল হয় দুর্নীতিবাজ নয়তো অকর্মার ধাড়ি। ১৯০৫-এ রাশান আর্মি জাপানীদের কাছে যেবার মার খায় ওই বছরই ব্যাপক আকারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিলেও টানেনবার্গে সাংঘাতিক মার খায়। ব্রুশিলভের মত সেনাপতিরা অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও ঘরের পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। ১৯১৭ তে নিকোলাস সিংহাসনচ্যুত হন। জার ও জারিনা তখন রাসপুটিন নামে এক আশ্চর্য সন্ন্যাসীর জাদুতে মুগ্ধ। এই লোকের হাতের পুতুল বনে গিয়েছিলেন তারা। রাসপুটিন যা বলতেন তাই শুনতেন দু'জনে। যদিও রাসপুটিনের সমস্ত পরামর্শ ধ্বংসাত্মক ফল বয়ে আনত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন রাসপুটিন। আলেকজান্ডার কেরেনেস্কির নেতৃত্বে একটি মধ্যপন্থী সরকার গঠন করা হয়।

কেরেনেস্কির আমলে তার বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দেন ভই লেনিন ও লিওন ট্রটস্কি। ১৯১৭র অক্টোবরে তারা মধ্যপন্থী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রোলিতারিয়েত বা গরীবদের সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। তারা জার্মানীর সাথে আলাদাভাবে শান্তি স্থাপন করে যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেন। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক আদলে একটি নতুন কমুনিস্ট রাষ্ট্র গড়ে তোলা। বিশ্ববাসী বিস্ময় এবং আতঙ্ক নিয়ে লক্ষ করে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই জার এবং তার পরিবারকে হত্যা করেছে (১৯১৮)।

লেনিনের মতবাদ গড়ে উঠেছিল কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা নিয়ে। তিনি ছিলেন কমুনিজমের প্রবক্তা। লেনিন প্রতিষ্ঠা করেন ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক। ১৯২৭-এ লেনিনের মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় বসেন জোসেফ স্ট্যালিন। ইনি গোটা রাশিয়ায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। ১৯৩৬ নাগাদ স্ট্যালিন হন রাশিয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।



*লেনিন (বামে) স্ট্যালিনের সাথে। তার অন্যতম সহযোগী, মস্কোতে শ্রমিক ও সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন।*

১৯৩৯-এ অ্যাডলফ হিটলারের সাথে একটি অনাক্রমণ চুক্তি করেন। হিটলার তখন পোল্যান্ডে হামলা চালিয়েছেন। এবং নভেম্বরের মধ্যে প্রায় গোটা দেশ দখল করে নিয়েছেন। এর ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দুই বছর পরে, অনাক্রমণ চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে হিটলার প্রচণ্ড হামলা চালান রাশিয়ায় এবং প্রায় দশ মাইল এলাকা দখল করে মস্কোর কাছাকাছি পৌছে

যান। রাশানরাও রুখে দাঁড়ায়, অসীম বীরত্বের সাথে তারা লড়াই করে এবং অবশেষে জার্মানদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

১৯৪৫ -এর ফেব্রুয়ারিতে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টাতে স্টালিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে নিয়ে জার্মানীর ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে আলোচনায় বসেন। সিদ্ধান্ত রাশানদের অনুকূলেই গিয়েছিল। গ্রীষ্মে যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া ইউরোপে কম্যুনিস্ট সরকার বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে। তারা গোটা পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিস্ট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাশিয়া ক্রমে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানে সে খুবই উন্নতি করে, মহাশূন্যে রকেট পাঠায়, অসাধারণ সব সমরাস্ত্র নির্মাণ করে। এক সময় রাশিয়া হয়ে ওঠে বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি (অপরটি বলাবাহুল্য আমেরিকা)। আমেরিকা কম্যুনিজমের বিস্তার সন্দেহের চোখে দেখত বলে রাশিয়ার সাথে তার দীর্ঘ একটা সময় 'ঠাণ্ডা লড়াই' চলেছে। তবে তীব্র শংকা ও সন্দেহের সেই যুগের অবসান ঘটেছে আরো দেড় দশক আগে গর্বাচেভের গ্লাসনস্ত ও পেরোস্ত্রোইকা মতবাদের কারণে। এর ফলে বিশাল সোভিয়েত ভেঙে টুকরো হয়ে গেলেও রাশিয়াকে এখনো সকলে সমীহের চোখেই দেখে, এমনকি বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকাও।

# দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জাতীয়তাবাদ

কন্সটান্টিনোপলের পতনের পরে এবং পূর্ব ইউরোপে অটোমান শক্তির বিস্তৃতিতে সেখানকার বহু মানুষের মাঝে বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী চেতনা অদৃশ্য হয়ে থাকে অনেক দিন। তবে উনিশ শতকে অটোমান শাসকরা সাম্রাজ্যের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করলে নতুন নতুন রাজ্যের উদ্ভব ঘটতে থাকে। সেই সাথে হয়ে যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বৃহৎ শক্তিগুলোর মাঝে বলকান এলাকা রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। পূর্বের অর্থডক্স চার্চ বাইজেনটিয়াম থেকে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং কাছের বলকান রাজ্যগুলো খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

## গ্রীস

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে শুরু হওয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের মাঝ দিয়ে গ্রীস তার স্বাধীনতা লাভ করে। গ্রীস তখন শাসন করতেন অটো নামে এক বাভারিয়ান যুবরাজ। ত্রিশ বছর দেশ শাসনের পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে এক ডেনিশ যুবরাজ, রাজা জর্জ প্রথম নামে নির্বাচিত হন। তিনি পঞ্চাশ বছর দেশ শাসন করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রীস একটি ব্যাট্‌ল্ গ্রাউন্ড বা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এরপরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলেও ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে আবার তার আবির্ভাব ঘটে জর্জ দ্বিতীয়র অধীনে। ১৯৪০-এ মুসোলিনি গ্রীস আক্রমণ করেন এবং এক বছর বাদে জার্মানরা দেশটি দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯৬৭তে তরুণ গ্রীক রাজা কন্সটান্টটাইনকে বিতাড়িত করে সেখানে সামরিক শাসনতন্ত্র জাঁকিয়ে বসে। তবে এই শাসনতন্ত্রও বেশিদিন টেকেনি। প্রধানমন্ত্রী কন্সটান্টিন কারামানলিস ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতায় বসেন।

## রুমানিয়া

রুমানিয়ানরাও তাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে রুমানিয়াকে তুর্কীরা স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার অধীনে স্বীকৃতি দেয়। তবে রুমানিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রুমানিয়ানরা ট্রানসিলভেনিয়াকে তাদের রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুযোগ পায় দেশটির খনি ও তেলসহ। রুমানিয়ায় রাজতন্ত্র চললেও দেশে প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন ক্ষমতাবান। তারা ছিলেন প্রো-জার্মান এবং জেনারেল আন্টোনেস্কুর নেতৃত্বে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পক্ষ নেন এবং রাশিয়ান ফ্রন্টে লড়াই করার জন্যে সেনা পাঠান। যুদ্ধ শেষে রুমানিয়া নতুন ধরনের সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর তা ছিল কম্যুনিস্ট সরকার, রাশিয়ার সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।

## বুলগেরিয়া

দশম ও একাদশ শতকে বুলগেরিয়া একটি শক্তিশালী দেশ ছিল, তারপর বাইজানটাইন সাম্রাজ্য একে দখল করে নেয়। পঞ্চদশ শতকে বুলগেরিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায় এবং চারশো বছর তারা চুপচাপ থাকে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীরা বুলগেরিয়ানদেরকে নিজেদের আলাদা গির্জা নির্মাণরে অনুমতি দেয়। এতে পূর্ণ স্বাধীনতা আদায়ে জাতীয়তাবাদীরা উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৮৭৬ এ তুর্কীরা নিষ্ঠুরভাবে এ আন্দোলন দমন করে। এতে ইউরোপ জুড়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং রাশিয়া ও তুরস্কের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পরবর্তীতে শান্তি আলোচনায় বসে দুটি দেশ, বুলগেরিয়ার উত্তর অংশে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত নেতা স্তেফান স্টামবুলফের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ানরা তাদের অবশিষ্ট রাজ্য ফিরে পায় তুর্কীদের কাছ থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষ নিয়ে দারুণভাবে পরাজিত হয়। রাজা বোরিসের (১৯১৮-৪৩) নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র চলতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া আবারও জার্মানীর পক্ষ নেয়। দেশটি রাশানরা দখল করে এবং ১৯৪৬ এ গিওর্গি দিমিত্রফের অধীনে সেখানে কমুউনিস্ট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

## সার্বিয়া

সার্বিয়া একদা মধ্যযুগীয় রাজ্য ছিল, তবে এর জাতীয় মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয় ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে, কসোভোয় তুর্কীদের হামলায়। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা দেয়া হয় সার্ভদেরকে এবং ১৮৭৭-এ তারা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ১৯০৩ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দেশটি শাসন করেন কঠিন স্বভাবের এক জনপ্রিয় রাজা পিটার কারাগিওরগেভিচ। অস্ট্রিয়ান প্রভাবের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সকল সার্বিয়ান-এর স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেন।

৫১



*অস্ট্রিয়ান আর্চ ডিউক ফ্রান্স ফার্দিনান্দ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সারায়েভোতে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়।*

এক সার্বিয়ান ছাত্র, গ্যাব্রিয়েল প্রিন্সিপ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জুনে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ডকে সারায়েভোতে হত্যা

করলে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ানরা সার্বদেরকে দোষী করে, অভিযোগ করে তাদের সরকার এ হত্যাকাণ্ডে মদদ যুগিয়েছে। এ অজুহাতে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে সার্বিয়া দখল করার জন্যে। যুদ্ধের পরে সার্বিয়া দুটি ছোট দেশ ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় যুগোশ্লাভিয়া গঠন করার জন্যে। নতুন দেশটি শাসন করেন পিটারের ছেলে আলেকজান্ডার কারাগিওরগেভিচ।

১৯৪১ - এ জার্মানরা যুগোশ্লাভিয়ায় হামলা চালিয়ে দ্রুত দখল করে নেয় দেশটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এটি মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে রিপাবলিকে পরিণত হয়। টিটো অ্যান্টি জার্মান রেজিস্ট্যান্ট মুভমেন্টের কমুউনিস্ট নেতা ছিলেন। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮১তে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি যুগোশ্লাভিয়া শাসন করে গেছেন। তারপর থেকে নানা নেতারা দেশটি শাসন করে আসছেন।

# ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য

পনের শতকের শেষের দিকে ভারত তখনো ছিল কতগুলো সামন্ত রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি দেশ। আর এ দেশ শাসন করত খান পদবীর বুনো শাসক রাজা কিংবা নবাবরা। এদের কেউ কেউ ছিল হিন্দু, আবার কেউ মুসলমান। শেষে মুসলমানরাই হিন্দুদেরকে শাসন করতে থাকে।

শতক শেষ হবার দিকে তৈমুরলঙ্গের বংশধর বাবর, যার জন্ম পারস্যে, ক্ষমতায় আসেন এবং রাজ্যগুলো একত্রিত করে একটি সাম্রাজ্যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ছোট তবে শক্তিশালী একটি বাহিনী গঠন করে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে দখল করে নেন এর প্রধান শহর কাবুল ও কান্দাহার। তারপর অগ্রসর হন পুব থেকে মধ্য ভারতে, দখল করেন দিল্লী। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বাবর ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের প্রভু হয়ে বসেন এবং অশোকের পরে তিনিই বৃহত্তম ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন করেছেন।



*তাজমহল, তৈরি হয় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে। এর কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ২০০ ফুট উঁচু।*

বাবর মারা যান ১৫৩০-এ। তার ছেলে হুমায়ুনকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। পরে সিংহাসন ফিরে পেয়ে তিনি পুব ও পশ্চিমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ও প্রায় পনেরশ মাইল রাস্তা সংস্কার করেন। তারপরে ১৫৪২ এ সিংহাসনে বসেন তাঁর ছেলে আকবর যিনি ইতিহাসে 'আকবর দ্য গ্রেট' নামে পরিচিত।

শিশু বয়সে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করলেও ক্ষমতা পেতে তাকে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভারতকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে আকবর ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটালে দেশের সকলে খুশী হয়েছিল।

আকবর হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, বিশেষ করে হিন্দু কলা ও সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তার সময়ে হিন্দি ভাষা জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়। তিনি একজন সুনির্মাতাও ছিলেন। তার আমলে নির্মিত হয় আগ্রা। দিল্লীরও প্রচুর সংস্কার করেছেন আকবর। ১৬০৫-এ তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭), বাবার রেখে যাওয়া পুনর্গঠনের কাজ শেষ করেন। ইনিও হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ছিলেন এবং তাদেরকে রাজ্যের বড় বড় পদে নিয়োগ দিতেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তার অনুরাগ ছিল এবং মিশনারীদেরকে ভারতে আসতে বাধা দেননি। তবে তিনি বড্ড বেশি মদ্যপান করতেন, ছিলেন আফিমখোর। ফলে বাবার সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহজাহান (১৬২৭-৫৮) সাহসী ও নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি মমতাজ নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। মমতাজের মৃত্যুর পরে তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে শাহজাহান আগ্রায় তৈরি করেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাণ শৈলী তাজমহল। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে শাহজাহান মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়লে তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন তারই ছেলে আওরঙ্গজেব। শাহজাহানকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (১৬৬৬) আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়।



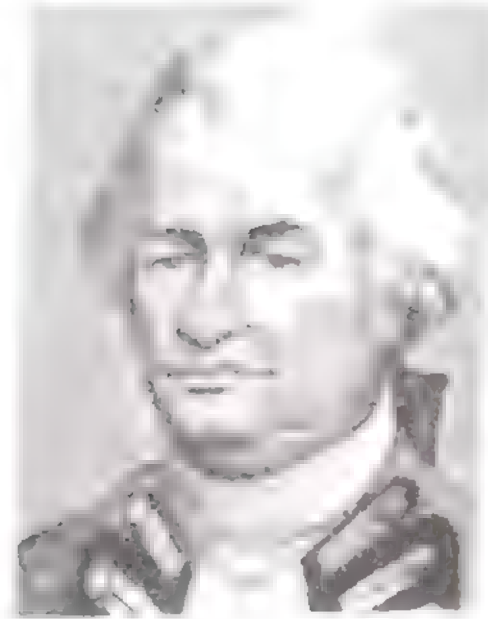
*হাতির পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হিন্দুরা, আওরঙ্গজেবের সময়ে।*

আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করেছেন ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, বদমেজাজী এবং হিংস্র স্বভাবের মানুষ। যে কোন চিত্ত বিনোদনকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। ঘুমাতেন কঠিন মেঝের ওপর, উত্তেজক যে কোন পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকতেন এমনকি নাচ কিংবা অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীও দেখতেন না। শুধু তাই নয় তার সঙ্গীদেরকেও একই

পথে চলতে বলতেন। আওরঙ্গজেব মনে প্রাণে ছিলেন সৈনিক এবং সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ সময় তাঁর কেটেছে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অভিযানে। তবে দক্ষিণের শিবাজীকে তিনি পরাজিত করতে পারেননি।

আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুদেরকে রাজ চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেন। হিন্দুদের ওপর তিনি প্রচুর কর আরোপ করেন এবং অনেক বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেছেন। হিন্দুরা তার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানাতে প্রাসাদের সামনে শুয়ে থাকত। সম্রাটের নির্দেশে তাদেরকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলা হতো। তাজমহলের সামনেও তিনি এভাবে অনেক হিন্দু হত্যা করেছেন।

আওরঙ্গজেবের নীতি বা কৌশল সাম্রাজ্যের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরা দেখা দিয়েছিল আর এটা মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবকে অনেকখানি খর্ব করেছে। একসময় আওরঙ্গজেবের নিজস্ব বাহিনী তাকে ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে হতাশায় নিমজ্জিত সম্রাটের মৃত্যুর সময় কেউ পাশে ছিল না। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দের সহজ শিকারে পরিণত হয়। যার মধ্যে ফরাসী ও ইংরেজরা ছিল প্রধান।



রবার্ট ক্লাইভ

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে প্রাদেশিক শাসকরা যে যার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে থাকে এবং সম্রাটের মত শাসন শুরু করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা লেগেই থাকত।

এ সময়ের মধ্যেও দুটি শক্তিশালী মুসলিম দেশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে– বাংলা ও দক্ষিণ। বাংলা শাসন করতেন আওরঙ্গজেবের এক পৌত্র। তবে প্রাদেশিক বিরোধ ব্রিটিশ ও ফরাসীদের জন্যে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক ছিল। বাংলায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ সেনাবাহিনী সংগঠিত করে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এদেশ ব্রিটিশদের আয়ত্তে চলে যায়।

এরপর প্রায় দুশো বছর ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের অধীনে থেকেছে। স্বাধীন হবার জন্যে প্রায়ই তারা সংগ্রাম করেছে। প্রচণ্ড সংগ্রামের মুখে টিকতে না পেরে ব্রিটিশরা ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। তবে যাবার আগে ভারতকে দু টুকরো করে দিয়ে যায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। হিন্দুরা থেকে যায় ভারতে, মুসলমানরা পাকিস্তানে। ভারতের ক্ষমতায় বসেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিক হিসেবে সম্মানিত।

# চীনে মাঞ্চু

মিং সম্রাটরা চীনকে বাকি বিশ্ব থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন করেই রেখেছিলেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এরকম অবস্থা চলেছে। চীনাদেরকে ইউরোপীয়দের মত ভয়ঙ্কর ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি কিংবা অটোমানদের হামলার শিকারও হতে হয়নি। তারা দারিদ্র্য এবং অদক্ষ সরকার ব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট।

এটা ছিল সত্যিকারের হতাশাজনক সময়। তবে এ সময়ে শিল্প সংস্কৃতির বেশ বিকাশ ঘটেছে। পেইন্টিং বা চিত্রকলা অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং চীনারা দারুণ দারুণ সব ছবি আঁকতে থাকে। পোর্সেলিনের তৈরি জিনিসপত্রেরও সমৃদ্ধি ঘটে, প্রচুর বই লেখা ও প্রকাশ করা হয়, যদিও প্রাচীন ভাষাই ছিল এর সম্বল।



*মাঞ্চু সম্রাট কাং সি কামানের সাহায্যে চীনা সীমান্তে মোঙ্গলদেরকে পরাজিত করেন।*

সম্রাট ওয়াং লি (১৫৭৩–১৬২০) জাঁকজমকভাবে প্রাসাদে জীবন কাটাচ্ছিলেন, তবে তার সময়েই মোঙ্গলদের আক্রমণে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়। এই নতুন হামলাকারীরা মিং সংস্কৃতির প্রতি ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। এদেরকে বলা হতো মাঞ্চু, কিনদের সাথে তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। এরা চীনের উত্তরাংশ নিয়ন্ত্রণ শুরু করে এবং নিজেদের রাজ্য সীমা বিস্তৃতির স্বপ্ন দেখতে থাকে। ওয়াং লি ও তার উত্তরসুরিরা মাঞ্চুদেরকে বাধা দিতে ব্যর্থ হন এবং ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই গোটা মাঞ্চুরিয়া চলে যায় শত্রুপক্ষের হাতে।

শেষ মিং সম্রাট চুং চ্যাং (১৬২৭–৪৪) পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও যুদ্ধবাজ মাঞ্চুদেরকে ঠেকানোর মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মাঞ্চুদের বাধা দিয়েও ব্যর্থ হয়ে চুং চ্যাং বেছে নেন আত্মহননের পথ আর মাঞ্চুরা দখল করে সিংহাসন এবং শুরু হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী একটি নতুন রাজ বংশের।

চীনের আগেকার আক্রমণকারীদের মত মাঞ্চুরাও দ্রুত চীনের সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সরকারের প্রশাসন চালাতে থাকে মিং বংশের মত। মাঞ্চুরা তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে চীনাদেরকে আহ্বানও করেছে।

প্রথম মাঞ্চু সম্রাট কাং সি (১৬৬২-১৭২২) মোঙ্গলদেরকে পরাজিত করেন ইউরোপ থেকে আনা কামান দেগে। কাং সি ছিলেন সংস্কৃতপরায়ণ মানুষ, তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকদেরকে স্বাগত জানান, নিজে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং বই লিখেছেন (তিনি অভিধানও সম্পাদনা করেছেন)। কাং সি প্রচুর দালান কোঠা নির্মাণ করেন। এর মধ্যে অন্যতম বেইজিং-এর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ।

তবে কাং সি'র শেষ বছরগুলো ভাল যায় নি। দেশের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল চীনে তার পশ্চিমা ধ্যান ধারণার প্রবেশের বিষয়টি মেনে নিতে পারে নি। ১৭২২-এ তার মৃত্যুর পরে ছেলে ইউং চেং (১৭২২-৩৫) সিংহাসনে বসেই বাবার মতের উল্টো কাজ করতে থাকেন। মিশনারী ধর্মপ্রচারকদেরকে বের করে দেয়া হয় দেশ থেকে, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিষিদ্ধ করা হয় এবং চীনারা আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের অনুপ্রবেশের ঘটনা শুনে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ইউং চেং-এর পরে সিংহাসনে বসেন চিয়েন লুং, ইনি অর্ধ শতকেরও বেশি সময় রাজ্য শাসন করেছেন। ইনি প্রশাসনের উন্নয়ন ঘটান তবে খ্রিষ্টানদেরকে আপদ ভেবে তাদেরকে নির্যাতন করেছেন।

চিয়েন বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। তিনি নেপাল জয় করেন এবং গুর্খাদেরকে কাঠমুণ্ডুতে পাঠিয়ে দেন। তিনি তিব্বতও জয় করেন তবে দালাই লামার কোন ক্ষতি করেন নি। দালাই লামা হলেন তিব্বতীদের প্রধান পুরোহিত, খ্রিস্টধর্মের 'পোপ' এর মত। এরপরে তিনি হামলা করেন বার্মায় এবং এ দেশের শাসকদের চীনা সার্বভৌমত্ব প্রদানে বাধ্য করেন। ১৭৯৬ তে, তার মৃত্যুর সময় দূরপ্রাচ্যে চীন হয়ে উঠছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

তবে চিয়েন লুং-এর মৃত্যুর পরে দেশটিতে যেন ধস্ নামে। এর অন্তরণ মতবাদ উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই। এ দেশের রাজনৈতিক কোন উন্নতি হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে দূরে সরে ছিল।

চীনারা শিল্পয়োন্নয়নের বিপক্ষে ছিল, তারা অন্যান্য দেশের শিকারে পরিণত হয়, উনিশ শতকে ইউরোপীয় জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে চীনাদের জীবনে। ১৮৩৯-এ চীনের সাথে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সংঘাত হয়। তারপর ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ইয়াংজি নদীতে ঢুকে নানকিং শহরে বোমা বর্ষণ শুরু করে এবং চীনাদেরকে হংকং বন্দর ব্রিটেনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করে।

১৮৪৬-এ একদল কৃষক কনফুসিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী তাদের নেতা শিউ চুয়ানের নেতৃত্বে মাঞ্চু সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। বিভিন্ন জেলায় এ বিদ্রোহ সফল হয় এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তারা নানকিং দখল করে সেখানে নিজেদের পছন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মাঞ্চুরা কিছু করতে না পেরে পশ্চিমা ইউরোপীয় শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপরে চীনা বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মাঞ্চুদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বিনিময়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ও নানা সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরাও আবার চীনে ঢোকার সুযোগ পান।

পশ্চিমের সাথে এই নতুন সংযোগ গোটা চীনা সমাজকে ভীত করে তোলে এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া দখল নিয়ে চীন জাপান লড়াই শুরু হলে তাতে চীন হেরে গেলে ও দেশে ইউরোপীয়দের প্রবেশ ও আরো বাণিজ্য কুঠি স্থাপন অধিক সুগম হয়ে ওঠে। সম্রাট কুয়াং সু (১৮৭৫-১৯০৮) গণতান্ত্রিক কৌশলের সাথে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হন।



*মাও সে তুং, চীনা কমুউনিষ্ট নেতা, মৃত্যু ১৯৭৬।*

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বক্সার বিদ্রোহের সূচনা হয়। চীনারা তাদের দেশে বিদেশী বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জার্মান রাষ্ট্রদূত খুন হয়ে যান। পশ্চিম ইউরোপ প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দখল করে নেয়া হয় পিকিং (বর্তমান বেইজিং)। দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হলেও ওটা ছিল মাঞ্চুদের শেষের শুরু। সান ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় প্রবল বিদ্রোহ। তিনি পশ্চিমা প্রভাব থেকে চীনকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯১১ তে বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং সিংহাসনচ্যুত হন মাঞ্চু সম্রাট। সান ইয়াৎ সেন নতুন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তবে কিছুদিনের মধ্যে তার সহকর্মীরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। দেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় অরাজকতা। ১৯২৭- এ সান ইয়াৎ সেনের শ্যালক চিয়াং কাইশেক ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রায় গোটা চীনকে একত্রিত করেন।

১৯৩১ এ জাপান মাঞ্চুরিয়ায় হামলা চালিয়ে এটি দখল করে নেয়, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে মাঞ্চুরিয়া আবার ফেরত আসে চীনের কাছে। চিয়াং কাইশেক পশ্চিমা মিত্র ব্রিটেন ও আমেরিকার সাথে মিলে জাপানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি গোটা চীনে কর্তৃত্ব করতে চাইলে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। লড়াই শুরু হয়ে যায় তার সমর্থক বনাম মাও সে তুং-এর সমর্থকদের মাঝে। মাও ছিলেন বিপ্লবী কমুউনিষ্ট নেতা, জাপানীদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে লড়াই করেছেন।

১৯৪৯–এ মাও'র সেনারা নানকিং, পিকিং ও সাংহাই দখল করে এবং একটি পিপলস রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। মাও ছিলেন তার প্রধান। চিয়াং কাইশেক ফরমোজায় পালিয়ে গিয়ে ন্যাশনালিষ্ট গভর্নমেন্ট অব চায়না গঠন করেন। তিনি মারা যান ১৯৭৫-এ। বেশ কয়েক বছর আমেরিকা চীনের কমুউনিষ্ট সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। যদিও চীনেই সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস। তবে ১৯৭৫'র প্রথম দিকে আমেরিকা চীনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

# ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপান ও দূরপ্রাচ্য

মধ্যযুগে বাইরের জগতের সাথে জাপানের কোন যোগাযোগই ছিল না। সতের শতকের প্রথম দিকে অল্প কিছু ডাচ ও পর্তুগীজ ব্যবসায়ী এবং ধর্ম প্রচারক জাপানে প্রবেশের অনুমতি পেলেও ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সকল বিদেশীকে তার দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সবার কাছ থেকে। তারপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান সম্পূর্ণ পর্দার অন্তরালে থেকেছে। তবে ওই সময়ে দেশটিতে মোটামুটি সাংস্কৃতিক একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, শিল্পকলা ও পোর্সেলিনের তৈরি জিনিসপত্র ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের, কিছু কিছু আবার চীনাদের তুলনায় অনেক উন্নত।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকান যুদ্ধ বহরের কমাণ্ডার কমোডর ম্যাথিউ পেরী জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং জাপানী অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। এরপর ইউরোপীয়রাও এ পথ ধরে এবং শীঘ্রি জাপানের নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে জাপানের দরজা আবার খুলে যায় এবং জাপানীদের জন্যে সূচনা ঘটে নতুন যুগের।

শোগানদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। পূর্বপুরুষদের মত প্রায় নির্বাসনে থাকা সম্রাট তার অবসর জীবন থেকে আবার ফিরে এসে জাঁকজমকের সাথে জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামন্ত প্রভুদেরকে তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়, নতুন সরকার ব্যবস্থা চালু হয় অনেকটা পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার আদলে। জাপান ক্রমে আধুনিক রাষ্ট্র হয়ে উঠতে থাকে, নৌবাহিনীর জন্যে ইস্পাতের নৌ বহর নির্মাণ শুরু করে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান রাশান আগ্রাসনের ভয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে আঁতাত করে। মস্কো থেকে ব্লাডিভোস্টক পর্যন্ত নির্মিত সাইবেরিয়ান রেলপথ জাপানী দ্বীপপুঞ্জকে হামলার হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখা জাপান সেখানে ১৯০৫ এ রাশিয়ার বিরোধিতা করলে দু'দেশে যুদ্ধ বেধে যায়। সুসিমার যুদ্ধে রাশান নেভী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় জাপানী সুশিক্ষিত নৌ বাহিনীর কাছে। জাপান পোর্ট আর্থার দখল করে রাশানদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৯১৭ নভেম্বরে জার্মানীকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে হঠিয়ে দেয়। জাপানের শিল্পায়ন দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগোচ্ছিল। শীঘ্রি তাদের বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী নেভীতে রূপান্তর ঘটে। ১৯৩১-এ বিশ্ববাসীর প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে জাপান মাঞ্চুরিয়া

দখল করে এবং ১৯৩৭-এ চীনে হামলা চালায়। উত্তরে ঝটিকা আক্রমণে দখল করে নেয় সাংহাই। জাপানীরা নানকিং-এ বাহিনী প্রেরণের জন্যে রেলওয়ে ব্যবহার করত। ডিসেম্বর নাগাদ এ শহরেরও পতন ঘটে। চীন হয়ে ওঠে জাপানের সম্পত্তি। তবে চীনারা সব সময়ই এর প্রতিবাদ করে এসেছে এবং দুটি ফ্রন্টে বিদ্রোহীরা ভাগ হয়ে যায়। একটি দল ছিল চিয়াং কাইশেকের, অপরটি মাও সে তুং-এর।

জাপানী সামরিক বাহিনীর সাফল্য সরকারকে অহংকারী করে তোলে এবং ১৯৪১ এ জাপান ফার ইস্টার্ন সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জাপানী ফোর্স হাওয়াইর পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌ ঘাঁটিতে হামলা চালালে আমেরিকানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াও আক্রমণ করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যে দূর প্রাচ্যে আক্ষরিক অর্থেই জাপানের হাতের মুঠোয় চলে আসে– মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, বার্মা, ইন্দোচীন এবং ভারতের সীমান্তও হুমকির মুখে ছিল।



*১৯৪৫ এ হিরোশিমায় প্রথম আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত শহর*

আমেরিকানরা ১৯৪২ ও ৪৭-এ বারবার নৌ আক্রমণ চালিয়ে জাপানী নৌ বহরকে পরাজিত করে। ১৯৪৫ এ আমেরিকান বম্বাররা জাপানী শহরগুলো অবরোধ করে ফেলে, ব্রিটিশরা বার্মা থেকে উৎখাত করে জাপানীদেরকে। আগস্টে আমেরিকানরা তাদের প্রথম আনবিক বোমা ফেলে হিরোশিমায়, চোখের পলকে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, মারা যায় হাজার হাজার মানুষ। কয়েকদিন পরে দ্বিতীয় বোমাটি ফেলা হয় নাগাসাকিতে, ফল বয়ে আনে একই। জাপানীরা তাৎক্ষণিকভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং ছেড়ে দেয় দখল করা অঞ্চলগুলো।

যুদ্ধের পরে জাপান আবার নিজেকে পুনর্গঠিত করেছে, সংস্কার করেছে নগরী, ভাঙা শিল্প কারখানা আবার তুলে দাঁড় করিয়েছে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের

অধীনে জাপান এশিয়ার সেরা অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। জাপানে সম্রাট একজন আছেন বটে তবে তিনি কেবলই শোভা বর্ধনের জন্যে।

## ইন্দোনেশিয়া

ষোড়শ শতকে ইন্দোনেশিয়ার বেশিরভাগ ছিল মুসলমান, যদিও অনেক অঞ্চলে হিন্দুরাও বাস করত। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজরা আসতে শুরু করে বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে। তারপর একে একে চলে আসে স্প্যানিশ, ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসীরা। সবারই উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় মশলা ক্রয়। ভেনিস বা অটোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক কম দামে ইন্দোনেশিয়ায় মসলা বিক্রি হতো। ১৬৮৪ তে এদেশে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এরা এক সময় দ্বীপের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। একশো বছরের মধ্যে গোটা এলাকা জুড়ে গিজগিজ করতে থাকে ডাচরা।

১৯৪২-এ জাপানীরা হামলা চালিয়ে দখল করে নেয় ইন্দোনেশিয়া এবং ১৯৪৫ পর্যন্ত দেশটি নিজেদের অধিকারে রাখে। তারপর দেশটি ডাচদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলে তারা ইন্দোনেশীয়দেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। ক্ষমতা লোভী প্রেসিডেন্ট ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতায় বসলে দেশটিকে বেশ কয়েক বছর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে ১৯৬৬ তে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকে ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে শুরু করেছে।

## মালয়েশিয়া

পনের শতকে ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা মালয়ীরা বন জঙ্গল অধ্যুষিত মালয় উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করে। এ এলাকা চীনাদেরকেও আকৃষ্ট করেছিল, আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতীয় ও মুসলিমরা। এক সময়ে বেশিরভাগ মালয়ী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

মালয়ে প্রথম যে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে তারা পর্তুগীজ। এরা ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কায় প্রবেশ করে। ওখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে এবং ১৬৪০ এ ডাচরা ওই এলাকা দখল করা পর্যন্ত তারা মালাক্কাতেই ছিল। মালাক্কায় ব্রিটিশ প্রভাব শুরু হয় ১৭৮০ তে যখন ব্যবসায়ীরা পেনাং-এ বসতি স্থাপন করছিল। মালয়ে ব্রিটিশদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এরা ব্রিটিশ ভারতকে শাসন করত।

গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সিঙ্গাপুর ব্রিটেনের দখলে নিয়ে নেন স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস ১৮১৯-এ। ছয় বছর বাদে ডাচদের কাছ থেকে মালাক্কা কেড়ে নেয়া হয় এবং উনিশ শতকের পুরো সময় মালয় ব্রিটিশদের অধীনস্ত থেকেছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালয়ের বিভিন্ন রাজ্যকে এক নামকরণ করা হয় ফেডারেটেড মালয় স্টেটস।

মালয়ের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল টিন ও রাবার, আর এ সব কাঁচামালের পশ্চিম ইউরোপের কাছে যথেষ্ট কদর ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মালয় ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় (১৯৫৭) এবং ১৯৬৩ তে এর ফেডারেশন অব মালয়েশিয়ার অংশে রূপান্তর ঘটে।

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে সিঙ্গাপুর। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা ওখানে একটি বন্দর নির্মাণ করেছিল এবং কালক্রমে সিঙ্গাপুর পরিণত হয় এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে। ব্রিটিশরা দ্বীপটিতে একটি নৌ ঘাঁটিও নির্মাণ করেছিল। বলা হতো ঘাঁটিটি অজেয়। কিন্তু জাপানের সাথে যুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে দ্বীপসহ ঘাঁটি চলে যায় জাপানীদের হাতে। ১৯৪৫-এ জাপানীরা আত্মসমর্পণ করার পরে সিঙ্গাপুর মুক্তি পায়।

সিঙ্গাপুর ১৯৫৯-এর জুনে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ১৯৬৩ তে ফেডারেশন অব মালয়েশিয়ায় যোগ দেয়। বর্তমানে দেশটি স্বায়ত্তশাসিত এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

**বার্মা (মায়ানমার)**

একাদশ শতকে বার্মা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ রাজ্য। তবে দেশটি অরাজক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলে বহু বছর ধরে গৃহযুদ্ধের যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এ অবস্থার অবসান ঘটে ১৬১২ তে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসার পরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বার্মা শাসন করেন বিখ্যাত রাজা আলোমপ্রা। তার শাসনামলে এ দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পরপর আবার শুরু হয়ে যায় অরাজকতা। উনিশ শতকের শুরুর দিকে রাজার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হলে বাংলার সীমান্তের শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং সতর্ক হয়ে ওঠে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ১৮২৪-এ একটি যুদ্ধ হয় এবং ব্রিটিশরা বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন দখল করে। ১৮৮৬ তে বার্মা ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

১৯৩৭-এ বার্মা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটিকে জাপানীরা দখল করে। যুদ্ধের পরে ভারত ভাগ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করার সময় ১৯৪৮-এ বার্মাও স্বাধীন দেশে পরিণত হয়।

**পলিনেশিয়া**

প্রশান্ত মহাসাগরে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য দ্বীপ অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। ওই সময় ক্যাপ্টেন জেমস কুক প্রশান্ত মহাসাগরে তার অভিযান চালাচ্ছিলেন (১৭৬৮-৭১)। হাওয়াই, নিউজিল্যাণ্ড ও ইস্টার

আইল্যাণ্ডে বসবাসরত জনগণকে বলা হতো পলিনেশিয়ান। কখনোবা এদেরকে প্রশান্তের ভাইকিং বলেও অভিহিত করা হতো। এরা একদা খুব সাহসী নাবিক ও জলদস্যু ছিল। এদের আগমন ভারত থেকে, প্রায় দু'হাজার বছর আগে। কিছু আবার পেরু থেকেও অভিবাসী হয়েছিল।

পলিনেশিয়ানদের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। এরা আলু চাষ করত, গাছের গুঁড়ি কেটে বানাত ক্যানু এবং কৃষিখাতকে উন্নত একটি অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। এরা খুব ভাল জেলেও বটে। এদের কুটির কাঠ দিয়ে তৈরি, ছাদ পাম গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া।

পলিনেশিয়ানরা জীবনকে উপভোগ করত। মাঝে মাঝে ছোটখাট লড়াইয়েও জড়িয়ে পড়ত। হাওয়াইর অধিবাসীরাই ক্যাপ্টেন কুককে হত্যা করেছিল বলে জানা যায়। তবে এটা ছিল ভুল বোঝাবুঝির কারণ। কুককে বরং তারা ভয়ই পেত।

পলিনেশীয়রা শীঘ্রিই ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। তারা এসব দ্বীপে বসতি স্থাপন করলে ব্রিটিশরা এদের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করত। সম্প্রতি কিছু পলিনেশীয় দ্বীপে ব্রিটিশরা স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে টোঙ্গা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও গিলবার্ট এবং এলিস দ্বীপ।

# দুই বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন তারিখে অষ্ট্রিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে গ্যাব্রিয়েল প্রিন্সিস নামে এক সার্বীয় ছাত্র সার্বিয়ায় গুলি করে হত্যা করে। সে ছিল একটি চরমপন্থী সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য। অষ্ট্রিয়ান সরকার এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে সার্বীয় সরকারের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলে এবং এ অজুহাতে এক মাসের মধ্যে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এতে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো ছুতো পেয়ে যায়। আর এরা বহু আগে থেকেই পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল বলে এ সুযোগে তারাও যুদ্ধে যোগ



*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আকাশ পথে বিধ্বস্ত বোমারু বিমান*

দেয়। রাশানরা তাদের সেনাবাহিনী জমা করে জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান সীমান্তে, জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে। রাশিয়ার সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ফ্রান্সকেও ফলে রাশিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হয়। ফ্রান্সকে নাগালে পেতে জার্মানরা বেলজিয়ামে হামলা চালিয়ে বসে যদিও এ দেশটি ছিল নিরপেক্ষ। গ্রেট ব্রিটেন তখন এর মধ্যে নাক গলায় ও জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করে বসে। তুরস্ক নভেম্বরে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় শক্তির সাথে যোগ দেয় এবং বুলগেরিয়াও ১৯১৫ তে ও পথ অনুসরণ করে।

গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রধান মিত্রপক্ষ ছিল। জাপান যুদ্ধে যোগ দেয় (আগস্ট ১৯১৪), ইটালি (মে ১৯১৫) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এপ্রিল ১৯১৭)। ভূখণ্ডে মূল যুদ্ধ হয়েছে ছয়টি জায়গায়। এগুলো ছিল ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট বা পশ্চিম রণাঙ্গন, এ রেখা চলে গিয়েছিল বেলজিয়ান উপকূল থেকে ফ্রান্স হয়ে সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত পর্যন্ত; ইস্টার্ন ফ্রন্ট, বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত, দার্দানেলেস, বলকান, সালোনিকাসহ; নিকট প্রাচ্য, প্যালেস্টাইন ও বর্তমান ইরাক এবং অস্ট্রো ইটালিয়ান সীমান্ত।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছে। লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে এক ছটাক জমি ছাড় দিতে রাজি হয়নি। ইস্টার্ন ফ্রন্টে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা নানা বিজয় পেয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশান জেনারেল ব্রুসিলভ সাফল্যের সাথে প্রতি আক্রমণ করেন, কিন্তু ১৯১৭ তে রাশান সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হলে বিপ্লবী সরকার জার্মানদের সাথে ব্রেস্ট লিটোভস্কে আলাদাভাবে শান্তিচুক্তি করেছে।



*উইনস্টন চার্চিল, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটিশ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তার অসাধারণ নেতৃত্বে ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে।*

দার্দানেলেসে উইস্টটন চার্চিল হামলা চালান নৌ ও সামরিক শক্তি নিয়ে কন্সটান্টিনোপল দখলের অভিপ্রায়ে এবং রাশিয়াকে সাহায্য করেন তুরস্ককে পরাজিত করার জন্যে। কিন্তু এখানে হামলা ব্যর্থ হয়ে যায় নৌ ও সামরিক শক্তির পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে, ব্রিটিশরা ১৯১৬'র শুরুর দিকে তাদের সেনাদলকে খালি করে ফেলে। বলকানে সার্বীয়রা প্রথম দিকে সফলতার চেহারা দেখলেও অষ্ট্রিয়ান, জার্মান ও বুলগেরিয়ান যৌথ আক্রমণে পরাজিত হয়। ব্রিটিশ ও সালোনিকার অন্যান্য ফোর্স, যাহোক ১৯১৮ তে পরাজিত করে বুলগেরিয়ানদেরকে।

নিকট প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও তার মিত্রপক্ষ জয়লাভ করে চলেছিল। তারা প্যালেস্টাইন থেকে তুর্কীদেরকে উৎখাত করে ও মেসোপটেমিয়ায় তাদের হাত ভেঙে দেয়। অস্ট্রো-ইটালিয়ান সীমান্তে যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে তেমন উল্লেখযোগ্য

কোন ঘটনা না ঘটলেও ১৯১৭ তে কাপোরেটোতে ইটালিয়ানরা দারুণভাবে মার খেয়ে যায়। ওই বছরই ভিত্তোরিও ভেনোটোতে অষ্ট্রিয়ানদেরকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এ পরাজয়ের শোধ নেয়। আফ্রিকায় জার্মানরা তাদের কলোনিগুলোতে মার খাচ্ছিল।

সাগরে ব্রিটিশ ও জার্মানদের মধ্যে ১৯১৬-র ৩১ শে তারিখে জুটল্যাণ্ডে ভয়াবহ লড়াই হয়। ফলাফল ছিল মীমাংসাহীন, তবে জার্মান হাই সীজ ফ্লিট আর যুদ্ধের সময় উত্তর সাগর কিংবা আটলান্টিকে যাবার সাহস করেনি। বদলে রসদ ভর্তি ব্রিটিশ জাহাজ সাবমেরিন দিয়ে ডুবিয়ে ব্রিটেনকে অনাহারে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে ছিল জার্মানরা। তবে কনভয় সিষ্টেমের কারণে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে নি। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত যুদ্ধ জাহাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিলে মিত্র বাহিনীর শক্তি বেড়ে যায় বহু গুণ এবং ১৯১৮'র শুরুতে কেন্দ্রীয় শক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। ১১ নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব আনা হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই চুক্তি ইউরোপের মানচিত্রকে নতুন ভাবে পরিচিত করে তোলে। রাইনে সেনাবাহিনী ও অস্ত্র কারখানা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বহির্বিশ্বে জার্মান অধিকৃত অঞ্চল বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আলসাস লোরেন ফিরিয়ে দেয়া হয় ফ্রান্সকে। সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো ও অষ্ট্রিয়ান প্রাক্তন রাজ্য নিয়ে গঠিত হয় রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়া, নতুন দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্ম হয়। জার্মান বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করে এক লাখে নামিয়ে আনা হয় এবং নেভীতে দশ হাজার টনের বেশি জাহাজ রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর অর্থও যোগাতে হয়েছে জার্মানীকে।

তবে এ চুক্তি প্রথম থেকেই ছিল ব্যর্থ। নিরস্ত্রীকরণকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, জার্মান নৌ বাহিনী দ্রুত এগিয়েছে, ক্ষতিপূরণও শেষে তাকে দিতে হয় নি। হিটলার রাইনে নতুন করে সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছেন (১৯৩৩) এবং জার্মান আর্মি ও নেভী কলেবরবৃদ্ধি সহ সর্বাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। ১৯৩৮ এ একটিও গুলি খরচ না করে অষ্ট্রিয়া দখল করে নেয় জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে ১৯৩৯-এ। ইউরোপ জ্বলে ওঠার বীজ এখানেই রোপণ করা হয় এবং ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বরে হিটলার জার্মান বাহিনীকে নির্দেশ দেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার জন্যে। রাশিয়ার সাথে তার আগেই চুক্তি হয়ে গিয়েছিল দু'জনে মিলে দেশটি ভাগাভাগি করে নেবেন।

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। চার হপ্তার মধ্যে দখল হয়ে যায় পোল্যাণ্ড কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসার আগেই। এরপর কিছুদিনের জন্যে থেমে থাকে যুদ্ধ, কিন্তু ১৯৪০-এর এপ্রিলে জার্মানরা এগিয়ে

যায় ডেনমার্ক ও নরওয়ের দিকে ও দ্রুত কব্জা করে ফেলে দেশদুটিকে। পরের মাসে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পতন ঘটে, আর জুনে ছিল ফ্রান্সের পালা। হিটলার আশা করেছিলেন ব্রিটেন তার সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল হিটলারের সাথে হাত মেলান নি। তিনি জ্বালাময়ী ভাষণে ব্রিটিশদেরকে জার্মানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান করেন এবং অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা দ্বারা তাদেরকে যে কোন হামলার জন্যে প্রস্তুত করেন।

একের পর এক বিমান হামলায় (ব্যাটল অব ব্রিটেন, ১৯৪০) অপরাজেয় জার্মান এয়ার ফোর্স ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। হিটলার ব্রিটেনে হামলার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ইউরোপের অন্য দিকে ঘুরে তাকান। ১৯৪১-এর বসন্তে পতন ঘটে যুগোশ্লাভিয়ার এবং জুনে জার্মানরা কোন রকম আভাস না দিয়েই হামলা চালায় রাশিয়ায়। কয়েক হপ্তার মধ্যে তারা কয়েক লাখ বর্গমাইল এলাকা দখল করে ফেলে শুধু মস্কো ও লেনিনগ্রাদ বাদে। ১৯৪২-এর নভেম্বর থেকে রাশানরা পাল্টা মার দিতে থাকে জার্মানদেরকে।

ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালিয়ানরা জার্মানদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। তারা ১৯৪০-এ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটা ছিল মস্ত ভুল। ব্রিটিশরা পরে, আমেরিকানদের সাহায্যে উত্তর আফ্রিকার কলোনি থেকে ইটালিয়ানদের তাড়িয়ে দেয়। হিটলার জার্মান সেনা পাঠিয়েছিলেন সাহায্যের জন্যে। কিন্তু তারাও তাড়া খেয়ে পালায়। এরপর ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা মিলে আক্রমণ করে ইটালি। মুসোলিনি গদিচ্যুত হন। আত্মসমর্পণ করে ইটালিয়ানরা। জার্মানরা ইটালির উত্তর অংশ দখল করে রেখে ওখানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড হামলার মুখে তারা ওখান থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

রাশানরা এদিকে জার্মান বাহিনীকে কোন ঠাসা করে ফেলেছিল, ১৯৪৪ নাগাদ তারা পোল্যাণ্ড ও বলকানে চলে আসে। ১৯৪৪'র জুনে ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা মিলে নরম্যাণ্ডি উপকূলে হামলা চালিয়ে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্ত করে ফেলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড এবং জার্মানদেরকে তাদের নিজের দেশের দিকে ঠেলে দেয়। একই সময়ে, ১৯৪৫-এর এপ্রিলে বার্লিনে ঢুকে পড়ে রাশানরা এবং হিটলার বেছে নেন আত্মহননের পথ। আর তখন ইউরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

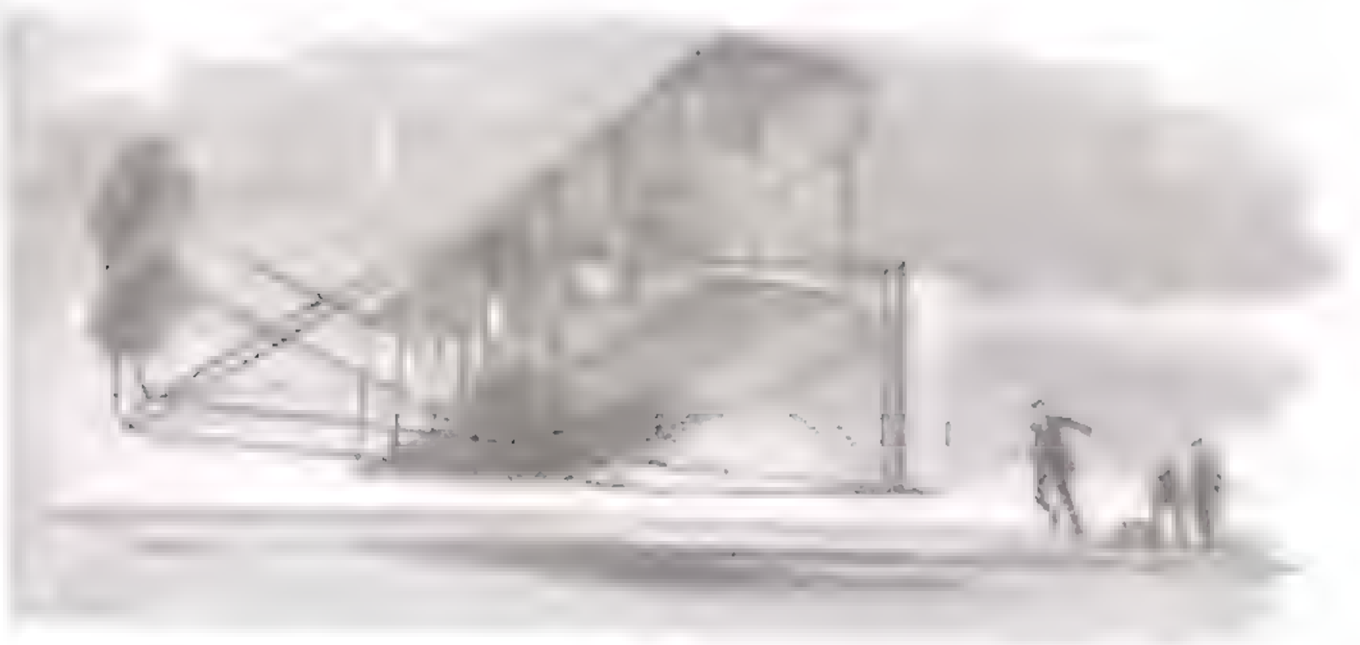
বিশ্বের অন্য অংশে জাপান এশিয়া ও প্যাসিফিকে তার রাজ্য সীমা বিস্তারের স্বপ্ন দেখছিল– সে ইতিমধ্যে চীনের বেশির ভাগ অঞ্চল দখল করে ফেলে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে আমেরিকার পার্ল হারবারে হামলা চালিয়ে বসেছিল। এশিয়ায় ব্রিটিশ অধ্যুষিত এলাকাতেও হামলা চলেছে। জার্মানী ও ইটালিও জাপানের সহযোগিতার আশ্বাসে আমেরিকা আক্রমণ করে। চার মাসের মধ্যে এশিয়ার বড় একটি অংশ

চলে যায় জাপানের হাতে, এর মধ্যে ছিল মালয়, বার্মা, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, বোর্নিও, নিউ গিনি ও প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ। আমেরিকানরা ১৯৪২ ও ১৯৪৩ এ সাগর যুদ্ধে জাপানীদের পরাজিত করার পরে ওই দেশ ও অঞ্চলগুলো মুক্ত হয়। ১৯৪৪এ ব্রিটিশরা বার্মা থেকে জাপানীদেরকে বের করে দিতে শুরু করে, ইউরোপে যুদ্ধের শেষ দিকে, ১৯৪৫-এর এপ্রিলে আমেরিকা জাপানের মূল ভূমিতে হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়। ১৯৪৫-এর আগস্টে আমেরিকানরা তাদের প্রথম ২০000 টন আণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করে হিরোশিমা শহরে, মুহূর্তের মধ্যে নগরী পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে এবং মারা যায় হাজার হাজার মানুষ। কয়েকদিন পরে আরেকটি বোমা তারা ফেলে নাগাসাকিতে। এর পরপর জাপানীরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

কয়েক বছর বাদে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে বিশ্ববাসী। কারণ আমেরিকা ও রাশিয়া তখন বিশ্বের দুই প্রধান পরাশক্তি, দুজনেরই মজুত রয়েছে ভয়ঙ্কর সব পারমাণবিক মারণাস্ত্র। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে গোটা মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দুনিয়ার বুক থেকে। তবে আমাদের সৌভাগ্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বর্তমানে অনেকটাই দূর হয়ে গেছে রাশিয়া ও আমেরিকার কুখ্যাত 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর অবসানের পরে। যদিও পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ চলছেই এবং এ অবস্থার কোনদিন পরিবর্তন হবে সে আশা দুরাশা মাত্র।

# আমেরিকার সমৃদ্ধির একশ বছর

আমেরিকান গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের ওপরে উত্তরের পরাজয় ইউনিয়নকে রক্ষা করে। তবে যুদ্ধের পরে দেশের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। দক্ষিণী রাজ্যগুলোর শহর, গ্রাম, প্ল্যান্টেশন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় কোন রকম সংস্কার কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ থেকে পালিয়ে যাওয়া চল্লিশ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাস যুদ্ধ শেষে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলে তাদের জন্যে বাড়িঘর নির্মাণ, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কাজেই উত্তরের ওপর দক্ষিণকে নির্ভর করতে হচ্ছিল।



*দুই আমেরিকান ভাই অরভিল ও উইলবার রাইট প্রথম আকাশে বিমান চালান।*

আব্রাহাম লিংকন বেঁচে থাকলে দক্ষিণের প্রতি সহানুভূতি জানাতেন এবং কোন রকম প্রশ্ন না তুলে অসহায়, নিপীড়িত মানুষগুলোকে সাহায্য করতেন। তার উত্তরসুরি অ্যান্ড্রু জ্যাকসন (১৮০৮–৭৫) লিংকনের ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একদল শক্তিশালী, বর্ণবিদ্বেষী রিপাবলিকান তার এ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। তারা বলে নক্ষিণী রাজ্যগুলোকে লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে কাজেই তাদেরকে এভাবেই শাসন করা উচিত। দক্ষিণের সামরিক সরকারকে উত্তর দক্ষিণের ঘৃণা আর তিক্ততার মাঝ দিয়ে চলতে হচ্ছিল। তবে দক্ষিণে একদল ব্যবসায়ী এসে খামার ও প্ল্যান্টেশনগুলো জোর করে কিনতে শুরু করে। এগুলোর মালিকরা শ্রমিকদের প্রায় অনাহারে রাখত এবং তাদের পক্ষে যারা খামার

দেখাশোনা করত তারা শ্রমিকদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করত। এই একই কাজ একশ বছর আগে ইংরেজরা করেছে আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি জেনারেল ইউলিসিস এস গ্রান্ট (১৮২২-৮৫)। এই বিখ্যাত সৈনিকটি গৃহযুদ্ধের শেষ ক'মাসে উত্তরের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে দিয়েছিলেন এবং অ্যাপোম্যাটেক্সে তার কাছেই দক্ষিণী বাহিনীর প্রধান জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করেন।

গৃহযুদ্ধের পরে আমেরিকানরা তাদের দরজা খুলে দেয় ইউরোপীয় অভিবাসীদের জন্যে। ১৮৪৫-৮ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সইতে না পেরে প্রথম আইরিশরা তাদের দেশ ত্যাগ করে আমেরিকার দিকে পা বাড়ালে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরে অনেক ইউরোপীয় তাদের দেশ ত্যাগ করেছে। আমেরিকানরা কর্মঠ, পরিশ্রমী, ইউরোপীয় কারিগরদেরকে স্বাগত জানায়। কারণ তখন তারা একটি নিউ ওয়ার্ল্ড বা নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখছিল।



*তিন বিখ্যাত যুদ্ধ নেতা, ১৯৪৫-এ ইয়াল্টা সম্মেলনে, বাম থেকে চার্চিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মার্শাল স্টালিন।*

একই সময় পশ্চিমে বসবাস শুরু হয়ে যায়। মালভূমি ও পাহাড়ি এলাকায় মজুররা সাফসুতরো করে বসতি স্থাপন করে ও নতুন রাজ্য স্থাপন করে। কোন কোন অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদেরকে তাদের শত জনমের নিবাস থেকে উৎখাত করা হয়।

আমেরিকায় রাজ্য বিস্তারের এ সময় যে শিল্প বিপ্লবের জোয়ার শুরু হয় তা গ্রেট ব্রিটেনেরও কল্পনার বাইরে ছিল। আমেরিকান বিজ্ঞান ও আবিষ্কার দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। গোটা দেশ জুড়ে বিরাট রেলওয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়, খনন করা হয় খাল, দূর দূরান্তে নির্মাণ করা হয় রাস্তাঘাট এবং অসংখ্য শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। আবিষ্কার হয় তেল এবং টেক্সাস থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল উত্তোলন করা হয়, আর অন্যান্য রাজ্যগুলো যন্ত্রবিদ্যায় এগিয়ে যায় অনেক দূর। অর্ধ শতকের মধ্যে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কলকারখানা গড়ে ওঠে।

শিল্পায়নে ব্যাপক উন্নতির পাশাপাশি আমেরিকা বিদেশ নীতিতেও ভূমিকা রাখতে শুরু করে। আমেরিকানরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। প্রয়োজনে যুদ্ধের হুমকি দিলে ব্রিটিশরা ওখান থেকে চলে যায়।

শতকের শেষ নাগাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হতে থাকে আমেরিকা। ১৮৯৫ তে কিউবায় স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। স্পেনিয়ার্ডরা তাদের বিরাট সেনাবাহিনী দিয়েও এ বিপ্লব দমন করতে পারছিল না। ওই সময় হাভানা বন্দরে আমেরিকান ক্রুজার মেরিনে অকস্মাৎ বিদ্রোহীরা হামলা চালিয়ে (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) আড়াইশোরও বেশি ক্রুকে হত্যা করে। আমেরিকানরা প্রতিশোধ নেয় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও এ হামলার জন্যে স্পেনিয়ার্ডরা কোনভাবেই দায়ী ছিল না। যুদ্ধে স্প্যানিশ ফোর্স সব জায়গায় হারতে থাকে এবং যুদ্ধ শেষে তাদেরকে হারাতে হয় কিউবা, পুয়ের্তোরিকো এবং ফিলিপাইনও।

বিংশ শতকে আমেরিকা বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায়। এ শতকের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা আমেরিকার ছিল না। কিন্তু জার্মানরা আমেরিকান জাহাজের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে ক্রুদ্ধ করে তোলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে। তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল তারিখে কংগ্রেসকে অনুরোধ জানান যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বিজয় লাভ করলেও অন্যান্য দেশের মত তারও কম আর্থিক ক্ষতি হয়নি। আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে দারুণ মন্দাভাব দেখা দেয় এবং ১৯২৯-এ নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ দারুণভাবে ধসে পড়ে। শেয়ার মূল্য মারাত্মকভাবে পড়ে গেলে লাখ লাখ মানুষ রাতারাতি কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। দেশ জুড়ে বিরাজ করে চরম অর্থনৈতিক মন্দা।

আমেরিকানদেরকে এ আর্থিক দুরবস্থা থেকে উঠে আসতে সাহায্য করেন ডেমোক্রেটিক দলের ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫)। রুজভেল্ট ছিলেন একজন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ, ৩৯ বছরে তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলে জীবনের বাকি সময়টা তাকে কাটিয়ে দিতে হয় হুইল চেয়ারে বসে। এ ছাড়া তার স্বাস্থ্য ভালই ছিল।

রুজভেল্টের নির্বাচনী প্রচারণা আমেরিকান জনগণকে 'নিউ ডিল'-এর স্বপ্ন দেখায়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় যেতে পারলে আমেরিকাকে আবার ধনী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবেন। শিল্প কারখানার বিস্তার ঘটবে, সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে আসবে সমৃদ্ধি। জনগণ তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। তিনি ক্ষমতায় বসে রাজ্যগুলোতে ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসের মর্যাদা উন্নীত করেন। কখনো কখনো স্বৈরাচারীর মত আচরণ করলেও রুজভেল্টকে তার অনুসারীরা সবসময় সমর্থন করে গেছেন। ফলে ১৯৩৬-এ আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের ইতিহাসে সর্বাধিক ভোট পেয়ে তিনি আবার জয়যুক্ত হন। বিদেশ নীতিতে রুজভেল্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকা নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু ১৯৪০-এর জুনে জার্মানদের কাছে ফ্রান্সের পতন ঘটলে রুজভেল্ট সমবেদনা জানাতে দ্বিধা করেন নি। তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী

উইনষ্টন চার্চিলের সঙ্গে অস্ত্রসহ অন্যান্য রসদ সাহায্যের চুক্তি করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটেনের পতন ঘটলে নাৎসী জার্মানী আমেরিকার দিকে নজর দিতে পারে। ১৯৪০-এ তিনি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইতিহাসে রুজভেল্টই একমাত্র ব্যক্তি যাকে পরপর তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়েছিল।

১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বরে জাপানীরা, যারা ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছিল চীন এবং দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকান উপনিবেশ উপর্যুপুরি হামলা চালিয়েছে, তারা অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসে হাওয়াইর পার্ল হারবার বন্দর। তাদের বিদ্যুৎগতি আক্রমণে পাঁচটি আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ডুবে যায়।



*বিশ্বখ্যাত সাত নেতাঃ জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত, নিকিতা ক্রুশ্চেভ (রাশান কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারি); ফিডেল কাস্ট্রো (কিউবার প্রধানমন্ত্রী); হ্যারল্ড ম্যাকমিলান (ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী); জেনারেল চার্লস দ্য গল (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট); মার্টিন লুথার কিং (আমেরিকান সিভিল রাইটস মুভমেন্টের নেতা) ও কনরাড আডেনার (জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের চ্যান্সেলর।*

আমেরিকানদের জন্যে এটা ছিল এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, তবে ধাক্কা সামলে ওঠার পরে তারা জাপানী, জার্মানী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধের শেষের দিকে রুজভেল্টের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। তবু তিনি মিত্র বাহিনীর সাথে ইয়াল্টা সম্মেলনে বসেছিলেন। তিনি ১৯৪৫-এর এপ্রিলে মারা যান ১৯৪৪-এর শেষ নাগাদ তাকে চতুর্থ বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত কর হয়েছিল। তার মৃত্যুর পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস. ট্রুম্যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপকে জেনারেল মার্শালের বিখ্যাত 'মার্শাল প্ল্যান' অনুযায়ী ১০,০০০,০০০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য দেয়া হয় দেশগুলোকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার জন্যে। তারপর থেকে আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে অর্থ সাহায্য দেয়া অব্যাহত রেখেছে। তার পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্ব শান্তি রক্ষা করতে সমর্থ হলেও আমেরিকা কোরিয়া (১৯৫০–৫৩) ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরে আমেরিকা পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি। গত একশ বছরে আমেরিকা হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অভিভাবক। অন্ততঃ নিজেকে সে তাই মনে করে। অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এ দেশটির বর্তমান দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জর্জ ওয়াকার বুশ। তিনি ইরাকে অন্যায়ভাবে হামলা চালিয়ে সে দেশের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত ও বন্দী করেছেন। বর্তমানে হুমকি ধামকি দিচ্ছেন ইরান, জর্ডানসহ আরো কয়েকটি মুসলিম দেশকে। বুশ যাকে পথের কাঁটা মনে করছেন, সরিয়ে দিচ্ছেন তাকে। ২০০৪ সালে দ্বিতীয়বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পরে তিনি যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। যদিও আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সে দেশটির কর্ণধারের কিছু কিছু কাজে অগণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ISBN 984-751-089-X